হিন্দুধর্ম্ম তত্ত্ব

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং পিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ভবানীপুর।

২৮ নং জেলিয়াপাড়া রোড

সুবরবন যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৫ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া সমাজ মধ্যে নানাবিধ বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। কতকগুলি ব্যক্তি নূতন উদ্ভাবিত "ব্রাহ্ম" ধর্ম্মের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় চিরন্তন দেব দেবীর উপাসনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি বীতরাগ ও অশ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন; তৎপ্রতিশোধ-স্বরূপে পুরাতন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ নবোদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ও তদঙ্গ স্বরূপ রীতি, নীতি ও ক্রিয়াদির প্রতি দ্বেষ ও বৈরিভাব প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন। যে স্থানে একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত আছে; সেই স্থানেই তাহার প্রতিযোগিতা সাধন জন্য একটী ব্রাহ্মসভা স্থাপিত করা হইয়াছে; অথবা যে স্থানে নূতনরূপে একটী ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানেই যেন, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বি-স্বরূপ একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম যেন পরস্পর বৈরিভাবাপন্ন এবং উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিতে ও আত্মজয় লাভে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। একবিধ উদ্দেশ্যের অনুসরণকারী দুই সম্প্রদায়ের এই বিস্ময়কর প্রতিকূলতারণ দৃষ্টি করিলে ধার্ম্মিকজনের অন্তঃকরণে অবশ্যই ক্ষোভের উদয় হয়। ফলিতার্থে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মে অভেদ ভাব। পরম পথানু-সন্ধায়ী ব্যক্তির নিকট উভয়ই আদরণীয়। যদিও ব্রাহ্মদলাক্রান্ত বিধর্ম্মিগণ ধর্ম্মকে অনাদর ও ধর্ম্মদলাক্রান্ত অধার্ম্মিকগণ ব্রহ্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু নিরপেক্ষ ধার্ম্মিকগণ কখনই সেরূপ আচরণ করেন না; কারণ তাঁহারা তাঁহাদিগের হৃদ্গত ধ্যেয় বস্তুকে সর্ব্বধর্ম্মের আধার স্বরূপ বলিয়া জানেন। যিনি যে ভাবে ভাবময় ঈশ্বরের ভাবনা করুন না কেন, ফলিতার্থে সকলেই সেই এক সর্ব্বেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

জ্ঞানিগণের মধ্যে যদিও ব্যবহার-প্রণালীর বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনের

ভাবের বড় অন্তর দেখা যায় না। অর্থাৎ দেশ কাল পাত্র ভেদে জ্ঞানের বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় না। অতএব জাতি ও পন্থাভেদে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান করা নিতান্ত হীন-বুদ্ধির কার্য্য। ঐ ভেদভাব পরিহার পূর্ব্বক সেই অভেদাত্মা পরমাত্মাকে (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম এবং যাঁহা হইতে সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে) আমাদের সর্ব্বার্থ সাধনের একমাত্র উপযোগী জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

ইদানীন্তন যুবকবৃন্দ প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞানাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের ও ক্রিয়া-কাণ্ডের নাম শ্রবণ করিতে চাহেন না; কিন্তু ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম পরস্পর বিরোধী কি না এবং উভয়ের সাধনে কোন স্থানে বিরোধ ঘটে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। কেবল এই মাত্র ভাবিয়া থাকেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন ও যাজন করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্মকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিতে হয়; হিন্দুগণও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিয়া চলেন। এই ভাব যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, করিতে হইলে অগ্রে সাকার উপাসনা যাগ যজ্ঞ ও তপস্যাদির আবশ্যক এবং তজ্জন্যই নিরাকার পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া ভজন পূজন ও সাধনাদি করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা (বিশেষতঃ যখন তাহা ঈশ্বরার্পিত-বুদ্ধিতে কৃত হয়) চিত্তের মলাপকর্ষণ ও শুদ্ধি জন্মিলে মনুষ্যগণ ক্রমশঃ নির্গুণ ক্রিয়াকাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম-যজনাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন; কিন্তু উপাস্য মূর্ত্তিকে ব্রহ্মবিভূষিত ভিন্ন মনুষ্য দেহরূপে কখনই পরিগণিত করা উচিত নহে। ব্রাহ্মদলের এতৎ সম্বন্ধে একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে; তাঁহারা ঈশ্বরের সেই সকল কল্পিত মূর্ত্তিকে বিকারময় মনুষ্যাদি-মূর্ত্তির ন্যায় জ্ঞান করিয়া নানা মত দোষারোপ করেন; এবং তদুপাসনা যে নিতান্ত অগ্রাহ্য তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এ দিকে তাহারা যে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তাহাদের যথার্থ অধিকার ও সামর্থ্য জন্মিয়াছে কি না, একবারও তাহার অনুসন্ধান করেন না।

আমি ইতিপূর্ব্বে সৌভাগ্য বশতঃ জনৈক পরমজ্ঞানী পরমহংসের সন্দর্শন লাভ করিয়া অশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে আপন নিকটে কিছুকাল রাখিয়াছিলাম। সেই সময়ে কলিকাতা নিবাসী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা-পত্রিকা লেখক পণ্ডিতবর ৺ নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমার সহিত আত্মীয়তা থাকা প্রযুক্ত আমার তাৎকালিক কর্ম্মস্থান হুগলিতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। আমরা উভয়ে একত্র হইয়া সময়ে সময়ে ঐ পরম জ্ঞানী সাধু পরমহংসকে হিন্দুধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকাণ্ড ও উপাসনাদি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন এবং সেই সকল কার্য্যের নিগূঢ় মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি কৃপা করিয়া যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ক বরত্ন মহাশয় ঐ সকল উপদেশাবলী সময়ে সময়ে বিস্তারিত করিয়া নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে সমাজ-মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া যে প্রকার মতভেদ ও বিতর্ক সকল উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল উপদেশ একত্রিত করিয়া প্রচার করিলে বোধ হয়, বিবাদিগণের মনে অনেক পরিমাণে সংশয়চ্ছেদ হইতে পারিবে; এই বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত ঐ সকল নিগূঢ় মর্ম্ম ও উপদেশ পুস্তকাকারে একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক "হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব" নাম দিয়া সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল মহাত্মাগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা অবশ্যই এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে মনোমধ্যে অপার আনন্দ লাভ করিবেন এবং আমারও যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লেখকদ্বারা আমার পুস্তকের মুদ্রণার্থ যে পরিষ্কৃত কাপি প্রস্তুত হইয়াছিল; ভবানীপুর চক্রবেড় শিশুবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহা দেখিয়া দিয়াছেন; আর উপক্রমণিকা অংশটি স্বয়ং লিখিয়া এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়াছেন।

"হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব" পুস্তকে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ পুস্তক প্রচার করিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতিলাভ যে আকাশ-

কুসুমের ন্যায় অলীক, আমি তাহা নিমেষের নিমিত্তও বিস্মৃত নহি। তবে যে সকল মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগের ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় গৌরবের সামগ্রী সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহার সার মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, যদি এই পুস্তকদ্বারা তাঁহাদিগের এক জনেরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকার হয়, তাহা হইলেই আমি সমস্ত যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

ভবানীপুর
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এক বাক্যে উত্তর করিয়াছেন, যে "ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ"। বস্তুতঃ আদিম কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধির অকাট্য ও চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। কি বেদ, কি বাইবেল, কি পুরাণ, কি কোরাণ, সকল দেশের সকল ভাষায় রচিত সর্ব্ব প্রকার প্রধান শাস্ত্রই ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা প্রখ্যানের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছে।

ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রতিবৎসর, প্রতিমাসে, প্রতিদিন, এমন কি সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিলে, প্রতিমুহূর্ত্তে, পৃথিবীতে কত সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কত শত মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে কত শত বা কত সহস্র ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত সহাস্য-বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে! এবং বোধ হয় চিরকালই এইরূপ করিবে। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের সারবত্ত্বা ও উৎকৃষ্টতা

বিষয়ে আর কি অকাট্য উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ফলতঃ অনিত্য ঐহিক সুখ অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট পারত্রিক সুখের নিদান স্বরূপ ধর্ম্ম পদার্থ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ; ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতাই হয় না।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি যে পশ্বাদি ইতর জন্তু অপেক্ষা অত্যুন্নত পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বরূপ অমূল্য রত্নে বিভূষিত হওয়াই তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণ। চিন্তা শক্তি, বাক্‌শক্তি ও তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বৃত্তি, তাহার সাহায্যকারী মাত্র। নীতি-শাস্ত্র-বেত্তারা ধর্ম্মহীন মানবকে পশুজাতির অভিন্নরূপ গণ্য করেন।

" আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ "

(অর্থাৎ) আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যে পশুজাতির সহিত মানবজাতির প্রভেদ নাই। ঐ কার্য্য-চতুষ্টয় উভয় জাতীয় জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। কেবল ধর্ম্ম কার্য্য বিষয়েই মানব জাতির বিশেষ প্রভেদ আছে। সুতরাং ধর্ম্মহীন মানব পশুতুল্য।

ধর্ম্ম এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সকল অবস্থায় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সমানরূপে প্রতীয়মান

হয় না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহের স্থিরতা না হয়, যাবৎ শারীরিক শক্তি বিলক্ষণ প্রবল এবং ইন্দ্রিয়গণ সবল ও কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বলবতী থাকে, তাবৎ প্রায় মনুষ্যগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। আবার, যে পর্য্যন্ত মানবমনে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না।

জঠরানল-দগ্ধব্যক্তিকে লোভ-রিপুর সংযম বিষয়ে এবং প্রবলতর শারীরিক শক্তিমান ব্যক্তিকে "অন্যের নিকট প্রহৃত হইবে, তথাপি অন্যকে প্রহার করিবে না," এতাদৃশ বিষয়ে, অথবা যে পূর্ণযৌবন ব্যক্তির কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল রূপে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে বিষয় ভোগ-জনিত সুখের নিকৃষ্টতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা উহাদিগের মনের নিকটেও যাইতে পারে না; কেবল কর্ণে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করে মাত্র। আবার নিতান্ত অবোধ শিশুকে যদি এরূপ উপদেশ দেওয়া যায় যে, গুরুতর ব্যক্তিকে প্রণাম করিয়া তদীয় পদধূলি গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তবে সেই শিশু উন্মত্ত-প্রলাপবৎ আমাদিগের ঐ উপদেশবাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হয়ত সেই গুরুতর ব্যক্তিকে সেই ক্ষণেই পদাঘাত পূর্ব্বক ক্রীড়া প্রদর্শন করিবে।

উল্লিখিত রূপে সময়-বিশেষে বা পাত্র-বিশেষে মনুষ্য-দিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতেই দেখা যায় না। কিন্তু

যখন সংসারের অধিকাংশ বাধার অতিক্রম হয়, যখন মনুষ্য-গণ জীবিকা-নির্ব্বাহের স্থিরতা দেখিতে পান, যখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ শারীরিক শক্তি, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং আপনা হইতেই আপনার পরাধীনতা বা অন্যের সাহায্য-সাপেক্ষতা অনুভব হয়, তখনই লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়।

ধনবান্ ব্যক্তিগণ যখন উৎকৃষ্ট খাদ্যপেয়াদি উপভোগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে অট্টালিকায় উপবিষ্ট হন, তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তাদৃশী অবস্থাতেও তিনি প্রকৃত সুখী হয়েন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ যেন আরও কিছু পাইবার আশা করে। যাবৎ সেই আশা পূর্ণ না হয়, তাবৎ তাঁহার প্রকৃত সুখ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই আশা "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" এবং সেই আশার বিষয় "ধর্ম্ম" ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

এইরূপে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইলেই, প্রচলিত ধর্ম্মা-নুষ্ঠানপ্রণালীসকলের মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট কোন্‌টী বা নিকৃষ্ট, তাহা জানিবার ইচ্ছা মানব মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টিয় প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী প্রচলিত আছে। যাঁহারা ঐ সকল সংবাদ জানেন, অথবা তত্তদ্ধর্ম্ম বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একবার সেই সকল ধর্ম্মের বলাবল বিচার করিতে চান, তাহার সন্দেহ নাই।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।" *

(অর্থাৎ) উৎকৃষ্ট রূপে পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃকল্প।

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় শাসন বাক্য সকল আমাদিগের মস্তকোপরি যতই বলবৎ থাকুক না, আমাদিগকে ধর্ম্মান্তরের আলোচনা করিতে দেখিয়া আমাদিগের অভিভাবক মহাশয়েরা যতই বিরক্ত হউন না, সামাজিক-শাসন আমাদিগের উপরি যতই কর্ত্তৃত্ব করুক না, আমাদিগের মন এমনই স্বাধীন যে, তাহা সকল শাসনকে অতিক্রম করিয়া অন্ততঃ নির্জ্জনে বসিয়াও একবার চিন্তা করিবে, যে চিরপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, অথবা নব্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, কিম্বা হিন্দু-ধর্ম্ম সমদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট? কাহারই এরূপ ক্ষমতা নাই যে, এরূপ স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত করে।

আমাদিগের মনের ঐরূপ স্বাধীন চিন্তার এই ফল হয়, যে যাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির যেরূপ সীমা, অথবা যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি বা মনোবৃত্তি, তিনি তদুপযোগিনী ধর্ম্ম-প্রণালীকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, উপভোগস্পৃহার চরিতার্থতা এবং

*। ভগবদ্গীতা উপনিষদ্।

অপরাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, অথচ একটী অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে, যাঁহাদিগের এরূপ প্রবৃত্তি, অথবা জ্ঞান ও বুদ্ধির এই পর্য্যন্ত সীমা, তাঁহারা হয়ত প্রচলিত নব্য-ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বা "স্বেচ্ছাচার" ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হন। আবার যাঁহার পরদুঃখ হরণেচ্ছা-প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী, তিনি দেখিতে পান যে, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টিয়, কি মুসলমান, কি নব্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই পশ্বাদির জীবন-বিনাশের ব্যবস্থা রহিয়াছে, অথবা তদ্বিষয়ে বিশেষ নিষেধ নাই। তিনি,

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।"

(অর্থাৎ) জীবের প্রতি হিংসা না করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম-সূত্র যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল, তাহারই দিকে আকৃষ্ট হন। এইরূপে চিরকাল এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও আপন আপন প্রকৃতির দাসত্ব রক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তি হইতে যে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে, তাহা সমভাবাপন্ন নহে। স্থূলতঃ উহা দুই প্রকার। গভীর-বুদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার একবিধ ফল; চঞ্চল-বুদ্ধিতে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন চেষ্টার অন্যবিধ ফল। শেষোক্ত প্রণালীতে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়।

উপরি বর্ণিত প্রকারে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে গিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় বুদ্ধিমান তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি যে কিছু ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন,

প্রকৃত পক্ষে তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যতই ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেছেন, আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মের যতই সংস্কার করিতেছেন, ততই তাহা হিন্দুধর্ম্ম রূপে পরিণত হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহার সূত্র করিতে হইলে, অগ্রে ধর্ম্ম-পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া উঠে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রদান করিতে পারেন ; কিন্তু "জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যই ধর্ম্ম" এরূপ সূত্র সর্ব্ববাদি-সম্মত, তাহার সংশয় নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মকে অর্থাৎ ঐ চতুর্বিধ শাস্ত্রে সামঞ্জস্যরূপে জগদীশ্বরের যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, তাহাকে "হিন্দুধর্ম্ম" বলা যায়। "হিন্দু" এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে *। ফলতঃ ভারতবর্ষবাসী আর্য্যজাতিরই নামান্তর হিন্দু, এ বিষয়ে মত-ভেদ নাই।

হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতন বৈদিকধর্ম্ম পৃথিবীতে কত কাল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্ত

* কোন মতে "হিন্দু" শব্দটি সংস্কৃত ও চির প্রচলিত। অন্যমতে প্রাচীন ইংরাজী ভাষাতে " হেন্দু " শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায় পুস্তক দেখ।

একরূপ, † প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী দূরদর্শী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র যে ভাষায় রচিত, তাহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে গিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। আবার বেদ শাস্ত্র যখন গ্রন্থাকারে পরিণত ছিল না, "শ্রুতি" নামে গুরু-পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতে ছিল, সেই সময়ের নির্দ্দেশ কে করিতে পারে ? ফলতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কতকাল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। ইহা অনন্তপ্রায়-সুদীর্ঘ-কাল পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণকার অতি প্রামাণিক ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্যা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, বৈদিক ভাষা তাহার মূলস্বরূপ এবং যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সকল একমাত্র আর্য্যধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কোথাও কেবল রূপান্তরিত, কোথাও বিকৃত, কোথাও অর্দ্ধ-বিকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতি বা হিন্দুজাতি ধর্ম্ম বিস্তার, রাজ্য-বিস্তার ও বাণিজ্য-বিস্তারাদি উপলক্ষে পৃথিবীর বর্ত্তমান চারি মহাদেশে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং "অতি পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মও আংশিকরূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া-

---

† কোলব্রুক সাহেবের মতে খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অনেকের সিদ্ধান্ত যে,৫ হাজার বৎসর সময়ের মধ্যে।

ছিল, এরূপ অনুমান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট শ্রদ্ধেয় হইয়াছে।

হিন্দুজাতির সমস্ত পৃথিবীতে যাতায়াত বিষয়ে, মহাভারত রামায়ণ, ভাগবত, মৎস্য-পুরাণ, রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থ, দেশপর্য্যটক পুরাণ-পুরী নামক সন্ন্যাসীর বর্ণনা এবং ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন-কালীন তাম্র-ফলকাদি ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ সকল স্বাক্ষ্য প্রদান করে।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু রাজার ১১৫ পুত্র মেরু পর্ব্বতের উত্তরে এবং ১১৪ পুত্র মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে রাজ্য করেন।

রামায়ণ আদিকাণ্ড ৬২ সর্গে কথিত হইয়াছে যে, পরশু-রাম সুমেরু পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিক ক্ষুদ্র বোখারা দেশস্থ উন্নত পর্ব্বতই পৌরাণিক "সুমেরু পর্ব্বত।"

ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে জেনিসি নদীর তীরস্থ কৃষ্ণজর্ক নগরে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজ-ধানী ছিল।

মহাভারতের বর্ণনানুসারে পাণ্ডু-পুত্র ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব বর্ত্তমান আসিয়া মহাদেশের প্রায় সকল দেশই জয় করিয়াছিলেন।

পুরাণ পুরী নামক সন্ন্যাসী আসিয়ার ব্রহ্মদেশ হইতে ইউরোপীয় রুসিয়ার মস্কো নগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি

লিখিয়াছেন যে, "তুরস্ক" দেশের বসোরা নগরে "কল্যাণ রাও" ও "গোবিন্দ রাও" নামক দুই দেবমূর্ত্তি আছে। "পারস্য" দেশের হিঙ্গুলাজ নগরে, "তাতার" দেশের বাখ নগরে, আসিয়িক রুসিয়ার আষ্ট্রাকান নগরে, এবং জাবা-দ্বীপ, বালিদ্বীপ ও খরক উপদ্বীপে বহুতর হিন্দু বাস করিতেছেন।

রোম দেশীয় পণ্ডিত স্ত্রাবো ও ডাইরো লেখেন, যে খ্রীষ্টাব্দের ২০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিয়ন রাজা রোমীয় সম্রাট আগষ্টস সীজরের নিকট যে দূত প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে এক জনের নাম "খড়্গ শর্ম্মা"।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কোন স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টাব্দের ২২০০ বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতি ইউরোপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ঐ তাম্রফলক এক্ষণে ইংলণ্ডের চিত্রশালিকায় আছে।

বিশ্ব-ইতিহাস-লেখক টাইটেলার এবং প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত মনসেয়ার বেলী লেখেন যে, আফরিকা মহাদেশস্থ ঈজিপ্ট ও কালডিয়া দেশে যে যে বিদ্যা প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই তাহার বিদ্যালয়স্বরূপ।

পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, বলিরাজা ও পুরুবংশীয় কোন কোন রাজা পাতালে বাস করিতেন। মহাভারতের

বর্ণনা এই যে, ভীমসেন পাতালে গমন করেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ভূগোল-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ অংশে দুইটী প্রদেশের নাম পুরুভিয়া ও বলিভিয়া। তথাকার অধিবাসীরা আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনেকাংশে হিন্দুজাতির সদৃশ। তাহারা অদ্যাপি রাম-সীতার পূজা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় "পাত" শব্দের একটী অর্থ—ঊর্দ্ধাধভাবে অবস্থিত। ব্যাকরণের যে সূত্রানুসারে বাচ্ শব্দ হইতে "বাচাল" শব্দ সিদ্ধ হয়, সেই সূত্র অনুসারে "পাত" শব্দ হইতে "পাতাল" শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। পৌরাণিক বর্ণনা, পাতাল শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং আমেরিকার প্রচলিত ভূগোল বৃত্তান্ত একত্র অনুধাবন করিতে গেলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে আধুনিক আমেরিকা নামক স্থানই পূর্ব্বকালে "পাতাল" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং সংস্কৃত "পুরুভূমি" শব্দের অপভ্রংশে পুরুভিয়া ও "বলিভূমি" শব্দের অপভ্রংশে বলিভিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ যে হিন্দুজাতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকার পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আমেরিকাই যে তাঁহাদিগের পাতাল, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণই নাই।

এই সকল ও এতাদৃশ অন্যান্য প্রমাণপ্রয়োগ দৃষ্টি করিলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, পূর্ব্বকালে সমস্ত পৃথিবীতেই হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আদিম কালীন হিন্দু জাতীয় ব্যক্তিরা চরম জ্ঞানী, চরম ধার্ম্মিক এবং প্রায় চরম সভ্য হইয়াছিলেন।

অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনার পরিচায়ক বেদশাস্ত্র, উপনিষৎ শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্র সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ।

মানববুদ্ধির অদ্বিতীয় গৌরবের সামগ্রী, সারবান্ প্রকৃত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হিন্দুজাতিরই জ্ঞানচর্চ্চা হইতে সমদ্ভূত।

হিন্দুজাতি কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহারা অপরিত্যজ্যবৎ সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক বনবাস-আশ্রয় করিতেন; সমুদ্রবৎ বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র সকল তাহা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতেছে।

শাস্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে, সভ্যতাসাধনের উপকরণ স্বরূপ ব্যোমযান, দুরবীক্ষণ, গ্লোব, ঘটিকা, তাপমান, বায়ুমান এবং দিগদর্শন যন্ত্র প্রথমে হিন্দ জাতিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কুসংস্কার-রহিত জ্ঞান, মার্জ্জিত ধর্ম্ম এবং পরিশুদ্ধরূপ কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যই প্রকৃত সভ্যতা নামক পদার্থের উপাদান। জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলে আদিম হিন্দুজাতিতে ঐ সকলেরই বিদ্যমানতা দেখা যায়।

* সংস্কৃত ভাষায় উল্লিখিত "শিল্প সংহিতা" এবং "সূর্য্য সিদ্ধান্ত" গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালে সকল পদার্থেরই লয় হয়। তদনুসারে হিন্দু-জাতির উল্লিখিত উচ্চতম অবস্থা যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে বর্ত্তমান কলিযুগে যবনাদি জাতির অত্যাচারে প্রায় লোপ প্রাপ্ত হয়।

ইতিহাসবেত্তারা হিন্দুধর্ম্মের ঐরূপ প্রলয়াবস্থা সবিশেষ অবগত আছেন। নিতান্ত সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলে, খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৫১৮ বৎসর হইতে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৩০০ বৎসর কাল যবনজাতির অত্যাচার এবং ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে বর্ত্তমান ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১১০ বৎসর কাল খৃষ্টীয়জাতির প্রবর্ত্তনা হিন্দু-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত দুরবস্থার মূল কারণ।

যখন দীর্ঘকালব্যাপিনী মহাপ্রলয়-ঝঞ্ঝার ন্যায় যবন-জাতির অধিকার রূপ পাপ-রাশির আগমন দর্শনে নির্ম্মল জ্ঞান ও সভ্যতার দর্পণস্বরূপ পবিত্র ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পলায়ন করেন, তদবধি কাহারই মনে এরূপ প্রত্যাশা নাই যে, এই হতভাগ্য ভারতভূমিতে আর কস্মিন্‌কালে, মৃতপ্রায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতির রাজ্য উপস্থিত হওয়াতে ভারতবর্ষে বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা এবং তদ্দ্বারা পুনরায় অপেক্ষাকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চা অধিক হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ বিকৃত ও লুপ্তপ্রায় হইতেছে।

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বিজাতীয় রাজার নিকট হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা নাই; প্রত্যুত নিন্দা ও অবজ্ঞা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্ম্মের অধিক অনুষ্ঠাতা অথবা অধিক উৎসাহদাতা, তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। এদিকে যে সকল ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন অথবা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ বিরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই রাজ-দ্বারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন এবং অধিক অর্থজনক বিষয়কার্য্যের অধিকারী হন।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত নব্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সর্ব্বদাই হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া থাকে, অথচ অনেক বুদ্ধিমান লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও গণ্য করেন। সুতরাং ঐ সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকের মন বিচলিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ, হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ আছে, এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করা অর্থব্যয়সাধ্যও বটে; খৃষ্টীয় ও নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার বিপরীত ভাব। সুতরাং অলসপ্রকৃতি এবং ব্যয়কুণ্ঠ লোকেরা হিন্দুধর্ম্মে বীত-শ্রদ্ধ হইতেছে।

ফলতঃ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুরস্কার নাই, প্রত্যুত তিরস্কার আছে, যাহার অনুষ্ঠান না করিলে তিরস্কার নাই, প্রত্যুত পুরস্কার আছে, তাহার যে অবনতি হইবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানাপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহার চারিটী প্রধান কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

ক। খ্রীষ্টিয়দিগের প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা। হিন্দুধর্ম্মের মৃতপ্রায় অবস্থাতেই এতদ্দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আগমন হয়। তৎকালে, হিন্দু ধর্ম্মের গুণ-গৌরব ও আভিজাত্যের পরিচায়ক অভ্রান্তপত্রিকা স্বরূপ বেদ, উপনিষৎ, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সকল, ছিন্ন ভিন্ন ও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। তাহাদিগের গৌরব-কীর্ত্তনে প্রকৃতপ্রতিজ্ঞ হিন্দু-পণ্ডিতচূড়ামণিদিগের অমূল্য উত্তমাঙ্গ সকল কালমূর্ত্তি যবন-জাতির অপবিত্র তরবারিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। যে আর্য্যশোণিতের প্রত্যেক বিন্দুতে গভীর জ্ঞান নিহিত, তাহা তখন ভারতবর্ষে স্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তির নিকট আপনার পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের যতটুকু পরিচয় দিতে পারে, অপরিচিত খ্রীষ্টীয় জাতির নিকট মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্ম তৎকালে তাহার অধিক পরিচয় দিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রীষ্টীয়েরা যেমন বুঝিলেন, তাহাতে ইহাকে অসার বলিয়াই বোধ করিলেন।

খ। বাইবেল শাস্ত্রের উপদেশানুসারে খ্রীষ্টিয়দিগের যে কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ।

যাঁহারা বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ উপদেশ পাইয়াছেন যে, প্রকারান্তরে মদ্যপান দোষাবহ নহে; আহারার্থে পশ্বাদি জীব হত্যা করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য; যে কোন প্রকার সাকার দেব দেবীর আরাধনা নরকগমনের কারণ; তাহাদিগের পক্ষে আজন্মপরিচিত ঐ সকল কুসংস্কারের পরিবর্ত্তন করা সহজ হইতে পারে না।

গ। আপনাদিগের সিদ্ধান্তে মত্ততা—ইহার তৃতীয় কারণ স্বরূপ।

খ্রীষ্টীয় জাতি যদবধি বন্য পশুর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ উপায়ে আপনাদিগের বাহ্য উন্নতি সাধন করিতেছেন, তদবধি এপর্য্যন্ত ইহাদিগের কর্ত্তৃত্বের উপর কেহই ব্যাঘাত প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং ইহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, ইহা ভাবিতেও ইচ্ছা করেন না।

ঘ। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতা এবং কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধ প্রবলতা ও জন্মভূমি-ঘটিত জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা, ইহার চতুর্থ কারণ।

ইউরোপ যে প্রকার শীতপ্রধান দেশ, তাহাতে তথায় মদ্য মাংসাদি আহার না করিলে, মনুষ্যের শরীর রক্ষা হইতে পারে না। জন্মাবধি মদ্য মাংসাদি ব্যবহার যাহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের কাম, ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হইবে, ইহা জগদীশ্বরের অখণ্ডনীয়

প্রাকৃতিক নিয়ম। দয়া, ন্যায়পরতা, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরোধী; সুতরাং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা থাকিলেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হীনতা থাকিবে, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম।

এক্ষণে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ বলিয়া গণ্য, হিন্দুধর্ম্ম হইতেই যাহার উৎপত্তি, তাহাই আবার হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে কৃত সংকল্প হইয়াছে; এরূপ অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে;—

প্রথমতঃ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা বস্তুতঃই সাকার উপাসনারূপ হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং সকলের মনেই তাহার উৎকর্ষ অনুভব হওয়া এবং বক্তৃতা দ্বারা অন্যের নিকট তাহার উৎকর্ষ প্রখ্যাপন করিতে সমর্থ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ বা অধিকারী এবং প্রকৃতরূপে তাহার অনুষ্ঠান না হইলে, মনুষ্যের ও সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধন হইবে, নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মীরা তাহা অনুধাবন না করাতেই নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী হইয়াছেন।

মূর্খ ব্যক্তি অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি অধিক মাননীয় বটে, কিন্তু তাহাই ভাবিয়া যদি মূর্খ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কি তাহারা সম্মানের পরিবর্ত্তে উপহাস প্রাপ্ত হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ কারণে এতদ্দেশের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-

মধ্যে এত পরিমাণে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে যে, কিছুকাল হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বক্তৃতা না করিলে ঐ সকল কুসংস্কারের নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্তও বিষয়-বিশেষে কোন কোন হিতৈষী ব্রাহ্মধর্ম্মী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কোন কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী অতি নীচজাতীয় ও নীচ কর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের এইরূপ সংস্কার যে, তাহারা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া যে সকল জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা বস্তুতঃ অতি সৎকার্য্য এবং অন্য সম্প্রদায়ী উৎকৃষ্ট জাতীয় অতি সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও তাহাদিগের অনুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করেন না বলিয়া তাঁহারা অতি অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপ মহা-অনিষ্টকারী বাল্য-বিবাহ এবং বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অতি জঘন্য কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার এরূপ প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, কিয়ৎকাল একবারে সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের উপর বিরুদ্ধ-বক্তৃতারূপ কুঠারাঘাত না করিলে উহা নিবারিত হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকৃতি স্বরূপ প্রচলিত "নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম" বা স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম পূর্ব্বোল্লিখিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় সুখসাধ্য। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিতান্ত অল্প, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী, তাহারা কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে ঐ ধর্ম্ম-প্রণালীতে অনুরক্ত হইয়া আপনা-

দিগের দলপুষ্টি করিবার নিমিত্ত সাধারণের নিকট হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছে।

প্রচলিত নব্য ব্রাহ্ম বা স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মের মতে ঈশ্বরো-পাসনা বিষয়ে নিয়ম নাই; যবন ম্লেচ্ছাদি জাতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ সকল জাতিরই এই কার্য্যে অধিকার আছে। স্ত্রী পুরুষের নিয়ম নাই, ব্রত উপবাস নাই; আহার ব্যবহার বিষয়ক কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই; মদ্য মাংসাদি ভোজনে বিশেষ বাধা নাই। যে কোন দিবসে হউক, এক-বার ব্রাহ্ম সভায় গিয়া মুখে বলিলেই হইবে যে, "একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন।" অনন্তর সকল কার্য্যই চলিবে। সাংসারিক কোন কার্য্যের ব্যাঘাত নাই। অভিলষিত কার্য্য-সাধনের কোন বাধা জন্মিবে না। যদি এতাদৃশ অনিয়মে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তবে নিয়ম-পাশে বদ্ধ হইয়া অহরহ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক যে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়, তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন?

উল্লিখিত কারণপরম্পরা হইতে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে;—

(১) খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক অধিকাংশ ব্যক্তি, যাঁহারা ধর্ম্মান্তরের অকাট্য যুক্তিকেও শ্রবণ করিবেন না এবং নিজ ধর্ম্মের নিতান্ত অসার যুক্তিকেও প্রবল বলিয়া মানিবেন, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াই নিজ কার্য্যে ব্রতী হইয়া-

ছেন, ইহারা ও "উন্নতিশীল" এই সাড়ম্বর নামধারী স্বেচ্ছাচারী নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায় নিরবধি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ বক্তৃতারূপ শাণিত তরবারি দ্বারা আবালবৃদ্ধ হিন্দুজাতির একীভূত অন্তঃকরণকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

(২) একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম শৈব শাক্তাদি পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হিন্দুজাতির চরম লক্ষ্য একমাত্র জগদীশ্বর সকলেরই লক্ষ্য পদার্থ। কিন্তু যদবধি হিন্দুধর্ম্মে বিকার রোগের সূত্রপাত হইয়াছে, তদবধি বহুসংখ্যক বিভিন্নপ্রকৃতি ধর্ম্মপ্রচারক, আপন আপন প্রকৃতির অনুযায়ী উপদেশ দ্বারা এই এক পথাবলম্বী ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে কেমন ভয়ানক বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদির মধ্যে কোন এক ধর্ম্মাবলম্বী নীচতম ব্যক্তিও অন্য এক ধর্ম্মাবলম্বী উচ্চতম ব্যক্তিকে অহিন্দু ও পাপাচারী ব্যক্তির ন্যায় ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে।

(৩) নির্ব্বোধ ও হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বালকেরা একবারে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চির-প্রত্যাশাকারী পিতাকে চিরকালের জন্য নিরাশ এবং উপায়ান্ধা স্নেহময়ী জননীকে চিরকালের নিমিত্ত শোকসাগরের অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া পলায়ন করিতেছে।

(৪) যে সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ হিন্দুরমণীগণের পবিত্র চরিত্রের বিষয় ইতিহাসে পাঠ করিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে পবিত্রতার উদয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়,

খৃষ্টধর্ম্মের দূতীগণ কলে কৌশলে হিন্দুগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই হিন্দুজাতীয় রমণীগণের সরল উর্ব্বর ও কোমল চিত্তক্ষেত্রে, আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত অসতীত্বের বীজ, যাহার নাম স্বাধীনতা বা পূর্ণ সভ্যতা রাখিয়াছে, বপন করিতেছে।

(৫) লোকে ধর্ম্মবোধে যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, কিরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়, তাহা পৃথিবীস্থ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী যাবতীয় ব্যক্তিই জানেন; কিন্তু সম্প্রতি, অন্যে পরে কা কথা, বিজাতীয় ধর্ম্মের উপদেশে বিকৃতপ্রকৃতি ঔরস পুত্রেরাও বৃদ্ধ পিতার ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে অহোরাত্র অবজ্ঞা করিতেছে।

(৬) গৃহস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে আপন আবাস বাটী যেমন শান্তি ও সুখের স্থান, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু এক্ষণে তথায় এক এক জন পরিবার এক এক ধর্ম্মাবলম্বী। কেহ নাস্তিক, কেহ অর্দ্ধ-নাস্তিক, কেহ খৃষ্টান, কেহ অর্দ্ধ খৃষ্টান, কেহ উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, কেহ বা তাহার অর্দ্ধাংশ। সুতরাং সেই শান্তিনিকেতনে অহোরাত্র বিবাদ ও বিষাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

(৭) গ্রামস্থ বা দেশস্থ ব্যক্তি যে স্বগ্রামস্থ বা দেশস্থের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবেন, কোন্ ব্যক্তি এরূপ প্রত্যাশা না করেন? কিন্তু এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের এমনই দুরবস্থা যে, গ্রামস্থ ও দেশীয় ব্যক্তিরাই স্বগ্রামস্থ ও

স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অধিকতররূপে শত্রুভাব প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালীর নিন্দাবাদ কাহার কর্ণ বধির-প্রায় না করিতেছে।

(৮) হিন্দুসম্প্রদায়সকলের দৃঢ় বন্ধনীস্বরূপ জাতিভে-দের শিথিলতা উপস্থিত হওয়াতে, এক্ষণে হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। শিষ্যগণ আর পরমারাধ্য গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করে না। রজ-কেরা বস্ত্র পরিষ্কার এবং ক্ষৌরকারেরা ক্ষৌর-কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে। ডোমেরা বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত যত্নবান। ব্রাহ্মণদিগের ডোমের নির্ম্মাতব্য বস্তু সকল স্বহস্তে প্রস্তুত না করিলে, সংসার চলা ভার হইয়াছে।

এইরূপ শত শত প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া হিন্দুসমাজকে দগ্ধ করিতেছে।

কৌতুকের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কলিযুগে চিরপবিত্র ভারতবর্ষের যে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, তাহাও অতি পূর্ব্বকালীন আর্য্যজাতির জ্ঞাননেত্রের অগোচর ছিল না। তাঁহারা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,

"কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভাঃ।
ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শূরা বস্ত্রোপশোভিনঃ!
ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকাঃ॥"

---

* ভবিষ্য পুরাণ।

কলিযুগের প্রথমাবধি পঞ্চ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন কালে শ্বেতবর্ণ, অতি বলিষ্ঠ, সর্ব্বাভরণশূন্য, কেবল বস্ত্রো-পশোভী, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দাকারী ম্লেচ্ছ সৈন্যেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে।

" অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুগচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
বেদবাদরতাঃ শূদ্রা বিপ্রা যবনসেবিনঃ।
স্বচ্ছন্দাচারিণঃ সর্ব্বে বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্নভোক্তারঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥ " *

কলিযুগে অন্ন বিচার, বিশেষতঃ যোনির বিচার থাকিবে না। সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া বাদানুবাদ করিবে, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের পথেও গমন করিবে না; কেবল শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া কালযাপন করিবে। শূদ্রেরা শাস্ত্রাতিক্রম করিয়া বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইবে, ও তাহার প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়া অর্থবাদকেই প্রকৃত অর্থ জ্ঞান করিয়া বেদমার্গ পরি-ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণেরা যবনের সেবা করিবে। ফলতঃ সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই বেদমার্গ বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ম্লেচ্ছদিগের উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ভোজন করত ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার সহিত শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎ বাণীর

---

* ভবিষ্য পুরাণ।

মিলন করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

নিতান্ত নিঃসহায় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে, বৈদেশিক পথিকের পক্ষে সম্বলস্বরূপ ধনসম্পত্তি যেমন মহোপকারী, জীবন রক্ষার যেমন অদ্বিতীয় উপায়, একান্ত নিঃসহায় অনন্তসংসারে অনন্ত কালের নিমিত্ত ভ্রমণ-প্রবৃত্ত আমাদিগের অমর জীবাত্মা ধর্ম্মসম্পত্তিকে সম্বল স্বরূপ লইয়া না চলিলে, তাহার কি দুরবস্থা হইবে, তাহা ভাবিলে চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট মানবজাতির মর্ম্ম বিদারণ করিবে, সন্দেহ কি ? অতএব হিন্দুজাতীয় আত্মহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ পদার্থ, কিরূপে ইহার চর্চ্চা করিতে হয়, এবং বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ইহার যাহা কিছু দোষ ব্যাখ্যা করেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং জ্ঞানলাভানন্তর নিজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা অল্প দিনের, অল্প যত্ন ও অল্প পরিশ্রমের কার্য্য নহে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ পদার্থ তাহা জানিতে হইলে বহুতর শাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা আছে। যথা ;—

বেদ—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক অতি বিস্তৃত ও অতিগূঢ়ার্থ মূল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তাহার বহুতর শাখা প্রশাখা।

উপনিষৎ—কঠ, মণ্ডুক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি বেদোল্লিখিত ঈশ্বরতত্ত্বের সারাংশ স্বরূপ অতি গূঢ়ার্থ প্রায় ৭০। ৭৫ খানি তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্র।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ও ছন্দঃ এই চারি গ্রন্থ এবং মাহেশ, পাণিনি প্রভৃতি প্রায় ১০। ১২ খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ, আর অসীমপ্রায় জ্যোতিষ গ্রন্থ, এই ষট্‌প্রকার শাস্ত্র।

গণিত ও ফলিত ভেদে জ্যোতিঃশাস্ত্র দুই প্রকার। যথা ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং গোলাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ সকল গণিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

গ্রহগণের ফলাফল, অদৃষ্টের ফলাফল, ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্ণয় সংক্রান্ত গ্রন্থ সকল ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

স্মৃতি—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষির প্রণীত প্রায় ৫০ খানি মূল ধর্ম্মসংহিতা গ্রন্থ।

পুরাণ—ভাগবত, বামন, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অষ্টাদশ গ্রন্থ।

উপপুরাণ—পুরাণের অধিকাংশ লক্ষণাক্রান্ত অষ্টাদশ গ্রন্থ।

তন্ত্র—মুণ্ডমালা, রুদ্রজামল ও কুলার্ণব প্রভৃতি অসংখ্যপ্রায় তন্ত্র সকল।

দর্শন শাস্ত্র—চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি ষোড়শ গ্রন্থ।

ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ।

শব্দশাস্ত্র—যাদব, মেদিনী, হড্ডচন্দ্র প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানি কোষ শাস্ত্র, বা অভিধান গ্রন্থ।
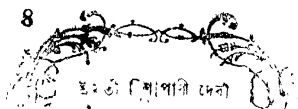
এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বিদ্যা চতুঃষষ্টি কলাতে বিভক্ত, যথা,—

সঙ্গীত বিদ্যা, শারীরবিধান বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি।

উল্লিখিত শাস্ত্র সকলের মূলগ্রন্থ ভিন্ন বহুতর টীকা, বহুতর টীপ্‌পনী, বহুতর সংগ্রহগ্রন্থ এবং প্রত্যেক সংগ্রহ গ্রন্থের বহুতর টীকা ও টিপ্‌পনী গ্রন্থ আছে।

শাস্ত্র সকল হইতে মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক বিধি বা নিষেধ সংগ্রহ করিতে হইলে, অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে ; যথা,

ক। এই সকল শাস্ত্র এক কালে ও এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে। বেদশাস্ত্র অসীমবৎ অনির্দ্দেশ্য, প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্র বর্ত্তমান সময়ে রচিত হইয়াছে।

খ। কোন শাস্ত্র প্রধান ও কোন শাস্ত্র অপ্রধানরূপে গণ্য। বেদ ও স্মৃতির মধ্যে বেদ প্রধান। স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে পুরাণ প্রধান ; ইত্যাদি।

গ। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অবিকল একরূপ নহে। রসাত্মক-বাক্য প্রয়োগ সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বকালীন ঘটনা অবিকল বর্ণন করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য। মহাভারত গ্রন্থ কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে। সুতরাং ঐ গ্রন্থে উভয় প্রকার উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে।

ঘ। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সত্য যুগের ধর্ম্ম এক প্রকার, কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। সহজ ব্যক্তির ধর্ম্ম একরূপ, আপদ্গত ব্যক্তির ধর্ম্ম অন্য রূপ। গৃহস্থের কর্ত্তব্য যেরূপ, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য সেরূপ নহে।

ঙ। স্থল বিশেষে একই ব্যবস্থার “ বিশেষ বিধি ” ও “ সাধারণ বিধি ” এই দুই বিভাগ আছে। বিশেষ বিধির ব্যতিরিক্ত স্থলেই সাধারণ বিধির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চ। অনেক শাস্ত্রে রূপকাদি অলঙ্কার ও পরোক্ষ এবং কল্পিত বর্ণনা আছে। আমরা অন্যের মুখে কোন একটী ঘটনার যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ করি, আমাদিগের অন্তঃকরণ তাহার অল্প অংশেই বিশ্বাস করে; ইহা মানবমনের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি, বিশ্বাসের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিশ্বাস পদার্থের এই ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই পরমহিতৈষী হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতারা পুরাণ ও মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে ভূরি পরিমাণে “রূপক” ও “অতিশয়োক্তি” প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ছ। হিন্দুজাতি মানবগণের প্রকৃতি-ভেদে অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার দণ্ডবিধানের মধ্যে পারত্রিক নরকযন্ত্রণারূপ দণ্ডের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অসৎ কার্য্যেরই পাপজনকতা এবং পাপমাত্রেরই পারত্রিক নরকভোগের কারণতা কল্পনা করিয়াছেন।

আমরা জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহুতর ব্যক্তির নিকট এবং বহুতর শাস্ত্রে উপদেশ পাইতেছি যে,—সদা সত্য বাক্য কহিবে; অন্যের প্রতি দয়া করিবে; অন্যায় কার্য্য করিবে না; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে।” কিন্তু ইহাতে কি আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে ঐ উপদিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়? কখনই নহে।

আবার যখন আমরা শ্রবণ করি যে, “মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে সত্যের অপলাপ ও অন্য ব্যক্তিকে প্রতারিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়; বিপন্নকে দয়া না করিলে, আপনার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় এবং লোকের নিকট অবজ্ঞা-ভাজন হইতে হয়; অন্যায় কার্য্য করিলে এক সময়ে অন্য ব্যক্তিও আমাদিগের প্রতি অন্যায় করিবে; ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন না করিলে লোকে অধার্ম্মিক বলিয়া অখ্যাতি ঘোষণা করিবে;” তখন এই সকল ঐহিক শাসন-বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অনেকের অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে উপদিষ্ট-পথে প্রধাবিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাতেও পরমহিতৈষী শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। কর্ত্তব্যতার বিধান এবং অকরণের ঐহিক দণ্ড অবগত থাকিলেও সংসারে অবস্থানকালে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় মনুষ্যের রসনা সহজেই সঙ্কুচিত হয় না। অন্যের দুঃখ দর্শনে তাহাদিগের নয়ন-যুগল অনবরত বাষ্প বিসর্জ্জন করে না। অন্যায় কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগের

জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না। ঈশ্বরভক্তি-বিহীন হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের কঠোর অন্তঃকরণ বিষাদ বা মলিনতায় পরিপূর্ণ হয় না !!!

তবে আর তাহাদিগের হতভাগ্য জীবাত্মার উপায় কি? ইহা চিন্তা করিয়াই আমাদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী বিজ্ঞ-চূড়ামণি শাস্ত্র কর্ত্তারা পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারী মনুষ্য-দিগের পক্ষে প্রাত্যহিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেরই পারত্রিক দণ্ড ও পুরস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ যে সকল অসৎ কার্য্যের প্রকৃতপক্ষে ঐহিক অনিষ্টরূপ দণ্ডই ঘটিবে, স্থল বিশেষে শাস্ত্র-কর্ত্তারা তাদৃশ কার্য্যেরও পারত্রিক দণ্ড বিধানের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তি হইতেই হিন্দুশাস্ত্রে "পূতিকা ব্রহ্ম-ঘাতিকা"—পূতি শাক ভক্ষণ করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে।

জ। ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এত ন্যূন এবং মূঢ়তা-প্রযুক্ত পারত্রিক বিশ্বাস এত অল্প যে, তাহাদিগের পক্ষে পারত্রিক আশা বা ভয় তাদৃশ প্রবল নহে। তাহারা ঐহিক আশা ও ভয়েরই পরতন্ত্র। এতাদৃশ ব্যক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রে পাপ-বিশেষে পারত্রিক দণ্ড ব্যতিরেকে ঐহিক দণ্ডেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

যদি নরকের বহ্নিতাপ সকলের পক্ষে তত ভয়ানক বোধ হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে পাপ-কর্ম্মের এত বাহুল্য থাকিত না। কোন্ জাতির শাসন-বাক্যে ঐহিক পাপের

ভীষণ পরিণাম বিষয়ে লোকদিগকে প্রবোধিত না করিয়াছে? যদি একবার নরকের যন্ত্রণা-বর্ণন পাঠ কর, হৃদয় কম্পিত হইবে, গাত্র উৎপুলক হইবে, এবং সংসারের সমুদয় দুঃখ লঘু বোধ হইবে। তথাপি পাপাচারীদিগের পাষাণময় অন্তঃকরণে সেই ভয়ের ভীষণমূর্ত্তি অঙ্কিত হয় না; তথাপি সে সমুদয় দুঃখ কাল্পনিক ও অপরিস্ফুট বোধ হয়; তথাপি পরদ্রব্য হরণার্থ বিসারিত হস্ত সহজে সঙ্কুচিত হয় না। তথাপি পাপকার্য্যে বিষের ন্যায় অপরক্তি হয় না, ইহার কারণ কি? কিন্তু যদি বলা যায় যে, দেবভক্তি না করিলে মনুষ্যের গুণবান্ সন্তানের মৃত্যু হইবে এবং তাহার আবাস স্থল নানাবিধ দুঃখের রঙ্গভূমি হইবে, তবে কোন্ মনুষ্য দেবভক্তি প্রদর্শন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ফলতঃ এই কারণেই হিন্দুর লৌকিক শুভাশুভের সহিত ধর্ম্ম কার্য্যের এক অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় সম্পর্ক হইয়াছে। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রের মতে সুবর্ণচৌর ব্যক্তি কেবল পারত্রিক দণ্ড পাইবে এমন নহে; জন্মান্তরে সুবর্ণচৌরের নখ বিশ্রী হইবে এবং সে ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের ঘৃণাপাত্র হইবে। ৯।,৯।৮

ঋ। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক স্থলে দণ্ড পুরস্কারাদি বিষয়ে অর্থবাদ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সত্যোপলক্ষে অতিরিক্ত বর্ণন আছে।

এ। কোন একটি কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রধান ও অপ্রধানাদি বিবিধ অঙ্গ থাকিলে, তন্মধ্যে প্রধান অঙ্গই অবশ্য অনুষ্ঠেয়। অপ্রধান অঙ্গের হানি হইলে, প্রকৃত কার্য্যের হানি হয় না।

এই সকল সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে বিবিধ শাস্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সকল শাস্ত্রের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে; সুতরাং এক প্রকার মাত্র শাস্ত্র পাঠ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম নির্ণীত হইতে পারে না; প্রত্যুত অনেক স্থলে বৈপরীত্য ভাব নির্ণীত হইয়া উঠে। আবার কেবল প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কতকগুলি শাস্ত্র পাঠ করিলেই হইবে না। তর্ক ও যুক্তি রহিত বিচার দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণীত হয় না।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥" *

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা আর্ষ অর্থাৎ বেদশাস্ত্র এবং ধর্ম্মোপদেশ অর্থাৎ স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন। ইতর অর্থাৎ তর্করহিত ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না।

শাস্ত্র সকলের পরস্পর সাপেক্ষতার বহুতর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। আগম শাস্ত্রের উল্লিখিত মদ্য, মাংস, মুদ্রা প্রভৃতি পঞ্চোপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য "আগমসার" গ্রন্থ পাঠ না করিলে স্থির হইতে পারে না। †

উল্লিখিত সাপেক্ষতা বোধের অভাবেই বিতণ্ডাদ্বারা ঋক্

---

* প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত মনুবচন।

† এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে।

বেদের একটী ঋকের অর্থান্তর করিতে গিয়া চিরকালের একত্রিত-মূল আর্য্যজাতি হইতে "জরথুস্ত্রস্প্রিতম" নামক ব্যক্তির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা আদিম মুসলমান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ কারণে একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে শৈব শাক্তাদি পঞ্চবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বতঃসিদ্ধ মানসিক প্রকৃতি অনুসারে একমাত্র মানবজীব অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে। তদনুসারেই একমাত্র হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী বা অন্তর্ভূত জাতির সৃষ্টি ও শাস্ত্রে তাহাদিগের পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রের উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ লইয়া বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে বিদ্বৎসমাজে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে। অথচ এই জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের কঙ্কাল স্বরূপ। এই নিমিত্ত জাতিভেদ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা একান্ত আবশ্যক।

ক। আর্য্য জাতীয় তীক্ষ্নমনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥" *

পদার্থ সাত প্রকার। যথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও অভাব।

---

* "বৈশেষিক" দর্শনের অন্তর্গত "ভাষা পরিচ্ছেদ"।

"সামান্য" পদার্থেরই নামান্তর "জাতি" পদার্থ। জাতির লক্ষণ এই,—

" নিত্যা অনেক-সমবেতা জাতিঃ। "

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, এবং যাহা অনেক সংখ্যক পদার্থে সমবেত অর্থাৎ যাহা এক কালে একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহার নাম "জাতি"।

তাৎপর্য্য এই যে, জাতি শব্দে শ্রেণী বুঝায়। একবিধ একাধিক পদার্থকেই শ্রেণী শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। আর এই দৃশ্যমান জগৎ একাধিক দ্রব্য ও একাধিক গুণাদির সমষ্টি; সুতরাং যাবৎ জগৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ ঐ জাতি বা শ্রেণী পদার্থ বিলুপ্ত হইবে না; এই নিমিত্ত ঐ জাতি-পদার্থ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(খ) ঐ জাতি-পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা—

" পরা " অর্থাৎ সাধারণ জাতি এবং " অপরা " অর্থাৎ বিশেষ জাতি।

" ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ
ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ ॥ "

যে জাতি-পদার্থ ব্যাপক অর্থাৎ বহুব্যাপী, তাহা পরা জাতি; এবং যাহা ব্যাপ্য, অর্থাৎ অল্প-ব্যাপী তাহা অপরা জাতি।

(গ) দ্রব্য পদার্থ ও গুণ পদার্থের ইতর বিশেষই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি পদার্থ উৎপন্ন হইবার কারণ।

রসায়নশাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুইটী পরমাণু সমষ্টির গুণ একবিধ, তিনটী পরমাণু সমষ্টির গুণ অন্যবিধ। এইজন্য ঐ দ্বিবিধ পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত।

সচেতন জীবদিগেরও আহারের ইতর বিশেষ এবং ব্যবহার্য্য জল বায়ুর ইতর বিশেষ দ্বারা শারীরিক পরমাণুদিগের অন্যথাভাব অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইহাও শারীরবিধান শাস্ত্রের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনুষ্যমাত্রের শরীর যে একবিধ বা এক-পরিমিত পরমাণুতে নির্ম্মিত, ইহা বলিবার উপায় নাই। অতএব "দ্রব্য ভেদে" মানব জাতির শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত হইয়াছে।

যেমন নীলপীতাদি বর্ণ এবং অম্লমধুরাদি রস ইত্যাদি গুণভেদে অচেতনদ্রব্যপদার্থের শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ সর্ব্ববাদিসম্মত, সেইরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে সচেতন জীবদিগের জাতিভেদ অপরিহার্য্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ঐরূপ কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে,—

"সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥" *

---

* ভগবদ্গীতা উপনিষৎ।

হে মহাবাহো! (অর্জ্জুন) প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অব্যয় স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ ধারণ করাইয়া দেহী অর্থাৎ প্রাণী রূপে (সংসারে) বদ্ধ করে।

"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগতঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধি কর্ত্তার মব্যয়ম্॥" *

তত্র সত্বগুণ-প্রধানাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং শমদমাদীনি কার্য্যাণি। সত্বমিশ্রিত-রজোগুণ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কার্য্যাণি। রজোমিশ্রিত-তমোগুণ-প্রধানাঃ বৈশ্যাঃ, তেষাং বাণিজ্যাদীনি কার্য্যাণি। তমোগুণ-প্রধানাঃ শূদ্রাঃ, তেষাং ত্রিবর্ণশুশ্রূষারূপাণি কার্য্যাণি।

ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে, মানকগণের গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ বিভাগ আমারই সৃষ্ট। অতএব আমাকে (সগুণ অব-

---

* শম দম প্রভৃতি কার্য্য শাস্ত্রান্তরে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥"

[ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়]

শম, (ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) দম, (শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, আর্জ্জব, (সরলতা,) জ্ঞান, (আত্মা অনাত্মা বিষয়ক বোধ) দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব (ঈশ্বর ভক্তি) ও সত্য বাক্য এই একাদশটী ব্রাহ্মণের লক্ষণ অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্থায়) ঐ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানিও, অথচ (নির্গুণ অবস্থায়) আমি উহার কর্ত্তা নহি, ইহাও জানিও।

ঐ জাতিবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ এইরূপ ;—

মানবজাতির মধ্যে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সত্বগুণের প্রধানতা আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; শম দম প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের অবলম্বনীয়। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ সত্বগুণ এবং প্রধান রূপে রজঃ গুণ আছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; শূরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধাদি কার্য্যই তাঁহাদের অনুষ্ঠেয়। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ রজোগুণ এবং প্রধান রূপে তমোগুণ আছে, তাঁহারা বৈশ্য ; বাণিজ্যাদি কার্য্যই তাঁহাদিগের অবলম্বনীয়। যাঁহাদিগের কেবল তমোগুণ প্রধানরূপে বিদ্যমান, তাঁহারা শূদ্র ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির শুশ্রূষাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দেশ আছে যে,

"আকৃতিপ্রকৃতিগ্রাহ্যা
জাতিঃ কর্ম্মানুসারিণী।"

মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি দ্বারা জাতিভেদ জানা যাইবে। জাতি পদার্থ মনুষ্যদিগের কর্ম্মের অনুসারিণী ; অর্থাৎ মনুষ্যেরা আপন আপন পাপ-পুণ্যাদি কার্য্যের ফলস্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত শাস্ত্র-ব্যবস্থাতে আকৃতি ও প্রকৃতির প্রভেদ

মনুষ্যদিগের জাতিভেদের কারণ ও লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জগতের প্রকৃত ঘটনার সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলে শাস্ত্রব্যবস্থার একান্ত যুক্তিসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়া উঠে।

ফলতঃ পূর্ব্বলিখিত দার্শনিক সূত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, "ব্রাহ্মণ" বা "ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি প্রত্যেক শব্দে যখন একবিধ বহুসংখ্যক প্রাণীকে বুঝাইতেছে, তখন উহা যে শ্রেণী বা জাতি শব্দের বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার দ্রব্য ও গুণের ইতর বিশেষ যদি একই জাতির অর্থাৎ সাধারণ জাতির অন্তর্গত বিশেষ জাতি উৎপন্ন হইবার কারণ হইল, তবে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই মনুষ্য-জাতি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা অনুভব হইতে পারে না।

জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসাধনের উপযোগী। একবিধ পদার্থ দ্বারা সাধনীয় কার্য্য, অন্যবিধ পদার্থ দ্বারা সাধন করা যায় না। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ মানব, যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, তখন তাহাদিগের সকলের দ্বারা একবিধ কার্য্য সাধন সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে জাতিবিশেষের পক্ষে উল্লিখিত রূপ কার্য্যবিশেষ অবলম্বনের আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঘ। জাতিভেদবিষয়ে শাস্ত্রান্তরে অন্যরূপ ব্যবস্থাও দেখা যায়। যথা—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" *

বিধাতা, জীবদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নি র্বর্ণ এবচ॥" †

পূর্ব্বকালে, একমাত্র বেদশাস্ত্র ছিল; সকল বাক্যের মূল-স্বরূপ একমাত্র প্রণব ছিল; দেব সকলের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, অন্য কেহই ছিলেন না; (চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে) একমাত্র অগ্নি ছিল; (চারি বর্ণের মধ্যে) একমাত্র বর্ণ অর্থাৎ জাতি ছিল।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা এবং যুক্তির সহিত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে, সৃষ্টিকাল অবধি ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রের কল্পনাবিশেষ। যথাক্রমে চারি জাতির উৎকর্ষ ও নিকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইতে উৎপত্তি এবং এই জাতি বিভাগ যে, দীর্ঘকাল হইয়াছে, তাহা বুঝাই-

---

* মনুসংহিতা।

† ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়।

বার জন্য সৃষ্টিকালাবধি উৎপত্তির বিষয় কল্পিত হইয়াছে। আর, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের মানসিক গুণভেদ স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হয় নাই। এই জন্য সেই সময় লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বিশেষে পূর্ব্বকালে একমাত্র জাতির অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

৬। কার্য্য বিশেষ অবলম্বন দ্বারা মনুষ্য জাতির প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণজাতি নিকৃষ্ট জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলে, জাত্যন্তরে অধঃপতিত হইতে পারেন। এই জন্য শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যে যুক্তিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি নিকৃষ্ট জাতির কার্য্যাবলম্বন দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইতে পারেন, সেই যুক্তিতে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিরাও দীর্ঘকাল তপস্যাদি উৎকৃষ্ট জাতির কার্য্যাবলম্বন দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ কার্য্যবিশেষের অবলম্বন দ্বারা মানসিক স্বতঃসিদ্ধ সত্বাদি গুণের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। কাল-বিশেষে ব্রাহ্মণ জাতিতে শূদ্রবৎ-প্রকৃতি এবং শূদ্র জাতিতেও ব্রাহ্মণবৎ-প্রকৃতি মানবের উৎপত্তি হইতে পারে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥" *

---

* মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়; ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতেও এইরূপ উৎপত্তি হইতে পারে। অর্থাৎ সময় বিশেষে বিবিধ কারণে মানসিক-প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা চারি জাতির প্রত্যেক জাতি হইতে অপর তিন জাতীয় ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে পারে।

চ। একবিধ জাতি হইতে অন্যবিধ জাতির উৎপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু যাবৎ এক জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির সমান না হয়, তাবৎ কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির কার্য্য অবলম্বন করিলে তাহা সুচারু-রূপে সম্পাদিত না হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন; কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। এইজন্য দূরদর্শী ও পরম হিতৈষী হিন্দু শাস্ত্র-কর্ত্তারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং।
ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা॥"

স্ত্রীলোক, শূদ্রজাতি ও দ্বিজবন্ধু (অর্থাৎ অসদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এই সকল ব্যক্তির, "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় শ্রবণের অধিকার নাই।

এতাদৃশ ব্যবস্থা দর্শনে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের জাতি-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, উল্লিখিত বেদত্রয় যেরূপ

গূঢ়ার্থ, তাহাতে নির্ব্বোধ ও মূঢ়প্রকৃতি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিলে, প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম উপার্জ্জন পূর্ব্বক উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং এতাদৃশ ব্যবস্থা দ্বারা শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের পক্ষপাত দূরে থাকুক, মানবমাত্রের প্রতি পরম হিতৈষিতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

(ছ) প্রস্তাবিত স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির প্রকৃতি-তুল্য হইয়াছে কি না, তাহা অসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে।

একমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যে যে কারণে, অর্থাৎ যে মানসিক প্রকৃতি-ভেদ-রূপ গুরুতর কারণ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই কারণেই ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালীও সাধারণতঃ দুই ভাগে পরিগণিত। প্রথম, সাকার উপাসনা; দ্বিতীয়, নিরাকার উপাসনা।

সাকার উপাসকদিগের মধ্যে প্রকৃতিভেদে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর এই পাঁচ সম্প্রদায় হইয়াছে।

ঐ কারণেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আবার আংশিক বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা,—শাক্ত সম্প্রদায়ে বীর ভাব ও পশু-ভাব; বৈষ্ণবদিগের রামানুজ সম্প্রদায়, চৈতন্য সম্প্রদায় ইত্যাদি; চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নেড়া, বাউল ইত্যাদি।

এক নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য দেখা যায়।

কতকগুলি যুক্তিপথাবলম্বী; কতকগুলি যুক্তিপথত্যাগী অর্থাৎ গোঁড়া।

শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উপাসনা-প্রণালী সকলের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত; কোনটী তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। কোনটীতে সারাংশ অধিক, অসারাংশ অল্প; কোনটীতে অসারাংশই অধিক। স্থূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপান স্বরূপ; * —নিরাকার উপাসনাই নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ;—নির্ব্বাণ মুক্তিই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য।

ভিন্ন ভিন্ন সাকার উপাসনা দ্বারা যথাক্রমে উন্নতি সোপানে উত্থিত হওয়া অল্প দিবসের কার্য্য নহে। এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি-গণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া জীবাত্মার জন্মান্তর অর্থাৎ পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়াছেন।

এই কার্য্যটী যেমন বৃহত্তম ও মহত্তম, ইহার উপকরণও তেমনই অধিক। বহুজন্মে বহুতর যত্ন-সাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক দানধ্যানাদি সৎকর্ম্মই ইহার উপকরণ স্বরূপ। প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ সুবিস্তৃত মহাসাগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান-নেত্র দ্বারা এই বিষয়ের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে অন্তরাত্মা প্রথমতঃ বিস্ময়ে অভি-

* কোন কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে সাকার উপাসনার যে মুক্তিকারণতা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তিজনক অর্থবাদ মাত্র।

ভূত, অনন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। হিন্দুশাস্ত্র সকলের মধ্যে সাকার উপাসনা প্রণালীতে চারিটী প্রধান কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রথম। যাবৎ মনুষ্যের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না। অথচ জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী। চেতনাচেতন যাবদীয় পদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূল-জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-বোধ সংস্থাপন করে, আর তিনি বস্তুতঃ মনুষ্যবৎ সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন, এরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও দয়াদি প্রকাশ করিতে অভ্যাস করে, তবে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল ও নিশ্চল হইবে, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই যুক্তিতে ঈশ্বর-মূর্ত্তির "আত্মবৎ সেবা" নামক প্রথম কৌশল সৃষ্ট হইয়াছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রের পৌত্তলিক আরাধনা ঘটিত যাবদীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতে সমুদ্ভূত।

দ্বিতীয়। যখন এরূপ জ্ঞান জন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা থাকিলেও কোন জড়মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরাংশ বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করেন না; মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই; তখন তাঁহাকে কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। কিন্তু সম্মুখস্থ কোন মূর্ত্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয়

পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তি-প্রকাশের চিহ্ন, এরূপ আর কিছুই নহে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া "চিত্র বা নির্ম্মিত-মূর্ত্তিতে সচেতনত্ব কল্পনা পূর্ব্বক ঈশ্বরপূজা" রূপ দ্বিতীয় কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনাদি ঘটিত যাবদীয় ব্যবস্থা এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

তৃতীয়। ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা যখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব-বোধ দৃঢ় হইয়া আইসে, তখন নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ব্যতিরিক্ত যে কোন বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বর-পূজার সফলতা অনুভব হয়। তজ্জন্য "বাহ্য-পূজা" রূপ তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

তাম্রকুণ্ড ইত্যাদি জলপাত্রে, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয়ে এবং তুলসী বৃক্ষাদি বা ঘটাদিতে পূজা এই কৌশল হইতে উৎপন্ন।

চতুর্থ। ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যখন এরূপ বোধ হয় যে, জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ, তখন আপন দেহ মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হয়। তৎকালের নিমিত্ত "আন্তরিক আত্মপূজা" নামক চতুর্থ কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাত্যহিক পূজাকালে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মানসিক পূজা ইত্যাদি এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

অতি সংক্ষেপে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটী কথা লিখিত হইল। মহাসাগরের সমস্ত তলপ্রদেশ অন্বেষণ

অথবা হিমালয়কে বিচূর্ণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রত্ন সকল সংগ্রহ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার; জ্ঞান-নেত্রের অলক্ষীভূত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন আদিম কাল হইতে যে হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবহ-মান রহিয়াছে, কোটি কোটি বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যাহার চর্চ্চা করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, অল্প সময়ের মধ্যে অতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাহার প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করা ও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া তেমনই দুরূহ ব্যাপার। অতএব পাঠক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, আপনারা অপক্ষপাত-চিত্তে যথার্থ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার সহিত উপক্রমণিকা অংশের উল্লিখিত স্থূল তত্ত্বগুলির পর্য্যালোচনা করুন; তাহা হইলেই গ্রন্থকর্ত্তার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহা কি পরিমাণে সঙ্গত বা অসঙ্গত, বোধ করি, তাহাও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের যাবদীয় শাস্ত্র প্রকৃত-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরোপাসনা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে সময়-বিশেষ ও পাত্র-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথাসময়ে ও যথা নির্দ্দিষ্ট পাত্র অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য অবলম্বন করিলেই শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। নতুবা অনিষ্টের সীমা থাকে না। প্রথম অধ্যায়ে এই প্রস্তাবিত বিষয়েরই আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে,—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥" *
[২৩]

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানাং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥" *
[২৩]

---

* ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে) মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার হৃদয়ে না জানিবে, (অর্থাৎ ধ্যান দ্বার আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে) সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর যখন বুঝিবে যে আমি (পরমাত্মা) সর্ব্ব-প্রাণীতে বাস করিতেছি, তখন সর্ব্ব প্রাণীর আত্মাকেই দানে, মানে ও মৈত্রভাবে অর্চ্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ন নেত্রে অবলোকন করিবে।

এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে, তাবৎ অন্তঃকরণের নিশ্চলতা ও নির্ম্মলতা সম্পাদনার্থ মনুষ্যকে সাকার উপাসনা করিতে হইবে।

শাস্ত্রান্তরে নিরাকার উপাসনার অধিকারী নির্ণয় বিষয়ে আরও স্পষ্টতর নির্দ্দেশ আছে। যথা—

" অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত-নির্ম্মলস্বান্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা। *

যিনি যথাবিধি বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলরূপে সকল বেদের অর্থ বুঝিয়াছেন, ইহ

---

* বেদান্তসার।

জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার পাপ ধ্বংস হওয়াতে অন্তঃকরণকে একান্ত নির্ম্মল করিয়াছেন, এবং নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চতুর্ব্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ প্রাণীই (মনুষ্য) ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপসনার অধিকারি।

স্বর্গাদি ইষ্টকামনায় যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। নরকাদি অনিষ্টসাধক কার্য্যকে নিষিদ্ধ বলা যায়। যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে (যেমন প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ও পিতামাতার প্রতিপালনাদি) নিত্য কর্ম্ম বলে। কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য হয় (যেমন অপুত্রক ব্যক্তির পুত্রকামনায় যজ্ঞাদি) তাহা নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়মাত্র-সাধক কার্য্যকে (যেমন চান্দ্রায়ন) প্রায়শ্চিত্ত বলে। সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের আরাধনাকে উপাসনা কহে। কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হীনতাকে অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা বলা যায়। ইহ কালের নিতান্ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের কিছু অধিকক্ষণ স্থায়ী (অনিত্য) সুখের ভোগ বিষয়ে বিরক্তিকে ইহামুত্র ফল-ভোগ-বিরাগ বলে।

শম, (ঈশ্বরের শ্রবণ, মননাদি ব্যতিরেকে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) দম, (ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) উপরতি,

(বিহিত কার্য্যের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে পারা) সমাধান (ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মননাদিতে আকর্ষিত মনের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা, (গুরূপদেশ ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন এই ষড়্‌বিধ কার্য্যকে শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি বলা যায়। নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

অদ্বৈত মতের প্রধান প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, অসংসারী ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ অনিত্যের সংসর্গ দোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না। যেমন অশ্ব লঙ্ঘন করিয়া যবস গ্রহণ হয় না, তদ্রূপ অপরিসমাপ্তকর্ম্মী কদাচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে না। পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্তি হইলে স্বভাবতঃই কর্ম্ম রহিত হইয়া যায়। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সহজেই সুলভ হয়। উপনিষদ্ শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাৎ।
অপ্রমত্ত স্তদা ভবতি যোগোহি প্রভাবাপ্যয়ৌ॥ ১১ *

যৎকালে (স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া) মনের সহিত পঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, (আত্মাতে) অবস্থান করি-

---

* কঠোপনিষৎ ষষ্ঠ বল্লী।

বে, এবং স্বব্যাপারে বুদ্ধির চেষ্টা না থাকিবে, সেই কালের যে গতি তাহাকেই পরমা গতি কহে। ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের নিশ্চলতারূপ তাদৃশী অবস্থাকেই যোগ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) বলে। তৎকালে অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জ্জিত হইবে, এই যোগপ্রভাব হয়।

আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় মহাশয় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইলে কর্ম্মকাণ্ডের তাদৃক্ প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্ম্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, উহা কোন মতে ত্যজ্য নহে। কেন না, তৎ-সাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বথা স্ফূর্ত্তি হয়, বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত-বিধি অনুসারে ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুর্ল্লভ। সকাম সাধনার নাম ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে।" তদর্থে বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ॥ ১ ॥ বেদান্তং।

কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে।

বেদের মর্ম্ম এই যে, যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবে, তাবৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিবে, কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে, অনন্তর সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ঋক বেদের অনুক্রমণিকাতে লিখিত আছেঁ যে,—

"ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংসস্যৈব ধর্ম্মঃ"।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরমহংসেরই ধর্ম্ম।

সুতরাং অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান সংসার-দোষ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে। তথাপি যে ব্যক্তি শাস্ত্রাতিক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সে জ্ঞানীদিগের নিকট অজ্ঞান, উন্মত্ত ও ভ্রষ্টাচারী রূপে পরিগণিত হয়।

যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কোন সংসারাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি সন্তরণ কার্য্যে সুশিক্ষিত নহে, সে ব্যক্তি নদী উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ নহে; ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাকে নদ্যাদি জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক অবশ্যই সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারাসক্ত ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহে, ইহা সত্য; কিন্তু যদি সংসারে অবস্থান কালে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস না করে, তবে কিরূপে তাহার তৎকার্য্যে পারগতা জন্মিতে পারে?

দূরদর্শী শাস্ত্র-কর্ত্তারা এরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদের মতে যদি সংসারী ব্যক্তির ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহাতে বাধা নাই। সংসারোচিত কর্ম্ম-

কাণ্ড অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞ ও দেব-পিতৃ-কার্য্য ত্যাগ না করিয়া, বৈধাবৈধ বিচার ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া, শাস্ত্র নিষিদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া ও প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সংসারী ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয়। যথা—

"ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে॥" *

যে ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্-বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক মাতৃপিতৃ-শ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্য বাক্য কহিবে, এবম্ভূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।

এতাদৃশ শাস্ত্র ব্যবস্থা সত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথত্যাগী স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মিথিলাধিপতি জনকাদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড-প্রবাহের অবরোধ হয় নাই; বরং তাঁহারা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দা, অপ্রসিদ্ধাহার ও সদাচার-পরিত্যাগ, অথবা ব্রত নিয়মোপবাস, এবং তীর্থ স্নানাদির ব্যাঘাত করেন নাই।

শাস্ত্রান্তরেও এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

---

* যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

"বহির্ব্যাপার-সংরম্ভো
হৃদি সংকল্প-বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত-
রেবং বিহর রাঘব ॥" *

বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছেন, হে রাম! তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর, মনে সংকল্প-রহিত হও, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। এইরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিও। অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান-প্রশংসা শ্রবণে ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যাঘাত করিও না। যে হেতু পরম হংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সংসারী ব্যক্তির কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লাভ হইতে পারে না।

শাস্ত্র-কর্ত্তারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে কেবল যে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মত্যাগের নিষেধ করিয়াছেন, এরূপ নহে; প্রবলতর প্রত্যবায় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ নিষেধের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং সপক্ষা ইব জাতপক্ষাঃ ॥" †

---

* যোগ বাশিষ্ঠ।

† মনু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ সংহিতাদি।

মনুষ্য যদি ব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি আচারহীন ব্যক্তিকে বেদসকল পবিত্র করিতে পারেন না। যেমন পক্ষি শাবকের পাখা জন্মিলে সে আপন নীড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ সকল আচারহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে ত্যাগ করিয়া গমন করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত মানবগণ সদাচার অনুষ্ঠান করেন, তাবৎ বেদ সকল তাঁহার পারত্রিক মুক্তি সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করেন; আচারহীন হইলেই পরিত্যাগের কারণ পাইয়া ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন।

ইহা সত্য বটে যে, ব্রহ্মোপাসনার মুখ্যত্ব আছে; কিন্তু তাহা সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নহে। ব্রহ্মানুষ্ঠান পরম-হংসের ধর্ম্ম। সংসারী ব্যক্তিকে নিয়ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হয়, নচেৎ পতিত হইতে হইবে। যথা—

"সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনম্
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজে দন্ত্যজংযথা ॥" *

শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ দেব কহিয়াছিলেন যে, সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্মজ্ঞ, আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

---

* যোগবাশিষ্ঠ।

এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্য যে পর্য্যন্ত আপন অন্তঃকরণকে নিশ্চল ও নির্ম্মল করিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ সংসারে থাকিয়া বিবিধ সাকার দেব দেবীর আরাধনা ও বহুতর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিতে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে সাধুব্যক্তিদিগের নিকট নিরাকার ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও আরাধনার আবশ্যকতা শ্রবণ করিবে। ক্রমশঃ মনের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা এবং জ্ঞানালোকের প্রখরতা উপস্থিত হইলে, অল্পজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তের নিমিত্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সকল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তাহাতে ফল কামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। পরিশেষে প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তা, নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকালের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সর্ব্বশাস্ত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মল জ্ঞান উপস্থিত হইলে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তির উপায় দেখিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথমতঃ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বিষ্ণুমূর্ত্তির কল্পনাকে এইরূপে অধ্যাত্ম কল্পে স্ফুট করা হইয়াছে।

ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞরূপ পুরুষ, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারা তাঁহার দেহ নির্ম্মাণ হইয়াছে।

প্রাকৃত শরীরের ন্যায় তাঁহার শরীরের নাশ নাই। শুদ্ধ জীব চৈতন্য তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তুভ মণি। নানা গুণময় মন্ত্রগ্রথিত যজ্ঞসমূহ তাঁহার বন মালা। চৈতন্যের প্রকাশ তাঁহার শ্রীবৎস, অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী। ছন্দোময় বরণীয় তেজঃ তাঁহার পীতবস্ত্র। প্রণব তাঁহার যজ্ঞোপবীত। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি ও সাংখ্য যোগ তাঁহার কর্ণভূষণ, অর্থাৎ মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়। তদ্‌বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ তাঁহার শিরোদেশ। সত্বগুণ তাঁহার পদ্ম। প্রাণতত্ত্ব তাঁহার গদা। জলতত্ত্ব তাঁহার শঙ্খ। তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন চক্র।

বিষ্ণুপুরাণে ব্যক্ত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাঁহার হস্তচতুষ্টয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুরবস্থা তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র। অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থা গদা। স্বপ্নাবস্থায় মনঃস্বরূপ সুদর্শন। সুষুপ্তাবস্থায় জলতত্ত্ব শঙ্খ। তুরীয়াবস্থায় সহস্রাক্ষ পদ্ম। আকাশ তত্ত্ব তাঁহার অসি তমোময় চর্ম্ম। কালরূপ ধনুঃ। সকাম নিষ্কাম কর্ম্মময় তূণদ্বয়। ইন্দ্রিয়গণ শর। ক্রিয়া শক্তিরথ। বেদময় সুপর্ণ বাহন। রূপ, রস ইত্যাদি বিষয় রথ-প্রকাশ অর্থাৎ অভিব্যক্তি। বরাভয়াদি, মুদ্রা। ধর্ম্ম এবং যশঃ তাঁহার চামর দ্বয়। মুক্তি তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম। সন্তাপহারক বেদান্ত তাঁহার ছত্র। চিৎশক্তিই তাঁহার লক্ষ্মী ও অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার দ্বারপাল হয়।

এই সকল শ্রবণ ও চিন্তন করিলে, কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপ অনুভব না করিবেন যে বিষ্ণুমূর্ত্তি কেবল পরমাত্মার প্রকারান্তরে বর্ণনা মাত্র।

এক্ষণে এই বিষ্ণু-নামার্থেরও বিবরণ ব্যাখাত হইতেছে। বিষ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশন। নু প্রত্যয়ের অর্থ ব্যাপ্তি। সুতরাং বিষ্+নু অর্থাৎ "বিষ্ণু" শব্দে যিনি বিশ্ব ব্যাপক তাঁহাকে, অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মাকেই বুঝায়।

ইহার নামান্তরেরও অর্থ এইরূপ। যথা—

নার শব্দে জল এবং জীব সমূহ। অয়ন শব্দে আশ্রয়। সুতরাং "নারায়ণ" শব্দে যিনি জলে এবং সর্ব্বজীবে আত্মারূপে আশ্রয়স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই বুঝায়।

কৃষ=উকৃৎষ্ট, নি=নিষ্পত্তি, সুতরাং "কৃষ্ণ" শব্দে যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়, তাঁহাকে অর্থাৎ সর্ব্ব-সামঞ্জস্যকারী পরমাত্মাকে বুঝায়। অথবা ক বর্ণের অর্থ ব্রহ্মা। ঋ বর্ণের অর্থ অনন্ত। ষ বর্ণের অর্থ শিব। ন ধর্ম্ম। সুতরাং ক্+ঋ+ষ+ন অর্থাৎ "কৃষ্ণ" শব্দে যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করেন; যিনি অপরিসীম; যিনি শিবরূপে সংহার করেন এবং যিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মময় তাঁহাকেই বুঝাইবে। অথবা কৃষ্=কৃৎস্ন, ন=আত্মা, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবের আত্মা তিনিই কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং কতকগুলি নামান্তরের ব্রহ্মবিভূতির স্বরূপতা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

আত্মা আকাশ শরীরী। শ্রুতিপ্রমাণে আকাশ অতি স্বচ্ছপদার্থ; কিন্তু নীলবর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। একারণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম "নীল নীরদ বর্ণ" হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম পীতাম্বর; তন্মর্ম্মে এই যে "রবিকর-গৌরাম্বরং দধানং" এই বাক্যটী আত্মার বিশেষণ। তেজঃস্বরূপ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থান হেতু রবির কিরণ তাঁহাকে আচ্ছাদন করে। একারণ পীতাম্বর পরিধেয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিমূলে মকর-কুণ্ডল দোদুল্যমান আছে এবং সেই কুণ্ডলচ্ছলে শ্রুতি অতি সংকুচিতা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীকৃষ্ণ সগুণ কি নির্গুণ ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, সগুণ, নির্গুণ উভয় প্রতিপাদক অর্থাৎ বেদবাক্য সঙ্কুচিত ও দোলায়মান হইয়াছে। মকরাকৃতি বলাতে, তাৎপর্য্য এই যে, মকর জন্তু রসনাহীন, তাহার যেমন রসজ্ঞান নাই এবং বাক্‌শক্তিও নাই, শ্রুতিও তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ে বাগিন্দ্রিয়-রহিত এবং ব্রহ্ম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম। তন্মর্ম্ম এই যে, ঐ নামে ত্রিসর্গ-ভঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মাতেই সৃষ্টি-সর্গ, আত্মাতেই স্থিতি-সর্গ ও আত্মাতেই লয়-সর্গ। এই ত্রিসর্গ পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ হইতেছে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার যে মৃদু মৃদু হাস্য, তাহাই জগদুন্মাদিনী মায়া। এই জন্যই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

"সিঞ্চাঙ্গনস্ত্বধরামৃত-পূরকেন হাসাবলোক ইত্যাদি।"

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম নয়ন বলাতে, ভগবৎ-প্রেম-কৌটিল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রেম করিতে হইলেই সংসারের সরল পথকে ত্যাগ করিয়া বক্রপথে গমন করিতে হয়। যথা—

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ সদৈব কুটিলা গতিঃ।"

অর্থাৎ ভুজঙ্গের ন্যায় প্রেমের সদাই কুটিলা গতি।

সমস্ত বিশ্ব আত্মাতে গ্রথিত। এজন্য বিশ্বকে "তদ্বন" বলিয়া কেনেষিত উপনিষদে ব্যাখ্যা করেন। বন শব্দে একত্র স্থিত বৃক্ষসমষ্টি। সুতরাং সমস্ত বিশ্বস্থ বস্তু আত্মসূত্রে গ্রথিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকে বনমালী বলা হইয়াছে। নট শব্দে মায়াবী, অর্থাৎ বাজীকর। বাজীকরেরা অস্বরূপে স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা তাহা হইতেও আশ্চর্য্যরূপে মায়া প্রদর্শন করেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণকে নটবর অর্থাৎ নটশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি করিয়াছেন। এই বিশ্ব যাঁহার নাট্য, তাঁহার নাম নটবর। যিনি অনন্তাক্ষ সংকর্ষণ তিনিই জীব। এখানে তাঁহাকে বলরাম নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি সখাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহ অর্থাৎ পরমাত্মা সহ ক্রীড়া করেন। শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রীদামাদি অন্যান্য গোপসকল। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—উদ্ধব অক্রূরাদি স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব বিরোধী মহামোহাদি—কেশী, কংস, মুর, নরকাদি অসুর। নিকৃতি মায়াত্মজা পূতনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপর বলাশন অর্থাৎ 'কফ" আত্মতত্ত্ব বিদ্বেষকারী রমণাত্মক ভুজঙ্গ স্বরূপ। কারণ

উহা পিঙ্গলা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া বিষবৎ প্রাণায়াম যোগের বিঘ্ন করে। কিন্তু সাধকের মানস-হ্রদে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তিনি সেই বিঘ্নকারী বলাশনকে দ্বীপান্তরে দূরীকৃত করেন; অর্থাৎ রমণক দ্বীপবৎ অসাধক ব্যক্তির হৃদয়কে সেই ভুজঙ্গ আশ্রয় করে। ইহাই জানাইবার নিমিত্ত "কালীয়দমন" প্রস্তাব সংঘটিত হইয়াছে। তথায় কফই যোগ-বিঘ্ন-কারী; হৃদয় কালীয় সর্প। পিঙ্গলা যমুনা নদী। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। অসাধু হৃদয়ই রমণক দ্বীপ।

তৎপরে নামরূপের আরও ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। যথা—হরি; হৃ-ধাতুর অর্থ হরণ, ই = কর্ত্তা; সুতরাং হৃ + ই অর্থাৎ "হরি" শব্দে যিনি সংসাররূপ অধিহরণ করেন, তাঁহাকেই বুঝায়। অপর "হরি" শব্দ মঙ্গল বাচক; কারণ তিনি পুনঃ পুনঃ অমঙ্গলরূপ মৃত্যুকে নিবারণ করিয়া থাকেন। বাসু—প্রলয়ে যাহাতে সকলের বাস, দেব—স্বতঃ-প্রকাশ, দীপ্তিমান্ পুরুষ; সুতরাং "বাসুদেব" শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়। গো—পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকল, পাল—রক্ষণ। সুতরাং যিনি জগৎ-পালক অর্থাৎ রক্ষক তিনিই "গোপাল" শব্দে বাচ্য হন।

এইরূপে কালরূপাত্মক শিবের নাম-রূপার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিকে কালরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

> "মহাকালো জগৎ কর্ত্তা, শিবঃ পুরাণ পুরুষঃ"
>
> এবং "বাসুদেবো জগন্নাথো, ভগবান্ কালপুরুষঃ।"

এস্থলে সৃষ্টিকাল ব্রহ্মারূপ, পালন কাল বিষ্ণুরূপ এবং সংহারকাল শিবরূপে কল্পিত হইয়াছেন। সেই মহাকাল যে শিবরূপ, তাহা তাঁহার রূপ ও অবয়বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই চিন্তাশীল সাধকের বোধগম্য হইতে পারে। কালমূর্ত্তি শিব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালদর্শী। এই কারণেই শিব ত্রিলোচন ধারণ করিয়াছেন। এই সংসার জরাবস্থায় নিধন দশা প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কালে, প্রলয়াগ্নি-তাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ শিবকে ভস্ম-ভূষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালে জীব-নিকরের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়; এজন্য অনাদি-নিধন শিবকে "কঙ্কালমালী" বলিয়াছেন। কালে, নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; একারণ শিবের করকমলে নর-কপাল সংস্থিত হইয়াছে। মুক্তিকালে জীব সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করে, সুতরাং তাহারা আর পুনর্ব্বার জাগরিত হয় না, অর্থাৎ সকলে শ্মশান-শায়িত হয়; এই কারণে শাস্ত্রে শিবকে শ্মশানালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, শ্মশানভূমিতে মহাদেব-বাসের আরও এই কারণ যে, কালরূপে শঙ্কর সর্ব্ব-সংহারক হন। অপর, কালে সকল জীবেরই শিরোনিরস্ত অর্থাৎ নিপাতিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষিত হইয়াছে। কালের কালিমারূপ প্রদর্শন জন্য শিব নীলকণ্ঠ অর্থাৎ স্বীয় কণ্ঠদেশে কালের কালিমা-আভা ধারণ করিয়াছেন। কাল

অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং তাহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে। তদ্দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শিব দিগ্‌বাসা হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত সে সকল অঙ্গ হইতে প্রধান অঙ্গ। একারণ, কালস্বরূপ শিবকে পঞ্চানন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের অমোঘ-বীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শন হয়, তাহাতে উত্তমাধম মধ্যম পক্ষে নিয়তিই কালের প্রধানা শক্তি স্বরূপা হইয়াছে। সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল স্বরূপ। তাহা অব্যর্থ; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা কেহই করিতে পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্রক হউন না কেন, কালে তাঁহার নিধন হয় ও তাঁহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন; এই হেতু শাস্ত্রে শিবকে "ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধর" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভুজঙ্গ-কুল বশীভূত হইবার নিতান্ত অযোগ্য এবং অতি খল। কিন্তু তাহারাও কালের বশীভূত, ইহা দেখাইবার জন্য সদাশিব "ভুজঙ্গ-ভূষণ" হইয়াছেন। জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অতএব বৃষরূপী ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করিতেছেন। কোন মতে শিবকে যে চতুর্ভুজ রূপে বর্ণনা করেন, তাহাতে মহাদেবের চতুর্ব্বর্গ প্রদান ক্রিয়াই প্রমাণ হইতেছে। যথা—

"পরশু-মৃগ-বরা-ভীতি-হস্ত" মিত্যাদি।

যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তেই "কাম" অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পূরক "মৃগ মুদ্রা" হয়। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তেই

"অর্থ"; অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে না। যে হস্তে বর, সেই হস্তেই "ধর্ম্ম"; অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সন্দর্শন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তেই "মোক্ষ"। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয় শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্ত্তিই যে শিব; তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিষ্ণু ও শিব দেবতার নাম ও রূপের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে শক্তি পক্ষের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইবে।

এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইহার কিছুরই প্রকৃত বিদ্যমানতা নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্তই জগতের ব্রহ্মময়ত্ব অনুভূত হয় না।

জগদীশ্বরের "শক্তি" বা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি উৎপাদনক্ষমতাকে পুরাণাদি শাস্ত্রে বিবিধ নাম ও রূপ কল্পনা দ্বারা নানাবিধ দেবীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

মনুষ্যাদি জীব যে সকল কার্য্য সাধন করে, তাহা যে, তদীয় শক্তিদ্বারা সম্পাদিত, শক্তিহীন জড় দেহ দ্বারা নহে, এ বিষয়ে বোধ হয়, কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ঐ ভ্রমরহিত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র-কর্ত্তারা সর্ব্বশক্তিমান্

জগদীশ্বরের “ শক্তি ” পদার্থকে পরমার্চ্চনীয়া দেবীমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

ফলতঃ, যে কারণে আমরা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির জড়াত্মক শরীরের প্রশংসা করি না, কেবল সেই শরীরস্থ বিদ্যারই প্রশংসা করি ; যে কারণে পূজনীয় ব্যক্তিদিগের জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে সেই অচেতন জড়দেহের সেবা শুশ্রূষা করি না, কেবল জীবিত অবস্থাতেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সেবা শুশ্রূষা করি, সেই কারণে প্রকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির পূজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে,—

“ হর-গৌর্য্যাত্মকং জগৎ”

অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ হরগৌরীময়। তাৎপর্য্য এই যে, জগতের পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। এ স্থলে “ হর ” শব্দে পরম পুরুষ, এবং “ গৌরী ” শব্দে পরমা প্রকৃতি, এরূপ বুঝিতে হইবে।

বিবিধ শাস্ত্রীয় বাক্য এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে। তথাহি,—

“ স্ত্রীং লক্ষ্মীং পুরুষং বিষ্ণুম্ ” ইত্যাদি।

অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রই লক্ষ্মীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রই বিষ্ণুর অংশ।

তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ জাতিই সন্তানের উৎপাদক বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিরূপ প্রধান উপকরণ না হইলে, ঐ সন্তা-নোৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি বিষয়ে জগদীশ্বররূপ পরমপুরুষ কর্ত্তা বটেন, কিন্তু তদীয় শক্তিরূপ প্রধান উপকরণ না হইলে, ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

শাস্ত্র-প্রণেতারা কেবল ঈশ্বর-শক্তিরূপ মহামায়ার অ-স্তিত্ব বিষয়ে অন্বয়ী হেতু প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ব্যতিরেকী হেতুরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"যত্র নাস্তি মহামায়া
তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ যেখানে মহামায়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান নাই, সেখানে আর কিছুই নাই।

জগতের সৃষ্টি কেবল ঐশ্বরিক "শক্তি" বা প্রকৃতি হইতেই হইয়াছে; এবিষয়ে অভ্রান্ত সংস্কারাপন্ন শাস্ত্র-কর্ত্তারা চেতন বা অচেতন, পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তুমাত্রকেই মায়া শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদ শাস্ত্রে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রকেই "মায়া" বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। অতএব মহামায়াই সকল পদার্থ। বিনা মায়া মূর্ত্তি নাই; ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, ভ্রান্তের পক্ষে ঐ মায়া সংসার-বন্ধন-কারিণী; আর জ্ঞানীর পক্ষে উহা মোক্ষ-বিধায়িনী হয়েন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

অর্থাৎ সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর-স্বরূপা, সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর-শক্তি (পাত্র বিশেষে) মুক্তির হেতু এবং (পাত্র বিশেষে) সংসার-বন্ধনের হেতু হন।

শাস্ত্র মতে যে শক্তি মুক্তি-দাত্রী তিনিই " বিদ্যা "; আর যিনি সংসার-প্রবাহার্থবন্ধনকারিণী, তিনিই অবিদ্যা শব্দে পরিগণিত। এই মহামায়া প্রভাবেই এই জগতের সংস্থিতি হইয়াছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এ সকলেই প্রকৃতির রূপ ; বস্তুতঃ পুরুষের রূপ নাই। অতএব জগন্ময়ী প্রকৃতির আরাধনা ব্যতীত পরাৎপর পরম পুরুষে অধিগমন করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক মহামায়া প্রকৃতিই পরমারাধ্যা হইয়াছেন।

ঈশ্বর শক্তি বা প্রকৃতি বা মহামায়া এক পদার্থ। কদাচই দ্বিধাভুত বা বিভিন্ন নহে। যথা—

" সত্ত্বং রজস্তম ইতি
গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।
সাম্যাবস্থেতি যা তেষা
মব্যক্তপ্রকৃতিং বিদুঃ॥ "
(ইতি যামলম্)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমানাবস্থা, পণ্ডিতেরা তাহার নাম অব্যক্ত ও তাহাকেই প্রকৃতি বলিয়া জানেন।

"ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং
ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং
নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি যাঁহার নিজ ইচ্ছাতে উদ্ভূত হন এবং পুনর্ব্বার যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন, তিনিই নিত্যা (প্রকৃতি) বলিয়া পরিগণিত।

শাক্তেরা দুর্গাকে, বৈষ্ণবেরা কেহ লক্ষ্মী, কেহ বা রাধিকাকে, হৈরণ্যগর্ভেরা কেহ সাবিত্রী, কেহ বা সরস্বতীকে পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানেন। ফলতঃ একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিগণিত। তথাহি,—

"গণেশজননী দুর্গা
রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চৈব বিজ্ঞেয়া
প্রকৃতিঃ পঞ্চধা ইতি ॥"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তম্।

গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী, প্রকৃতি এই পঞ্চ প্রকার; অর্থাৎ এই পঞ্চ সংজ্ঞাতে অভিহিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রে ইহাও নির্দ্দেশ আছে যে প্রকৃতির উপাসনাতেই পরমাত্মার পরিতোষ জন্মে অর্থাৎ রূপনাম-বিশিষ্ট শক্তি-উপাসনাই ঈশ্বর সাধনার প্রধান উপায়। যথা,—

" নিত্যং স্ত্রীং পূজয়েৎ যস্ত
বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রকৃত্যস্তস্য সন্তুষ্টা
যথা কৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চনৈঃ ॥ "

যেমন ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন, সেই রূপ যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দনের দ্বারা নিত্য (প্রকৃতির অবতারস্বরূপ) স্ত্রীপূজা করে, তাহার প্রতি প্রকৃতি পরিতুষ্টা হয়েন।

সকল স্ত্রী যে ঐ প্রকৃতির অবতার স্বরূপ ইহা জানাইবার নিমিত্তই প্রকৃতি দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকাশমানা হন।

এক্ষণে বঙ্গদেশে অসাধারণ রূপে প্রচারিত "দুর্গা" এই শক্তি-মূর্ত্তির নাম ও রূপের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

প্রথমতঃ " দুর্গা " এই শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ এই শব্দ দ্বারা কিরূপ পদার্থের প্রতীতি উৎপাদন শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য, তাহা লিখিত হইতেছে।

" দুর্গ-নামকান্ অসুরান্ নাশয়তীতি দুর্গা " দুর্গ-নামক অসুরদিগকে যিনি নাশ করিয়াছেন, তিনি দুর্গা।

দুর্ শব্দের অর্থ দুঃখ, গ শব্দের অর্থ সাধনীয়, অতএব দুর্+গা অর্থাৎ দুর্গা শব্দে দুঃসাধ্যা। অর্থাৎ দুঃসাধ্য জ্ঞান-স্বরূপা শক্তিকে দুর্গা বলিয়া আখ্যাত করা যায়।

দুঃ শব্দে দুঃখ-সাধ্য তপোযোগাদি, গ শব্দে জ্ঞাতব্য,

অতএব দুর্গা শব্দে, যাঁহাকে বহুতর তপোযোগাদি দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে বুঝায়।

দুর্গ শব্দে দুর্জ্জয়, অব্যয় আকারের অর্থ জ্ঞানাত্মা; এনিমিত্ত দুর্গা শব্দে দুর্জ্জয়-জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে বলা যায়।

কিঞ্চ দুর্গ শব্দে সংসার, অব্যয়ার্থ আ শব্দে নিস্তার; সুতরাং যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-দুঃখের নাশ হয়, তিনিই দুর্গা নামে উক্ত হইয়াছেন।

দু শব্দে উৎকট, গ শব্দে গমন, র শব্দে নরক, আ শব্দে সংসার; অতএব যাঁহা হইতে জীবাত্মার সংসার রূপ উৎকট নরকে গমন নিবারণ হয়, তাঁহারই নাম দু+র্+গ +আ অর্থাৎ দুর্গা। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মা-স্বরূপা তাহাতে সংশয় নাই।

"দুর্গা" শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত হইল, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, দুর্গা নাম মহামন্ত্র-স্বরূপ, দুর্গা-নাম স্মরণে সমস্ত প্রকার দুর্গতি খণ্ডন হয়, দুর্গা নাম স্মরণ-ফলে ইহলোকোচিত সমস্ত প্রকার সুখভোগ করিয়া জীব পরলোকে পরমাত্মার পরম পদে অভিগমন করে। দুর্গাই পরমাত্মা-স্বরূপা, দুর্গা ভিন্ন অন্য এক পরমাত্মার অস্তিত্ব-বোধ ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র। বেদ শাস্ত্র যাঁহাকে বিশ্ব-ব্যাপক বিষ্ণু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই বিষ্ণুই প্রকৃতি রূপে প্রকটিত হইয়া জীবের শ্রেয়োবিধান করিয়াছেন।

হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র জ্ঞানে নিষ্পীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যক। কেবল সুশিক্ষিত একাস্ত্র-যুদ্ধে প্রায় জয় লাভ হয় না; এজন্য নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হত-পরাক্রম করিতে হয়। যুদ্ধ কালে রাজাকে বহুদিকেই দৃষ্টি করিতে হয়। এরূপ আয়োজনের ন্যূনতা থাকিলে, রাজা কখনই সম্যক্-জয় লাভের পাত্র হইতে পারেন না।

মানবগণকে এই উপদেশ দিবার নিমিত্ত ঐশ্বরী শক্তির মহিষ-মর্দ্দনচ্ছলে দুর্গা মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। তথাহি,—

দশভুজা দেবী দশভুজে অস্ত্রধারণচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা গ্রহণ শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যা-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধনসংগ্রহে কালাত্যয় না হয়, এজন্য রত্ন-পেটিকা সংস্থাপন স্বরূপে সর্ব্ব-রত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে দক্ষিণভাগে সংস্থাপন করিয়াছেন। বাহনারোহী সৈন্য-নায়ক স্বরূপে কার্ত্তিকেয়কে বাম পার্শ্বে এবং গজানন গণেশকে দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রু পক্ষকে সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ প্রদর্শনার্থ সিংহবাহন দেখাইয়াছেন। সর্ব্ব সমুদ্যোগী রাজা কখন শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়েন না, একারণ মৃত্যুঞ্জয় খ্যাপনার্থ মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশে বদ্ধ করিয়া অস্ত্র ক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র

জগতে আত্মা ভিন্ন বস্তু মাত্র নাই। সুতরাং দুর্গা এই সৃষ্টির কারণভূতা এবং উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্রী। দুর্গা মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কল্পনার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের ইহাই প্রতীতি জন্মিবে যে, পরম হিতৈষী পরমাত্মা মানবদিগের নিকট সংসারের সর্ব্বপ্রকার রীতি নীতি-পদ্ধতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সকল কার্য্যের সম্পাদনোপযোগী উপদেশ প্রদানার্থ স্বয়ং দুর্গারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দুর্গা মূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা শাস্ত্র কর্ত্তারা প্রধানতঃ মানবদিগকে রাজনীতি ও পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা ক্রমে এই দুই বিষয় যথাসাধ্য বর্ণিত হইতেছে।

সর্ব্ব প্রকার নীতির মধ্যে রাজনীতিই প্রধান। সেই রাজনীতির স্থূল তাৎপর্য্য এই, পৃথিবী-জয়ার্থী রাজা মন্ত্রীকে বামে স্থাপন করিয়া যুদ্ধকালে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক পররাজ্য জয় করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রু-বিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন বশতঃ রত্ন-পেটিকাকে দক্ষিণ হস্তের আয়ত্ত স্থানে রক্ষা করেন। হস্ত্যশ্বাদি-আরোহী সেনাপতি দুই পার্শ্বে সৈন্যগণকে রক্ষা করে। পর-সৈন্য বন্ধন হেতু পাশাদি বন্ধনরজ্জু প্রস্তুত থাকে। সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-শত্রুকে জর্জ্জরীভূত করিয়া বিশিষ্ট রূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। পরন্তু ক্ষুদ্র শত্রুও যদি নিরস্ত্র

শক্রু হইতেও কালে সশস্ত্র শক্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত মহিষমুখ হইতে অস্ত্রপাণি অসুরের উৎপত্তি দেখাই-য়াছেন। এরূপ সমুদ্যোগী রাজা দশদিক্‌কে অধিকার করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভ করেন, ইহা প্রদর্শনার্থ দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিক্‌পতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোককে উপদেশ দিয়াছেন, যে এই সমুদ্রমেখলা ধরণী-মণ্ডলের দিক্‌পতি সকল এবম্ভূত রাজার অস্ত্রতলে অধিবাস করে। রাজাদিগের ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্ব দিকেই দৃষ্টি থাকিবে; ত্রিনয়নচ্ছলে দুর্গাদেবী তাহাই দেখাইয়াছেন। অর্দ্ধচন্দ্র ধারণচ্ছলে সর্ব্বত্র সমান স্নেহের বিরাম অর্থাৎ সাধু পালন ও অসাধু পীড়ন করাই রাজ ধর্ম্ম, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ-চ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী হইবেন, ইহাই জানাইয়াছেন।

উল্লিখিতরূপে রাজনীতি উপদেশের বিষয় লিখিত হইল। এক্ষণে মহিষাসুরাদি বধ প্রসঙ্গে কিরূপে মানবদিগকে অ-ধ্যাত্ম তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

এস্থলে দেবাসুর-যুদ্ধ-পদে অধ্যাত্ম-ঘটিত বার্ত্তা বুঝিতে হইবে। মৃত্যুরূপ মহিষাসুর দেহীদিগের দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অসৎপ্রবৃত্তিরূপ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ইন্দ্রিয়রূপ দেব-গণের ও সৎপ্রবৃত্তিরূপ তদীয় সৈন্য সামন্তদিগের সহিত সম্পূর্ণ পরমায়ু কাল বিরোধ করিয়া পরে জয়ী হইয়া আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়াছে। জীবরূপ আকাশকে পরাজয় ক-

রিয়া, মৃত্যু আকাশ-ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী হয়। ইন্দ্রিয়-বর্গরূপ দেবগণ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল; এই ভূত কাল উপলক্ষণমাত্র ; বস্তুতঃ সবৃত্তিক ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যু কর্ত্তৃক আদি-সর্গে পরাজিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে পরাজিত হইতেছে, ভবিষ্যৎ কালেও পরাজিত হইবে, মহিষাসুরের প্রথমতঃ জয়বর্ণন দ্বারা ইহাই পরিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অনন্তর জীবের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে যে প্রকারে জ্ঞান শক্তি প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়া সাধক মৃত্যুঞ্জয় হয়, ঐশ্বরী শক্তি দুর্গামূর্ত্তি দ্বারা মহিষাসুরের বধ প্রস্তাবে তাহাই স্ফুটীকৃত হইয়াছে। অপ-রন্তু কর্ম্মী ও বিকর্ম্মী উভয়বিধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদিকে পরা-জয় করিয়া মৃত্যু সকলের উপর একাধিপত্য করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উহাদিগের মধ্যে কেহই মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। দেবাসুর-যুদ্ধ-ব্যাজে ভগবান বেদব্যাস পুরাণাদিতে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

প্রধানতম দুর্গামূর্ত্তির পূজা বা আরাধনা সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি বহুতর দেব ও দেবী এবং তদীয় বাহনাদির অর্চ্চনা বিষয়ক যে ব্যবস্থা আছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ঐ ব্যব-স্থার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। মানবের জড়াত্মক শরীরের সমস্ত অবয়ব এবং তদীয় সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি যে যে দ্রব্য-পদার্থে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের যে সকল গুণপদার্থ আছে ও সেই সকল গুণ দ্বারা নিরন্তর যে সকল ক্রিয়া পদার্থ উৎপন্ন

হইয়াছে, মৃত্যুর নিকট এই সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইতেছে, একমাত্র ঐশ্বরী-শক্তি দুর্গার আরাধনা ব্যতিরেকে জীবদিগের ঐ দুর্দ্ধর্ষ মৃত্যুকে পরাজয় করিবার উপায় নাই ;— শাস্ত্রীয় কল্পনার মধ্যে এই অতি নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান নিখাত রহিয়াছে। তথাহি—

আকাশ দ্রব পদার্থ ; তাহার গুণ শব্দ, তদীয় অধিষ্ঠাতা দেব ইন্দ্র। বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং অধিষ্ঠাতা পবন। অগ্নির গুণ রূপ এবং অধিষ্ঠাতা রুদ্র। জলের গুণ রস এবং অধিদেবতা বরুণ। মৃত্তিকার গুণ গন্ধ এবং অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী ইত্যাদি।

মানবদিগের বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। তন্মধ্যে আকাশের রজঃ অংশে বাক্য, (অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় মুখ-মণ্ডল) বায়ুর রজঃ অংশে হস্ত, অগ্নির রজঃ অংশে পাদদ্বয় ; জলের রজঃ অংশে অণ্ডকোষ ; পৃথিবীর রজঃ অংশে উপস্থ। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আকাশের সত্ত্ব অংশে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্ব অংশে চর্ম্ম, অগ্নির সত্ত্ব অংশে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্ত্ব অংশে প্রাণাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ফলিতার্থে এ সমস্তই আকাশে আছে এবং আকাশই সকলের কারণ ; এই আকাশের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রকে দেব সেনা মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

অন্তরিন্দ্রিয় চারি ভাগে বিভক্ত। যথা, বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, ও অহঙ্কার। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি,

সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মনঃ, অনু-সন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম অহঙ্কার। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের অধি-ষ্ঠাতা স্বরূপে চন্দ্রদেব পরিগণিত হইয়াছেন।

মুখ মণ্ডলের কথন শক্তি, হস্তের গ্রহণ শক্তি, পদের গমন শক্তি, অণ্ডের শুক্রাধান শক্তি, উপস্থের আনন্দ-য়িতব্য প্রয়োজন শক্তি; অপরন্তু কর্ণের শ্রবণ শক্তি, চর্ম্মের স্পর্শন শক্তি, চক্ষুর দর্শন শক্তি, জিহ্বার রস গ্রহণ শক্তি, নাসিকার গন্ধ গ্রহণ শক্তি আছে; এবং বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাণী, হস্তের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, পদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, হস্তের অধিষ্ঠাতা সোম, উপস্থের অধিষ্ঠাতা কামদেব, কর্ণের অধি-ষ্ঠাতা ইন্দ্রের অপরা মূর্ত্তি দিক্, চর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বায়ুর মূর্ত্তিবিশেষ, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি অগ্নি; জিহ্বার অধিষ্ঠাতা বরুণের অপরা মূর্ত্তি রস, নাসিকার অধি-ষ্ঠাতা পৃথিবীর অপরা মূর্ত্তি গন্ধ ইত্যাদি পরিকল্পিত হইয়াছে।

এইরূপে সবৃত্তিক ইন্দ্রিয় সকল দেববর্গ; এ সকলের ক্ষমতাকে জয় করিয়া মৃত্যু সর্ব্বোপরি স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছেন; বাহ্য উপদেশ দিবার নিমিত্ত মৃত্যুই মহিষরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। আবার সেই মহিষাসুর দুর্গা দেবীর নিকট পরাজিত ও নিহত হইতেছে;—এই অধ্যাত্ম তত্ত্বঘটিত প্রস্তাবের বাসনিক ভাগ উদ্ধার করিয়া নর শরীরস্থ তত্ত্বের

অন্বেষণ করিলে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।

এ স্থলে এমন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পরমেশ্বরের রূপাদি যদি মিথ্যা অর্থাৎ কল্পিতই হইল, তবে তদ্রূপের উপাসনাদিতে কোন উপকার হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে বক্তব্য যে, যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রান্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ভুজঙ্গ বলিয়া রজ্জুঃ ধারণ করিলে, ভুজঙ্গ ভ্রান্তির অপনয় ও সত্য রজ্জুঃ-গ্রহণ করাই সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহামোহে আকৃষ্ট জীবের পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ জানিবার সাধ্য নাই, এ প্রযুক্ত নির্ম্মল পরমাত্মাতে শ্রীকৃষ্ণ শিবদুর্গাদি রূপের সজ্ঞা করিয়া উপাসনা করিতে করিতে পরিণামে নাম রূপের অন্তর হইলে, তন্মূলীভূত পরমাত্মার উপাসনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। প্রত্যুত, কোন সাধক ব্যক্তি প্রথমে নাম রূপাদি উপাসনা না করিয়া যদি একবারে নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা করিতে যত্ন করেন, তবে কদাচই তাঁহার উপাসনার সিদ্ধি হইতে পারে না। তাদৃশ ব্যক্তি পরিণামে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া বিলক্ষণ নাস্তিক হইয়া উঠিবেন। অতএব অগ্রে রূপ নাম বিশিষ্ট পরমেশ্বরের উপাসনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

কালীমূর্ত্তি—বাহ্যরূপ।

অবচ্ছেদ রহিত স্বতঃ নিত্য কালই এই জগতের নিয়ন্তা। ব্রহ্মাদি তৃণ-গুল্ম পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অখণ্ড অমোঘ-বীর্য্য কালের অধীন। কেহই সেই কালের অব্যর্থ নিয়মকে অতিক্রম করিয়া আত্ম পরাক্রমে কার্য্য করিতে পারে না। সেই কালকে শাস্ত্রকার ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানারূপ উপাধি দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। সেই কালই অখণ্ড ও অপরিমিত ব্রহ্ম এবং শাস্ত্রে তাঁহার শক্তিকেই "কালী" রূপে বর্ণন করা যায়। কালরূপা কালকামিনী পরব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি স্বরূপ। তিনিই কাল বশতঃ এই অপূর্ব্ব জগদ্রূপের সৃষ্টি কারিণা ও অখণ্ড দণ্ডায়মানা। অখিলার্থ সাধনাভিপ্রায়ে ক্রিয়া শক্তিরূপে পালন তৎপরা এবং অন্তকালে স্বকীয় লীলাভাস বিনাশ জন্য সুপ্রখরা কাল-রূপিণী হয়েন।

জন সমাজে পূজাদি উপলক্ষে যে বিশাল কালী মূর্ত্তি দর্শন ও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, তাহাই সেই মহাকাল-মোহিনী ও তাঁহার ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি রূপের আধারভূতা। উপাসকগণের অভীষ্ট-সাধন-জন্য কালীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। ইহার এই মূর্ত্তি বিকারময় মনুষ্য মূর্ত্তির ন্যায় নহে। তাঁহার

প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্রহ্ম-বিভূতি-প্রতিপাদক। অধ্যাত্ম কল্পে জ্ঞান-চক্ষে অবলোকন করিলে ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়।- দৃষ্টান্তস্বরূপে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ কালীমূর্ত্তির যে সকল নাম দ্বারা সম্বোধন ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহাদের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ নিষ্কাশন করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে কাল-কামিনী কালীকে "করাল বদনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, করাল শব্দে ভীষণ অর্থাৎ ভয়ানক, বদন শব্দে মুখ। "করাল বদনা" অর্থাৎ যাঁহার মুখ অতি ভীষণ। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত জন্তু অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে কোন কোন জন্তু অতীব ভীষণাকার ও হিংস্রক ; কিন্তু সকলকেই সেই জগদ্ভক্ষক কালের দন্তে কবলিত হইতে হয়। কেহই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না ; জগদন্ত-কালে সেই কালই সকলকে গ্রাস করেন। এই নিমিত্তই কাল-শক্তি কালীকে "করাল বদনা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তথাহি,

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।"

তিনি ভয়ের ভয় স্বরূপ, ভীষণের ভীষণ স্বরূপ।

কিন্তু সুকৃতিবান্ জ্ঞানীর পক্ষে সেই কালমূর্ত্তি পরম রমণীয় প্রসন্ন-বদন ধারণ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত তাঁহারই নামান্তর "সুখ-প্রসন্নবদনা" ও "স্মেরাননা"। অর্থাৎ অসাধু পাপ-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি যাদৃশী করালা, তদ্রূপ সাধু

ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির চক্ষে তিনিই পুনর্ব্বার "সুখপ্রসন্ন বদনা স্মেরাননা" মূর্ত্তি-ধারিণী হয়েন।

কাল মোহিনী কালীর রূপ বর্ণনচ্ছলে তাঁহাকে "ঘোরাং" অর্থাৎ ঘোর রূপা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পদের দুই প্রকার তাৎপর্য্যার্থ আছে। প্রথমতঃ, আদিতে যখন কিছুই ছিল না, তখন উৎপৎস্যমান জীবদিগের ও জগতের পক্ষে সেই কালরূপী ব্রহ্ম মহাতমসাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকাররূপে পরিণত ছিলেন। সেই কালের প্রতিরূপ স্বরূপ অর্থাৎ আদি রূপ বর্ণনার্থ কালীর "ঘোরা" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ মহাকাল তমো-গুণ-রূপ সংহারাধার হয়েন। সেই সংহার-কর্ত্তা মহাকালের শক্তি কালীর তমোগুণাত্মক নাম "ঘোরা" হইয়াছে।

কালী মূর্ত্তির অপর নাম "মুক্তকেশী"। তাৎপর্য্য এই যে সংসারের মায়াজাল তদীয় কেশজাল স্বরূপ; এবং এই ব্রহ্মাণ্ড কালাবয়ব স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডময়ী কাল-শক্তির পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ দেহে ঐ কেশজাল দোলায়মান আছে; তাৎপর্য্য এই যে, মায়াই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থকে ঘূর্ণ্যমাণ ও দোলায়মান করিতেছে। অপরন্তু ঐ মায়া সঙ্কুচিতা বা বদ্ধা না হইয়া সতত বিস্তৃতই আছে এবং তাহাতে বিমোহিত ব্যক্তিগণের চিত্ত সদাই দোলায়মান হইতেছে। পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষেরা ঐ মায়াতে আকৃষ্ট না হইয়া সততই স্থির

ভাবে রহিয়াছেন; সুতরাং সুকৃতিবান্ জ্ঞানিগণের পক্ষেও তিনি (মুক্ত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কেশ যাহার—এবম্ভূতা) মুক্তকেশী হইয়াছেন। আহা কি আশ্চর্য্য অঘটন ঘটনা! বদ্ধ ব্যক্তির চঞ্চলতা এবং মুক্ত ব্যক্তির স্থিরভাব অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে। ঐ মায়া রজ্জুতে যে ব্যক্তি বন্দী আছে, সেই দৌড়িয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই বন্ধন মুক্ত, সে অতি শান্ত ভাবে স্থির হইয়া চিরকালের জন্য বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছে !!!

কালীমূর্ত্তি চতুর্ভুজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ চতুর্হস্তই চতুর্ব্বর্গস্বরূপ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধন বা প্রদানার্থ খড়্গ, মুণ্ড, বর ও অভয়রূপ অস্ত্র সকল পরিধৃত হইয়াছে। যে হস্তে খড়্গ সেই হস্তে ধর্ম্ম। কারণ অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন শাসন ও অস্ত্র দ্বারাই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কালীমূর্ত্তি মহামোহাদিরূপ অধর্ম্মচয়ের মস্তকচ্ছেদন করণচ্ছলে বাম হস্তের ঊর্দ্ধ ভাগে ভয়ানক কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন। শত্রু বিনাশ ভিন্ন সম্পদ ও অর্থ লাভ হইতে পারে না; ইহাই দেখাইবার ছলে একহস্তে বৈরিমুণ্ডধারণ করিয়াছেন। যে হস্তে অভয়, তাহাতেই মোক্ষ। কারণ, মোক্ষ ভিন্ন ভয়ের শান্তি হয় না।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

এই হেতু মাভৈঃ রবের প্রতিরূপ স্বরূপ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিতেছেন। যে হস্তে বর, তাহাতেই

কাম। কারণ, বেদে ব্রহ্ম শক্তিকে সর্ব্বকাম-পূর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সকল কামনাই পূর্ণ হয়। সেই কামনা-পূরণচ্ছলে বর-হস্ত ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে কালীমূর্ত্তিকে "দক্ষিণা কালী" নামেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য প্রকটিত আছে। যথা—

"পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে।
বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষ-প্রদায়িনী॥"

অথবা—

"দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ।
কালীনাম্নো পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ॥"

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে পুরুষকে "দক্ষিণ" ও প্রকৃতিকে "বামা" বলা যায়। সেই বামা দক্ষিণকে জয় করিলেই (দক্ষিণা নামে অভিহিত হইয়া) মহামোক্ষ প্রদান করেন।

অথবা, রবির পুত্র যমরাজ দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। তিনি "কালী" এই নাম শ্রবণ করিলে ভীতিযুক্ত হইয়া সমন্তাৎ পলায়ন করেন।

ইহা দ্বারা দক্ষিণা শব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি লভ্য হইতেছে। যথা—দক্ষিণা অর্থাৎ পুরুষাবলম্বিনী প্রকৃতি। অথবা দক্ষিণা অর্থাৎ দক্ষিণদিকে অবস্থিত যমরাজের জয়-

কারিণী। তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষিণদিক মৃত্যুর অধিকার স্থান, এই কাল শক্তির উপাসনা বলে সেই অধিকার খণ্ডন হয়।

দক্ষিণা শব্দের অপর ব্যুৎপত্তি এই যে, কালী আরাধনা দ্বারা দেহ উৎপত্তির লয় হইয়া দেহীর দেহের দক্ষিণান্ত কার্য্য সমাধা হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ অবান্তর পাশ একবারে খণ্ডন হইয়া যায়। ইহাই জানাইবার নিমিত্ত কালী দক্ষিণা নাম ধারণ করিয়াছেন।

কালীকে শাস্ত্রে "মুণ্ডমালী" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ঐ মুণ্ডমালা প্রকৃত নরশিরোমালা বা তন্মধ্যে আর কিছু মর্ম্ম আছে, ইহার মীমাংসা করা নিতান্ত সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন, ঐ মালা বর্ণমালার প্রতিরূপ। অপরে কহেন, যে, জগদ্ভক্ষক কালগ্রাসে সর্ব্বদেশের সর্ব্ব-প্রাণীই নিপতিত হয়, কেহই সেই করাল কাল মুখের অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ কালে সকলেরই শিরোনিরস্ত হয়। ইহাই দেখাইবার জন্য কাল শক্তির গলদেশে নরশিরোমালা বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই কালী "মুণ্ডমালী" নামে অভি-হিত।

অপর নাম "দিগম্বরী"। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র সমানরূপে অবস্থিতা। সুতরাং পূর্ব্বাদি দশ দিক্ তাঁহার অম্বর অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র স্বরূপ।

উল্লিখিতরূপে ভগবতী কালীমূর্ত্তির নাম সকলের ব্যুৎপত্তি যে পরমার্থ-তত্ত্বের প্রতিপাদক, তাহার কয়েকটী উদাহরণ

প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ঐরূপ কল্পিত মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সার্থকতা কি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হই-তেছে।

কালশক্তির কল্পিত মূর্ত্তিতে নীলিমাগুণের আরোপ হইল কেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ত্রয়োদশোল্লাসে তাহার মর্ম্ম স্ফুটী-কৃত হইয়াছে। তথাহি,—

"উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যা প্রকল্পিতম্॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কালীং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অথ তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তমূর্ত্তেশ্চ বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥"

হে প্রিয়ে শৈলজে! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্য সাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ার অনুসারেই দেবী কালীর রূপ কল্পিত হইয়াছে। যেরূপ শ্বেত পীতাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ কালীতে সর্ব্ব-প্রকার প্রাণীর জীবাত্মা প্রবেশ করে। এই নিমিত্তই সেই নির্গুণা ও নিরাকার হিতকারিণী কালশক্তির কল্পিত মূর্ত্তিতে কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে।

কালরূপ কালীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ কি না, কালী বীজার্থ অনুধাবন করিলে ঐ সন্দেহের নিশ্চয় নিরাকরণ হইতে পারে। যথা তন্ত্রে,

" ককারোজ্জ্বলরূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞানচিৎকলা
জ্বলনার্ণ সমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা ॥
দীর্ঘেকারেণ দেবেশী সাধকাভীষ্টদায়িনী।
বিন্দুনাং নিষ্ফলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী।
বীজত্রয়েণ দেবেশী সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী ॥"

"ক" কারের উজ্জ্বল রূপতা বশতঃ দেবেশী (মহাশক্তি) সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী ; অগ্নিবীজ অর্থাৎ "র" বর্ণের সংযোগ প্রযুক্ত সর্ব্ব-তেজোময়ী এবং শুভ দায়িনী ; দীর্ঘ "ঈ" কার দ্বারা সাধক ব্যক্তির অভীষ্ট ফল দানে সমর্থা ; বিন্দু (ং) অর্থাৎ অনুস্বার বর্ণের নিষ্ফলতা অর্থাৎ নিষ্কামতা বশতঃ কৈবল্য দায়িনী হয়েন। এই বীজত্রয় দ্বারা (ক্+র্ +ঈ+ং= ক্র+ঈ+ং) সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কারিণী হইয়া থাকেন।

কাল কামিনীর শরীরকান্তিকে কোন কোন স্থলে, মহা-মেঘ-প্রভারূপে বর্ণন করেন ; তন্মর্ম্ম এই যে, মেঘ কান্তি অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, মহাপ্রলয়ে এই জগতীস্থ শ্বেত পীতাদি সমস্ত বর্ণ এই কৃষ্ণবর্ণ-রূপ মহান্ধকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং সেই তিমির-শ্রেণী সর্ব্বভূতাদিকে গ্রাস করিয়া সর্ব্ব পদার্থের আবরণরূপা সর্ব্বব্যাপিনী হয়েন। এদিকে মেঘেরও সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব রহিয়াছে। তজ্জন্যই মহাকাল-কামিনীর শরীর-কান্তিকে মহামেঘ-প্রভা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কালশক্তির অধর-কোণ-দ্বয়ে রুধির-ধারা বিগলিত,

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জগন্নাশিনী অর্থাৎ সংহার কর্ত্তৃত্ব-সঞ্জ্ঞা স্ফুটীকৃত হইয়াছে। যথা—

" গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্তানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।"

সর্ব্ব জন্তুকে গ্রাস ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ হেতু, (রুধির ধারা পতিত ইত্যাদি)।

কালীর কর্ণোপরি ভয়ানক শর অথবা শবযুগল ভূষণরূপে বর্ণিত আছে। ঐ শব অর্থাৎ ভূত পদে পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ঐ ভূতনাথ-রমণীর অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ স্বরূপা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক নিখিলজন্যময়ীভাবই বুঝাইতেছে। যথা যোগবাশিষ্ঠে ;—

বিশ্ববীচিবিনাশোঽয়ং চিৎ-সুধাব্ধেরুদঞ্চতি।
বিলীয়তেচ তত্রৈব মধ্যো কিং মূল তন্ময়ং ॥"

কালীর ধ্যানে তাঁহাকে পীনোন্নত পয়োধর-ধারিণী রূপে বর্ণন করিয়াছেন। পীন শব্দে স্থূল, পয়োধর শব্দে স্তন ; এই স্থূল স্তন ঐ কালীর সম্পত্তি স্বরূপ হওয়াতে তিনি পীন-স্তনাঢ্যা বলিয়া পরিগণিত। ইহার মর্ম্ম এই যে, ঐ কাল-কামিনী ত্রিভুবনজননী হয়েন এবং সকলকেই পালন করিয়া থাকেন। এ কারণ, ঈদৃশ স্তন বর্ণন দ্বারা জগদ্ধাত্রী ও জগজ্জননী রূপের বর্ণনা হইয়াছে।

তাঁহাকে "শব-কর-কাঞ্চীভরণা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গতাসুজনগণের কর-সমূহে তাঁহার কটিভূষণ অর্থাৎ নিতম্ব ভাগ সর্ব্বতোভাবে শোভান্বিত হইয়াছে। এই

বাক্যে ঐ কাল শক্তির জগৎ-সংহার-কর্ত্তৃত্ব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ইহা দ্বারা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, এই ভাব বুঝায়। যথা পঞ্চদশ্যাং

"আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণি কর্ম্ম বসাদেন পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ॥
পুনস্তিরো ভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।"

প্রাণিগণ যেমন প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার্য্য বস্ত্রকে কখন প্রসারিত, কখনও বা সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ তিনি (পরম শক্তি) প্রলয়-কাল বিলীন সমস্ত জগৎকে আপনাতে আবির্ভূত করেন; এবং পুনঃ প্রলয় কালে, তাহা আপনাতেই তিরোভাবিত করেন।

কাল-কামিনী কালীকে "শ্মশান বাসিনী" বলিয়া উক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, লয় কালে সকলে পরমাত্মা কাল-রূপে শয়ন করে; আর পুনর্ব্বার জাগরিত হয় না, অর্থাৎ সকলে শ্মশান শায়িত হয়। এই কারণে ঐ কাল শক্তিকে শ্মশান বাসিনী বলিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকের সংহারই যে তাঁহার শ্মশান বাসরূপে কল্পিত, তন্ত্রে তাহা স্ফুটীকৃত আছে। যথা,—

"আলীঢ়ং বামপাদস্তু প্রত্যালীঢ়স্তু দক্ষিণং।
সংহাররূপিণী কালী জগন্মোহন্‌কারিণী॥
বহ্নিরূপা মহামায়া সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অতএব মহেশানী শ্মশানালয়বাসিনী॥"

শ্যামা ত্রিনয়নী হইবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ঊর্দ্ধাধঃ সম্মুখ দর্শিনী এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। তথাহি মুণ্ডমালা তন্ত্রে—

"শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈ রখিলং কালিকা জগৎ।
সংপশ্যতি যত স্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ং।"

(ঈশ্বরশক্তিস্বরূপা) কালিকা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিন নেত্র দ্বারা জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই নিমিত্তই তাঁহার তিনটি নেত্র কল্পিত হইয়াছে।

কল্পিত প্রতিমাতে কালীকে শবহৃদয়োপরিস্থিতা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শবের হৃদিতে অর্থাৎ শয্যাতে স্থিত হইয়া শব সাধনাদি করিলে ঐ কাল শক্তির কালরূপত্বের নিরাকরণ হয় অর্থাৎ তাঁহার আরাধনায় সাধক ব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে। এই নিমিত্তই শবরূপী মৃত্যুঞ্জয় তদীয় পদতলে সংস্থাপিত।

কালীকে শিবারব-বেষ্টিতা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শিবা অর্থাৎ মঙ্গল দায়িকা আবরণ দেবতা-গণ, তাঁহাদিগের রব অর্থাৎ শব্দ দ্বারা বেষ্টিতা অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সেই ব্রহ্ম রূপা কালীর আবরণ স্বরূপা হইয়া বেষ্টন করিয়া আছেন। এই নিমিত্তই "শিবাভি র্ঘোররাবাভি শ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতা" বলিয়া তাঁহাকে ধ্যানে বর্ণন করিয়াছেন।

কাল-শক্তি কালীকে মহাদেব অর্থাৎ মহাকাল সহ বিপরীত-রতাতুরা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পরমা প্রকৃতিরূপ যুবতীরূপা কালী নির্গুণ অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাকে সগুণ অর্থাৎ সচেষ্ট করিয়া থাকেন। তিনিই নিশ্চেষ্ট পরব্রহ্মে অধ্যাস-স্বরূপ হইয়া আপনি কর্ম্ম-কারিণী হয়েন এবং বিপরীত ভাব অর্থাৎ নিশ্চল নির্ব্বিকার আত্মাতে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যোজনা পূর্ব্বক তাঁহাতে কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব, অভিমানিত্ব ও অহংতত্ত্বের ভাবোৎপাদন করিয়া থাকেন। যথা,

"মহান্ ককার পুরুষো নির্গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রকৃতির্যাতিরূপাখ্যা তস্যা জাত মিদং জগৎ॥"

মহান্ ককার পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা বস্তুতঃ নির্গুণ। প্রকৃতি তাঁহাতে উপগমন করেন। সেই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

অপিচ অধ্যাত্ম-রামায়ণে

"রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরমণঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণানমুগতো হি তথা বিভাতি॥"

প্রকৃত রাম, গমন করেন না; অবস্থানও করেন না। অনুশোচনা করেন না। কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরিত্যাগও করেন না। কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না।

তিনি আনন্দ-মূর্ত্তি-স্বরূপ; তাঁহার পরিণাম নাই। তিনি কেবল মায়াগুণে অর্থাৎ প্রকৃতি-মিশ্রিত হওয়াতেই তাদৃশ মূর্ত্তিমান পুরুষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

এবম্প্রকার ভাবে সেই পরমাশক্তিকে আমাদিগের মূর্ত্তির আধেয় পদার্থ জ্ঞান করিতে হইবে।

ধ্যান দুই প্রকার। যথা কুলার্ণবে,

"ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্ম-বিভেদতঃ।
সাকারং স্থূলমিত্যুক্তং নিরাকারন্তু সূক্ষ্মকং॥
স্থৈর্য্যার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রচক্ষতে।
স্থূলেচ নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং॥"

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। সাকার ধ্যানকে স্থূল ও নিরাকার ধ্যানকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে। কতকগুলি ব্যক্তি মনের স্থিরতার নিমিত্ত স্থূল-ধ্যান অবলম্বন করেন। কারণ, অন্তঃকরণ স্থূল ধ্যানে নিশ্চল হইলে, সূক্ষ্ম ধ্যানেও নিশ্চল হইয়া উঠে।

অতএব স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে সংসার-বিষয়-বাসনাকৃষ্ট-অস্থির-মানস ব্যক্তিগণের চিত্ত-স্থৈর্য্য নিমিত্ত স্থূল ধ্যানের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। ঐ ধ্যানের কল্পনা-ভেদে স্ত্রী পুরুষ মূর্ত্তির আরাধনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। তথাহি তন্ত্রে—

" সাকারঞ্চ নিরাকারং দ্বিবিধং ব্রহ্ম পার্ব্বতি।
তয়োরেকতরেণৈব মুক্তিং যান্যন্তি মানবাঃ॥"

হে পার্ব্বতি। ব্রহ্ম দুই প্রকার। সাকার ও নিরাকার। তাহার একতরের উপাসনা দ্বারা মানবেরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

এ সকল ব্যবস্থার সহিত একবাক্যতা করিবার নিমিত্ত সাকার উপাসনার মুক্তি-দাতৃত্ব-বর্ণনকে প্রবর্ত্তনা বাক্য বলিতে হইবে। বস্তুতঃ সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপানস্বরূপ। নিরাকার উপাসনাই নির্ব্বাণ মুক্তির অব্যবহিত কারণ।

নিরাকার ও নির্ব্বিকার পরমাত্মাকেই অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনার নিমিত্ত স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ ইত্যাদি বিবিধমূর্ত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তথাহি কালিকা উপনিষদে—

> " ত্বমানন্দময়ী মহামোহ দমনী ক্বচিৎ পুংবিগ্রহা ক্বচিৎ
> স্ত্রীবিগ্রহা ক্বচিদল্পা ক্বচিন্মধ্যা ক্বচিৎপূর্ণা ক্বচিৎ কৃষ্ণা
> ক্বচিৎ গৌরা ক্বচিদ্রক্তা, ক্বচিৎ ব্রহ্মরূপা ক্বচিৎ বিষ্ণুরূপা
> ক্বচিৎ শিবরূপা ক্বচিৎ অরূপা ক্বচিৎ সরূপা, সর্ব্বরূপা
> বিদ্যন্তে। অস্যা অংশেন সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বদেবা ত্রৈলোক্যে
> নান্যোঽস্তি সত্যং সত্যং সন্দেহো নাস্তীত্যভেদজ্ঞানাৎ। " *

এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, কালীমূর্ত্তি যে, সর্ব্বময়ী এবং সর্ব্বাধারা, তৎপক্ষে আর কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না। কালশক্তিরূপা কালদমনী কালীর উপাসনাতেই জীব পরিমুক্ত হইতে পারে।

---

* অতি সহজ সংস্কৃত বলিয়া অনুবাদ করা গেল না।

কালীমূর্ত্তি—আন্তরিক উপাসনা।

"অচিন্ত্যা মিতাকারশক্তিস্বরূপা
প্রতিব্যক্ত্যাধিষ্ঠান সত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥"

হে মাতঃ! তুমি চিন্তার অতীত, অপরিমিত-আকার বিশিষ্ট পরব্রহ্মের শক্তি স্বরূপা, মানব বুদ্ধিতে একমাত্র সত্বগুণময় মূর্ত্তি বিশিষ্টা। তুমি গুণাতীতা, দ্বন্দ্ব-রহিতা, একমাত্র বোধের গম্যা এবং পরম ব্রহ্ম রূপে সাধনীয়া হইয়াছ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে অখণ্ড-দণ্ডায়মানা কালমোহিনী কালীর নাম ও রূপের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ মর্ম্ম ব্যাখ্যা কালীর বাহ্য রূপের বর্ণন মাত্র। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহা কিছু মনুষ্যাকৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্য হইতেছে, তাহা কেবল কল্পনা-কৃত। ঐ স্থূলাকৃতি বস্তুতঃ মিথ্যা। কেবল ব্রহ্ম-বিভূতির পরিচায়ক মাত্র। সাধকের মনোভীষ্ট-সিদ্ধার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্ত্যনুসারে অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ের তারতম্য বশতঃ কেবল চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত রূপক ব্যাজে ঐ স্থূল মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলে ঐ মূর্ত্তির নিগূঢ় মর্ম্ম বিশিষ্ট যে ভাবোদয় হয়, তাহাই সেই ভাবময়ী পরমা

প্রকৃতির প্রকৃতরূপ। সেই রূপই এই অখিল জগদ্রূপে পরিণতা, সকলের হৃদয়স্থিতা, বুদ্ধিগতা এবং জ্ঞানগম্যা মাত্র হয়েন।

এইরূপ কালশক্তি একমাত্র হইয়াও জগৎ সংসার সম্বন্ধে ত্রিবিধ রূপা হইয়াছেন। প্রথম, আদিতে আদ্যরূপা পরমা প্রকৃতি। যাহাতে আদ্যন্ত-রহিত পরমাত্মা গর্ভাধান স্বরূপ বীজ বপন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির সূত্রপাত করেন। সুতরাং ঐ আদ্যাই ব্রহ্মশক্তি রূপে জগৎ-জননী হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, মধ্যরূপা সত্বগুণময়ী। ঐ উৎপত্তির স্থিতির নিমিত্ত পালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন।

তৃতীয়, অন্তে তমোগুণাত্মিকা কালরূপা। এই সৃষ্টি-সংহারে অতি প্রখরা কালীরূপে আবির্ভূতা হয়েন।

এই মূর্ত্তির উপাসনা কাণ্ড অতি মনোহর। ভক্তি বিশিষ্ট হৃদয়ে সেই ভক্তি-শ্রদ্ধাস্পদ কাল-রমণীর আরাধনা করিলে অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি হইয়া নির্গুণাত্মক পর-তত্ত্বের উৎপত্তি ও সংসার প্রবৃত্তির খণ্ডন হইতে থাকে। ঐ ভাব ময়ীর উপাসনা শুদ্ধ ভাব-ময় উপকরণে করিতে হয়, কারণ তিনি ভাবের বিষয়; ভাবের অভাব হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন সাধক ভাবাত্মক উপচার সমূহ একত্র করিয়া ভক্তিভাবে ঐ ভাব ময়ীর চরণে অর্পণ করেন, তখন নিশ্চয়ই সংসার ভাব পরিত্যক্ত হইয়া সত্ত্বময় পারমাত্মিক ভাবের উদয় হইতে

থাকে। এই নিমিত্তই জ্ঞানিবর রামপ্রসাদ আপন গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"মন,কর কি তত্ত্ব তাঁরে; ওরে উন্মত্ত! আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।" হৃদয়ান্ধকার-রূপ তিমিরালয়ে ভক্তি-ভাবাগ্নি উদ্দীপন করিলে সেই তিমিরবর্ণা কালরমণীর রূপ দর্শন হয় এবং সেই মহান্ রূপের আলোক মালায় দেহস্থ সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার লয় ও ধ্বংস হইতে থাকে।

পূর্ব্বে নাম রূপের মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ কাল-কামিনী কালীর উপাসনা অর্থাৎ আন্তরিক পূজা সাধনাদি যে ভাবে করিতে হয়, তন্মর্ম্ম কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

কালীর বাহ্য মূর্ত্তিতে শবাসন কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু অন্তরে সাধকের হৃদয়কে আসন করিয়া তদুপরি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী কালীকে বসাইতে হয়। বাহিরে স্নানীয় জলে সেই শ্রীঅঙ্গের অভিষিঞ্চন করিবার ব্যবস্থা; কিন্তু হৃদয়ে সহস্রার-গলিত অমৃতধারা সিঞ্চনে ঐ স্নান কার্য্য সমাধা করিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলে পাদ ধৌত করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরে ঐ অমৃত বারিকে পাদ্য স্বরূপে কল্পনা করিয়া জগজ্জননী কালীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। বাহিরে দুর্ব্বাক্ষত-পুষ্প-চন্দনাদি-মিলিত অর্ঘদানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্তরে দশেন্দ্রিয়রূপ পুষ্পের অধিষ্ঠাতা মনকে অর্ঘ-স্বরূপে প্রদান করিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলে আচমনের কল্পনা হইয়াছে, কিন্তু অন্তরে ঐ অমৃত ধারা আচমনীয়

রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে কার্পাসাদি সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিধেয় রূপে দানের বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে মায়াবৃত-পটাচ্ছন্ন সর্ব্বব্যাপক আকাশ তত্ত্ব বস্ত্ররূপে সেই আকাশ রূপিণী দিগম্বরীর পরিধেয় কল্পনা করিতে হয়। বাহিরে শ্বেত রক্ত চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য স্বরূপে দানের বিধি আছে; কিন্তু অন্তরে পার্থিব-অংশ-সম্ভূত গন্ধ-তত্ত্বকে ঐ গন্ধ চন্দন রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে জবা মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্তরে অন্তঃ-করণ রূপ চিত্ত বৃত্তিকে পুষ্পরূপে সেই চিত্তস্বরূপিণী কাল-কামিনীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। বাহিরে কতিপয় গন্ধ-দ্রব্য-সংশ্লিষ্ট ধূপদানের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অন্তরে প্রাণ-অপানাদি কতিপয় বায়ু তত্ত্বকে ধূপ স্বরূপে প্রদান করিতে হয়। বাহিরে তৈলাক্ত বর্ত্তিকায় অগ্নি উদ্দীপন করিয়া দীপ দানের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অন্তরে পঞ্চভূতাংশ তেজঃ পদার্থকে ঐ দীপরূপে কল্পনা ও দান করিতে হয়। বাহিরে স্বর্ণ রৌপ্যাদি অথবা বস্ত্র নির্ম্মিত ছত্র ঐ কালশক্তি কালীর শিরোভাগে ধারণ করিবার বিধি আছে; কিন্তু অন্তরে শিরোবস্থিত সহস্রপত্রস্বরূপ সহস্রার পদ্মকে মস্তকাবরণ ছত্ররূপে দান করিতে হয়। বাহিরে সুমধুর তান মান মিলিত গীতবাদ্য দ্বারা দেবীর সন্তোষ সাধন করিবার বিধান আছে; কিন্তু অন্তরে আকাশ তত্ত্বের তন্মাত্র শব্দ তত্ত্বকে ঐ গীতবাদ্য রূপে কল্পনা ও শ্রবণ করাইতে হয়। বাহিরে নট নর্ত্তকীগণ

ঐ নটবররমণীর সম্মুখে পূজাবসানে নৃত্য করিয়া থাকে; কিন্তু অন্তরে দশেন্দ্রিয়ের কার্য্যাবলী ও মনের অশেষবিধ মননকে নর্ত্তক নর্ত্তকীরূপে কল্পনা করিতে হয়। বাহিরে পদ্মাদি নানাবিধ পুষ্পগ্রন্থিত মাল্যদান করিবার বিধি আছে; কিন্তু অন্তরে অশেষবিধ ভাব পুষ্প ভক্তিসূত্রে গ্রন্থিত করিয়া ঐ ভাবময়ীর আপাদ মস্তক পরিশোভিত করিতে হয়, অর্থাৎ অমায়ারূপ প্রথম পুষ্প, অনহঙ্কাররূপ দ্বিতীয় পুষ্প, অরাগ অর্থাৎ রাগ বিহীনতারূপ তৃতীয় পুষ্প, মদ অর্থাৎ মদমত্ততা-ভাবরূপ চতুর্থ পুষ্প, অমোহরূপ পঞ্চম পুষ্প, অদ্বেষরূপ ষষ্ঠ পুষ্প, অক্ষোভরূপ সপ্তম পুষ্প, অমাৎসর্য্যরূপ অষ্টম পুষ্প, অলোভরূপ নবম পুষ্প, দয়ারূপ দশম পুষ্প, অহিংসারূপ একাদশ পুষ্প, ক্ষমারূপ দ্বাদশ পুষ্প, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ত্রয়োদশ পুষ্প, প্রীতিরূপ চতুর্দ্দশ পুষ্প এবং সাত্ত্বিক জ্ঞানরূপ পঞ্চদশ পুষ্প; এই সমস্ত ভাবরূপ পুষ্পেরদ্বারা সেই পঞ্চদশ শক্ত্যাত্মিকা পরমা প্রকৃতি ব্রহ্ম শক্তির পূজা করিতে হয়। বাহ্য মূর্ত্তির নিকট ছাগাদি পশু বলিদান করিবার বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে কাম ক্রোধাদি রূপ বৈরিনিচয়কে পশ্বাদি রূপে কল্পনা করিয়া হনন করিতে হয়। বাহিরে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা নৈবেদ্য প্রদানের বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে সুধারাশিরূপ সুধাম্বুধি ও ভক্তিরস প্লুত অতি কমনীয় চিত্ত বৃত্তিকে নৈবেদ্য রূপে উপহার দিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলকে পানীয়রূপে প্রদান করিবার বিধি আছে,

কিন্তু অন্তরে প্রাণাপানাদি পঞ্চদশ বায়ুর পরিতৃপ্ত্যর্থ অর্থাৎ তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পঞ্চভূতাত্মক জলীয়াংশকে পানীয়রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে আহারান্তে খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করাইবার বিধি আছে ; কিন্তু অন্তরে বিশুদ্ধ হৃদয়রূপ মণি মন্দিরে রত্ন-সিংহাসনোপরি অনন্তরূপী মহাকাল পতির সহিত মিলিতা করিয়া শয়ন করাইতে হয়। বাহ্য পূজাতে করমালা বা পদ্মাদি-বীজ-মালাতে কালীর বীজাক্ষররূপ মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে; কিন্তু অন্তরে পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মিকা মালিকা, যাহা শিব-শক্ত্যাত্মক সূত্রে গ্রথিত এবং মহামায়া পরমা প্রকৃতি যাহার মেরু স্বরূপা সেই বর্ণ মালার দ্বারা বর্ণময়ী কালীর জপ কার্য্য সমাধান করিতে হয়।

কাল রমণীর মন্ত্রময় দেহ, ইহা নিগূঢ় তত্ত্বান্বেষী সুসাধকেরা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। যথা—

"ককারোজ্জ্বল-রূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞান-চিৎকণা।
জ্বলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্ব তেজোময়ী শুভা॥
দীর্ঘেকারেণ দেবেশী সাধকাভীষ্ট দায়িনী।
বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী॥
বীজত্রয়েণ দেবেশী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥"

অর্থাৎ ককার পদে সর্ব্ব তেজোময়ী, দীর্ঘ ঈকার পদে সাধকের অভীষ্টদায়িনী ; এবং অনুস্বার পদে সাংসারিক ফলাফল রহিত কৈবল্য ফলদায়িনী।

এইরূপ বীজত্রয় একত্র করিলে সৃষ্টি স্থিতি নাশকারিণী

এই অর্থ প্রতিপাদিত হয়। এই সকল মন্ত্রার্থের অনুধাবন করিলে কালীমূর্ত্তি যে মনুষ্যাকৃতির ন্যায় বিকারাভিভূতা নহে, শুদ্ধ কেবল চিৎস্বরূপা ব্রহ্ম-বিভূতি প্রতিপাদক ও জ্ঞানোপকরণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনেক সুকৃতি ও সৌভাগ্য না থাকিলে এই কালী নামে ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে না। যে কালে সাধকের প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের অবসান হইবার উপক্রম হয় এবং যে কালে তাঁহার সংসারগ্রন্থিচ্ছেদ হইয়া জন্ম-মৃত্যু-রূপ সুদীর্ঘব্রতের দক্ষিণান্ত হইবার সময় উপস্থিত হয়, সেই কালেই সাধক এই দক্ষিণাকালীর পদাশ্রিত হয়েন। আহা! এই তত্ত্ব পরম রমণীয়! কাল কামিনী কালীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিলে আর কালের ভয় থাকে না; এবং সমস্ত ভূমণ্ডলকে কালীময় দর্শন করিয়া কালীভক্ত সাধক একবারে কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইয়া যান।

মাতঃ সর্ব্বময়ি! প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তুত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণু গিরিশস্ত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা,
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া॥

হে মাতঃ! বিশ্বমধ্যে তুমিই সর্ব্ব-পদার্থ স্বরূপ, তোমা ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত্বন্তর নাই। মা তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু ও তুমিই গিরিশ, তুমিই পরাশক্তি। হে অচিন্ত্য-চরিতে! আমি তোমার মহিমা কি বর্ণন করিব, তোমার অচিন্ত্য চরিত্র ব্রহ্মাদিরও গম্য নহে।

ষষ্ঠাধ্যায়।

শ্রাদ্ধ মন্ত্রার্থের মর্ম্ম।

অস্মদ্দেশে পিতৃ পিতামহাদির শ্রাদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রের এক বিশেষ আজ্ঞা; কিন্তু তাহাতে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিলে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত উৎসর্গ কার্য্যের পর শ্রাব্য পাঠের অর্থাৎ বেদমন্ত্র পাঠের বিধি আছে। কিন্তু সেই প্রচলিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে শ্রাব্যমন্ত্র মহাভারতাখ্য ইতিহাসাদির কয়েকটী শ্লোক মাত্র। প্রথমতঃ "যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্য" ইত্যাদি। অনন্তর "মন্বত্রী বিষ্ণুহারীত" ইত্যাদি। মধ্যে একটি শ্রুতি যথা—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি। পরে মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বীয় শ্লোক— "দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" ইত্যাদি এবং "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" ইত্যাদি। ইহাতে এই সংশয় হয়, যে যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপূর্ব্ব-বংশীয় রাজারা যখন শ্রাদ্ধ করিতেন, তখন এই সকল শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ হইত কি না? পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন পাণ্ডবীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রাব্য-পাঠে কোন মতেই সংগত হয় না। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে তাঁহাদিগের শ্রাব্য পাঠ কি হইত? বিশেষতঃ বেদ

পাঠের স্থলে ভারতাদি-শ্লোক পাঠেরই বা প্রয়োজন কি? এই সংশয় জন্য ইদানীন্তন অনেকানেক ব্যক্তির মনোমধ্যে শ্রাদ্ধের প্রতি এক প্রকার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। নব্য-দলের ত কথাই নাই; তাঁহারা ত একবারে শ্রাদ্ধাদির শ্রাদ্ধ করিয়া শেষ করিয়াছেন; ইদানীন্তন অনেক বিজ্ঞলোকেরও মনে শ্রাদ্ধের মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বিশেষ মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়েন না। কেবল এই মাত্র উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকেন যে, পূর্ব্ব পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত করা অন্যায় কার্য্য। আমার নিজের মনে এই মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে বহু দিবস হইতে নানামত সন্দেহ উপস্থিত ছিল; পরে মহাত্মা জ্ঞানিবর পরমহংসের সাক্ষাৎকার লাভ করায় তাঁহার কৃপায় এই শ্রাদ্ধ বিষয়ক মন্ত্র যেরূপ অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিবেদ শুদ্ধ "তত্ত্বমসি", অর্থাৎ "তৎ সৎ" এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। "তৎ সৎ" পদে জীবেশ্বরের বিচার। অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা। যে আত্মা সেই জীব। এই উভয় বস্তুর বিচারই বেদ শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কালে যুধিষ্ঠিরাদির আখ্যান স্বরূপ যে শ্রাব্য মন্ত্র পাঠের প্রতি সন্দেহ হইতেছে, সেই আখ্যান বস্তুতঃ

নিগূঢ় অর্থে জীবেশ্বর বিচার। একারণেই শ্রাদ্ধ কাণ্ডে বেদার্থ জনক মন্ত্র স্বরূপ পঠিত হইয়া থাকে।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য সকলের তাৎপর্য্য এই যে, নির্গুণ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা গুণ ও মায়া অবলম্বন করিলেই সগুণ ও জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। গুণ ও মায়া রহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা নির্গুণ হয়েন। ফলিতার্থে এই উভয়ের স্বরূপের ভেদনাই কেবল সোপাধিক জীব ও নিরুপাধিক পরমাত্মা, এই মাত্র। নীচতম কীট জন্তু হইতে উচ্চতম দেবমূর্ত্তি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই মায়ার কার্য্য। যখন ভগবান সৃষ্টিলীলা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় মায়াতে উপগত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই মায়ার কার্য্যভেদে তাঁহাকে বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি কহে। ভূরিভূরি শাস্ত্র উল্লিখিত বৈদিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে।

"জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
সা চাবরণয়া শক্ত্যা বৃতা বিজ্ঞানরূপিণী॥
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বভাবতঃ।
তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী সা বিদ্যারূপিণী।
চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা।
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপা ভবতি ব্রহ্মা তদুপধারিকা॥"

শিব সংহিতা।

ভগবানের মহামায়া জড়রূপা এবং ত্রিগুণময়ী বিজ্ঞান-রূপিণী। মায়া আবরণ শক্তিতে আবৃতা হইয়া বিক্ষেপ স্বভাব বশতঃ পরমাত্মাকে জগদাকারে পরিণত করেন। আবরণ শক্তিতে আবৃত মায়া তমোধিকা হইয়া লক্ষ্মীরূপা হন। তাহাতে উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণু বলিয়া আখ্যাত করা যায়। সেইরূপ রজোধিকা মায়াকে সরস্বতী ও তদুপহিত চিৎস্বরূপ চৈতন্যকে ব্রহ্মা বলা যায়। ফলিতার্থে ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতির সংজ্ঞামাত্র ভেদ।

পাণ্ডবীয় আখ্যানকে উল্লিখিত বেদার্থ বিচার বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বেদ শাস্ত্রে রূপক ব্যাজে এরূপ বর্ণিত আছে যে, ভগবান একমাত্র যোগমায়া দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষ উৎপাদন করত আপনিই জীবেশ্বর রূপে সখাভাবে তাহাতে অধিবাস করেন। শরীরজ কর্ম্ম রূপ যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা আত্মারূপে ভোগ না করিয়া জীব রূপে ভোক্তা হয়েন। যথা—

'দ্বা সুপর্ণসযুজা সখ্যয়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্যত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

ইতি তৃতীয় মন্ত্রকম্।

দুই পক্ষী একত্র যুক্ত হইয়া সখাভাবে এক বৃক্ষে বাস করেন। তাহাদিগের একজন সেই বৃক্ষের ফলভোগ করেন, অন্যে ফলভোগ করেন না। কেবল স্বাক্ষী স্বরূপ দর্শন করেন।

এস্থলে উচ্ছেদন বিষয়ে সমানতা প্রযুক্ত প্রাণিশরীরকে বৃক্ষ ও তাহাতে লিঙ্গোপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা ও তদ্বিহীন ঈশ্বর এই উভয়ের সমাধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। এক ক্ষেত্রজ্ঞ লিঙ্গোপাধিক জীবাত্মা দেহাশ্রিত-কর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদুফল ভোজন করেন; অন্য নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর তাহা ভোজন করেন না। নিত্য স্বাক্ষিত্বরূপে প্রেরয়িতা মাত্র।

মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোর্জ্জুনো ভীমসেনোস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।"

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ। ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ ও শাখা। নকুল ও সহদেব তাহার উৎকৃষ্ট পুষ্প এবং ফল। এই বৃক্ষের মূল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও বেদ আর ব্রাহ্মণ এই তিন।

উল্লিখিতরূপ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য সকলই সনাতন-বেদ-ভক্ত হিন্দুগণ পুরাকালে শ্রাদ্ধ সময়ে শ্রাব্য মন্ত্র স্বরূপে পাঠ করিতেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদির জন্মগ্রহণের পর ভগবান্ বেদব্যাস যখন যুগানুসারে মনুষ্যগণের ক্ষমতা হ্রাস হেতু স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের পক্ষে বেদপাঠের অধিকার বিলুপ্ত করিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে বেদ তাৎপর্য্যের সহিত একতা রাখিয়া ভারতীয় শ্লোক রচনা করেন। যুধিষ্ঠিরাদির অনন্তর-জাত লোকেরা ঐ বেদার্থ প্রতিপাদক ভারতীয়

শ্লোক সেই শ্রাব্য মন্ত্রস্থলে পরিগণিত করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, অনুধ্যানশীল হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে কাল অসীম পদার্থ। উহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত। যথাক্রমে এই চারিযুগ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং কত শত বা কত সহস্রবার সত্যাদি যুগ জগতে গতাগতি করিয়াছে, তাহার সীমা নাই। অতএব আমরা যে সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছি, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে,

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ"

ইত্যাদি শ্লোক শ্রাব্য মন্ত্র স্থলে পাঠ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পাণ্ডবদিগের আখ্যানের সহিত বৈদিক জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক তত্ত্বের এক-বাক্যতা আছে। এক্ষণে তাহা স্ফুটীকৃত হইতেছে।

পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চভূত; দ্রৌপদী যোগমায়া, স্বাক্ষীত্বরূপে সখাভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্যাধিষ্ঠিত আছেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ বলে। নরপদে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ পদে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা ও সমানরূপ। কেবল অর্জ্জুন ভোক্তা, কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন। সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে প্রেরকত্ব ধর্ম্ম দেখাইতেছেন। তিনি পাণ্ডব সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন এইমাত্র। সৃষ্টি সেতু ভেদক

যে শত দোষ, সেই শত দোষ নিবারণ হেতু দুর্য্যোধনাদি শত কুরুর বিনাশ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতৃরূপ শত দোষকে একমাত্র ভীম দ্বারা নিপাত করিয়াছেন ; কেননা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি যে কামাদি শত দোষ, তাহা এক বায়ু সাধন প্রাণায়ামেতেই বিনষ্ট হয়।

পঞ্চ পাণ্ডবাদি যে পঞ্চ ভূতাদি স্বরূপ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যাখ্যাত হইতেছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ পদার্থ পঞ্চভূত নামে অভিহিত। এস্থলে পার্থিবাংশ রাজা যুধিষ্ঠির—ক্ষমাগুণ-বিশিষ্ট। পবন-পুত্র ভীম বায়ু-স্বরূপ। অর্জ্জুন আকাশ স্বরূপ; একারণ তাঁহাকে ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া খ্যাত করা হইয়াছে। আকাশ পদে ইন্দ্র; সুতরাং ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনও আকাশ পদের বাচ্য। আকাশ যেমন নীলাভ, অর্জ্জুনও তদ্রূপ নীলবর্ণ। আকাশ স্বচ্ছ পদার্থ, ব্যবধান-শূন্য হেতু তাহাতে সারল্য আছে ; অর্জ্জুনও নির্ম্মল চিত্ত এবং অবক্র ভাবাপন্ন। আত্মা যেমন সর্ব্বব্যাপী, আকাশও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক। তর্জ্জন্য আত্মাকে আকাশ শরীরী বলা যায়। এস্থলেও কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে অভেদাত্মা কহিয়াছেন। অর্থাৎ যে কৃষ্ণ সেই অর্জ্জুন, যে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশই ব্রহ্ম-সান্নিধ্য কহা যায়। তন্নিদর্শনার্থ অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং সন্নিধান প্রযুক্ত সারথ্যাবৃত হইয়া এক-রথে সহবাস করিয়াছেন। কৃষ্ণকে সারথি বলাতে কৃষ্ণেচ্ছানুসারে

গতি, এবং পঞ্চভূত জড়পদার্থমাত্র, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। নকুল ও সহদেব, জল ও অগ্নি স্বরূপ। একারণ, অশ্বিনী কুমারের পুত্র বলিয়া খ্যাত। অশ্বিনী কুমার সূর্য্যের তনুজ; তাঁহাদিগের হইতেই নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি। সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নিরও উৎপত্তি হয়। জলের শীতলতা ও আর্দ্রতা গুণ নকুলে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নির গুণ রূপ, তাহা সহদেবে বিদ্যমান আছে। সহদেব জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন; এজন্য তাঁহাকে অগ্নিরূপ কহা যায়। শরীর ধারণার্থ পঞ্চীকরণ প্রস্তাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশাদির অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি দ্রৌপদীরূপা যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণরূপ আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী হইয়াছেন। দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া চেতনবৎ বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণ-লিপ্তা নহেন। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চ পাণ্ডবাখ্য পঞ্চ ভূতকে পঞ্চীকরণরূপে অংশানুসারে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ ভগবদিচ্ছানুসারে মহামায়া প্রকৃতিরূপে পঞ্চ ভূতাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইহাই দ্রৌপদীর পঞ্চপতি যোজনার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। নচেৎ ইহা অজ্ঞেও বুঝিতে পারে, যে এক স্ত্রীর বিদ্যমান পঞ্চ পতি লোকতঃ শাস্ত্রতঃ উভয় বিরুদ্ধ হয়। একারণ দ্রৌপদীর বিবাহকালে দ্রুপদ রাজাকে বেদব্যাস কহিয়াছিলেন, যে তুমি পঞ্চ

পাণ্ডবকে দ্রৌপদী প্রদান কর, ইহা বেদবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবে না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস বেদার্থ বিচার করিয়া এ বিষয়ে স্বরূপোপদেশই করিয়া ছিলেন। আত্মা যেমন নিষ্ক্রিয় ও মুক্তস্বভাব, তিনি কোন কর্ম্মই করেন না, এবং প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত; কেবল মায়া সন্নিধানস্থা হওয়াতে তাঁহাকে তদ্গুণে গুণবান দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্কিয় স্বরূপ। কেবল দ্রৌপদী সন্নিহিত থাকায় তিনি পাণ্ডবার্থ বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপকরণ সামর্থ্য রহিত। কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। কেন না, বৃক্ষবৎ দেহেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে; তজ্জন্যই "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্যে ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভীম তাহার স্কন্ধ ও অর্জ্জুন তাহার শাখা স্বরূপ। অর্থাৎ স্কন্ধ যেমন বৃক্ষাবয়বের ধারক, ভীম শব্দের লক্ষ্য অর্থ বায়ু, সেইরূপ সমস্ত দেহের ধারক। শাখা পদে বিস্তার, বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে। একারণ অর্জ্জুন শব্দের লক্ষ্য অর্থ আকাশ দেহের বিস্তৃতি স্বরূপ। পুষ্প ও ফল পদে রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা প্রযুক্ত সহদেবের সৌকুমার্য্য কল্পিত হইয়াছে। ফলের রস জলীয়াংশ তৃপ্তিকারক, একারণ তৃপ্তিকারক নকুলকে ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যেমন শরী-

রের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুল প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসখা রূপে মন্ত্রণা দান দ্বারা যুধিষ্ঠিররূপ বৃক্ষের মূল স্বরূপ; তৎ সত্তাতেই পাণ্ডবগণ সচেতন হইয়া আপন আপন সাধনীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। আবার ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণরূপে তিনিই ধর্ম্মরূপে মহাবৃক্ষের মূল হইয়াছেন। যেমন শ্রুতি প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী পরমাত্মা শরীররূপে বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কর্ম্ম নিষ্পন্ন স্বাদু ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবাত্মাকে ভোগ করান, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ভারতের যুদ্ধাদিরূপ কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন যে রাজ্যরূপ সুস্বাদু ফল, তাহা আপনি ভোগ না করিয়া অর্জ্জুনাদিকেই ভোগ করিতে দিয়া ছিলেন। এই তাৎপর্য্যই যুক্তিসিদ্ধ, এবং শাস্ত্র-সিদ্ধ; "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো" ইত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। শ্রাদ্ধকালে এই বেদার্থযুক্ত মন্ত্র সকল পাঠদ্বারা বেদমন্ত্র পাঠেরই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়; তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সপ্তমাধ্যায়।

কাশীক্ষেত্রের মর্ম্ম।

——oo——

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশী অতি পবিত্র স্থান। এই স্থান প্রাপণজন্য ভারত-ভূমির সকল ভাগের যাবতীয় হিন্দুবর্গই ঐকান্তিক কামনা করিয়া থাকেন, এবং সচরাচর

সকল লোকেই চরমকালে ঐ কাশীধামে বাস এবং অনন্য-মনাঃ হইয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন। শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে যে, মুক্তিধাম কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়। অর্থাৎ মনুষ্য সংসার-ক্ষেত্রে যে কোন দুষ্কৃতি ও পাপাচরণ করুক না কেন, এক কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ হইলে সে ব্যক্তি নির্দ্ধূতকল্মষ হইয়া পরিমুক্ত হইতে পারে। মৃত্যুকালে কাশীর অধীশ্বর বিশ্বেশ্বর সকলের কর্ণে নিস্তার-বীজ-স্বরূপ তারক-ব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিয়া কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি কাশীস্থ জীবনিকরকে নিস্তার করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই সর্ব্ব দিগ্‌দিগন্তরস্থ হিন্দুবর্গ ঐ স্থানে গমন, বাস ও পরিশেষে দেহত্যাগ করণের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই কাশীক্ষেত্র কি ও তথাকার যে সমস্ত কার্য্য ও প্রণালী তৎসমস্তের নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বিশ্বে-শ্বর কে এবং মণিকর্ণিকাই বা কি? যে অন্নপূর্ণা দেবী কাশী-ক্ষেত্রে বিরাজমানা, যাঁহার অনুকম্পায় এই স্থানের কোন জীবকে অনাহারে দিনযাপন করিতে হয় না, তিনিই বা কে? এই সমস্ত বৃত্তান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিবৃত করা আবশ্যক। কারণ তাহাতে অনেকের মনে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দোৎ-পত্তি এবং পরিণামে ৺কাশীধামের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিবর পরমহংসের ব্যাখ্যা অনুসারে বারাণসী-ক্ষেত্রের মর্ম্ম পরিস্ফুট-রূপে বিবৃত হইতেছে।

দেবতাদিগের যাগ ভবনকে "দেব-যজন" বলে। এই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্র দেবযজন, প্রয়াগও দেবযজন, কাশীও দেবযজন বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। দেবযজন স্থান সকলই মুক্তিলাভের পরম্পরা কারণ। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানই নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ। কাশী প্রভৃতি মহা-তীর্থের বর্ণনা হইতে তত্ত্বজ্ঞান পক্ষে মানব শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান সকলকে তীর্থরূপে গণ্য করিতে হইবে। এরূপ জ্ঞানের নামই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান। যোগ নানাবিধ। বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরস্থ বস্তুর একযোগ করাকেই "রাজযোগ" বলে। সেই রাজযোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের দেহই ইন্দ্রিয়গণের আরাধনীয় স্থান, দেহেই আত্মার অবস্থান জন্য ইহার নাম ব্রহ্ম সদন। কিন্তু কাশীধামের ব্যাপার সকল রাজযোগ সাধনের সুকৌশল সম্পন্ন সুচারু ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

জ্ঞান ভূমির নাম অবিমুক্ত। অবিমুক্ত শব্দে যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই। বারাণসী-ক্ষেত্র প্রকৃত জ্ঞান ভূমি, তজ্জন্যই অবিমুক্ত শব্দের বাচ্য। ইহা ব্রহ্ম সদন ও ব্রহ্ম-ধাম। শাস্ত্রে সকলের দেহের শিরোভাগকে ব্রহ্ম সদন অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান বলিয়াছেন। যখন জীবের প্রাণ সকল উৎক্রমমাণ হয়, অর্থাৎ প্রাণ অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ ঊর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্ম স্থান শিরোবস্থিত-অধোমুখ-সহস্র-দল-

কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরামাত্মাভিমুখে গত হয়, তখন পরমাত্মা শিব তারক মন্ত্র প্রদান করেন। তাঁহারই প্রভাবে জীব সকল মুক্তিরূপ পরম পদকে লাভ করে। যদ্রূপ পরমাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানী যোগী পরম হংসেরা জ্ঞান প্রভাবে প্রাণ সকলকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া সমাধি যোগে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাহিরে কাশীক্ষেত্রও যোগ-স্থান ব্রহ্ম সদন রূপে পরিগণিত। ইহাতে জ্ঞানীর কথা কি—শশক মশকাদি জন্তু মাত্রেও প্রাণত্যাগ করিয়া যোগী জনের অভিলষিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ কারণ যোগী পরমহংসেরা প্রাণান্তেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন না। চির কালই তারক মন্ত্রাভিলাষে কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে। তারক ব্রহ্মপদে "প্রণব" (তারয়তীতি, তারঃ। স্বার্থে কঃ) যেমন যোগী অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী জনগণ সর্ব্বসাধনাবসানে প্রণবাবলম্বন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাশীধামে অল্পায়াসে মৃত্যু মাত্রেই প্রণবাবলম্বন যোগ সম্পূর্ণ হয়। ফলিতার্থে প্রণবাবলম্বনই মোক্ষোপদেশ; কাশীতে তাহাই লাভ হয়; সুতরাং অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ঘটিত যে সকল কর্ত্তব্যোপদেশ, তাহাই বাহ্যে কাশী-ক্ষেত্রে লভ্য হইয়াছে। অতএব কাশীবাস করিয়া কাশীর স্বরূপার্থ অবগত হইয়া অবিমুক্তোপাসনা করিলে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মই হয়।

যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মা উপাস্য, সেইরূপ অবিমুক্তে

অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বর উপাস্য হয়েন। যেমন জীবের মস্তক ব্রহ্মধাম, সেইরূপ পুণ্যধাম ভারত ভূমির মস্তক স্বরূপ বারাণসীও ব্রহ্মধাম। স্বরূপার্থ তত্ত্বলক্ষণ-লক্ষিত কাশীক্ষেত্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ হয়। অপরন্তু নির্ব্বিকার,নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরম ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞান হওয়া অতি কঠিন। বিশেষতঃ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কষ্টাতিশয় প্রযুক্ত অনেকেই তাহা করিতে সক্ষম নহেন। ফলতঃ গুণবদ্দেহে নির্গুণতার স্বরূপ জ্ঞানে চিত্তের অভিনিবেশ অনেকেরই অসাধ্য। একারণ জীবানুকম্পী ভগবান সাধক দিগের হিত-সাধনায় উপাসনা সিদ্ধ্যর্থ প্রকৃত যোগ সাধনার উপকরণ স্বরূপ নাশী, বরণা, গঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থে পরিবেষ্টিত সর্ব্ব তত্ত্বময় অবিমুক্তক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বেশ্বররূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এই বারাণসী মধ্যে যে স্থান কাশী তাহা তত্ত্বজ্ঞান পক্ষে জীবের নাসার ঊর্দ্ধ ভ্রূদল মধ্যে যে স্থানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি নাদশক্তি পরিবেষ্টিত পরমাত্মা বিন্দুতীর্থরূপে বিখ্যাত রহিয়াছেন, তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ। যেমন বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র, অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সুরসরিৎ ও তদ্বিপরীতভাগে বরণা ও নাশী আদি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেইরূপ ভ্রূদল মধ্য স্থান দিক্‌ত্রয়ে ত্রিগুণা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না এই নাড়ীত্রয়ে বেষ্টিত। বারাণসীর মধ্যস্থিত ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত; ভ্রূমধ্যে বিন্দু স্থানও পঞ্চ কোষাত্মক ভূত তন্মাত্র। কাশীপুরের অধিষ্ঠাতা

কালরাজ, ভ্রূদলেও শ্বাস প্রশ্বাস রূপ সময় পরীক্ষক কাল-রাজ বিদ্যমান রহিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে বিঘ্নরাজ ঢুণ্ডি বিনায়কের স্থিতি, ভ্রূদল মধ্যেও বিনায়ক রূপী বিঘ্নরাজ মনের স্থিতি হয়। কাশীতে যেমন তৃপ্ত্যর্থ চতুঃষষ্টি যোগি-নীর ঘাট আছে, সেইরূপ ভ্রূদলের অধীনে জীবের তৃপ্ত্যর্থ চতুঃষষ্টি বৃত্তি ঘাটরূপে পরিসংস্থিত হইয়াছে। অবিমুক্তে যেমন লোলারে র্কস্থান, ভ্রূদল মধ্যেও শূন্যাবলম্বিত লোলরূপ নাদরূপী সূর্য্যের অবস্থিতি হয়। যথা,—

"নাদ চক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো
বিন্দু চক্রে চ চন্দ্রমা।"

কাশীতে যেমন ব্রহ্মনাল মণিকর্ণিকার স্থিতি, এস্থানেও চক্রস্থ পদ্মনাল-রূপা সুষুম্না ব্রহ্মপুর গামিনী হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ব্রহ্মনাল বলিয়া উক্ত করেন। পরাশক্তি যেমন [illegible]গুলাকার মহামণি স্বরূপ বিন্দু সরোবররূপে ভ্রূদলে সংস্থাপিত আছেন, কাশী ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভবানী অন্নপূর্ণা রূপে অধিবাস করিতেছেন।

ভ্রূদল মধ্যে ভবশক্তি অর্থাৎ জীবের উৎপাদিকা ও ভোগ প্রদায়িনী শক্তি অবস্থিতা আছেন, (ভূ ধাতু সত্বাতে বর্ত্তে। অতএব ভব শব্দে উৎপত্তি,—আনী শব্দে প্রত্যয় জনিকা শক্তি, ইহাতেই অন্নপূর্ণার নাম ভবানী হইয়াছে) সকল দেবতাই কাশীতে অধিবাস করিয়াছেন, ভ্রূদলেও প্রাণ বায়ুর সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অধি-

কারে অবস্থিতি করিয়া থাকে। অতএব অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের পরিজ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ কি।

কাশী ক্ষেত্রে যেমন বরণা ও নাশী নদীদ্বয় রূপে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ ভ্রূদল মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয় রূপে অবস্থিতা আছেন। তথাহি, "বারয়তীতি বরণা", "নাশয়তীতি নাশী"; ইড়াতে প্রাণ বায়ুর পূরক রূপ অবগাহনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত মলের বারণ হয়, পিঙ্গলাতে প্রাণ বায়ুর রেচনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, হস্ত, পদ, উপস্থ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত জন্মান্তরীয় পাতকের নাশ হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও বরণাতে অবগাহন মাত্রেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-কৃত পাপের অপহরণ হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্ম ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফল লাভ হয়, বরণার বারি-স্পর্শ মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই ফলের সম্যক্ লাভ হইয়া থাকে। নাশীতে অবগাহন মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

এতন্নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী কাশীকে পতিত পাবনী গঙ্গা দেবী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং পরমপদ প্রদায়িনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরায়ণ দেবাযানকে প্রদর্শন করিতেছেন; অর্থাৎ যোগী জনেরা পিঙ্গলা দ্বারে আদিত্যে প্রবেশ করিয়া যোগ প্রভাবে যে পরম পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কাশীতেও ব্যক্তি মাত্রেই

বিশ্বেশ্বরের অনুকম্পায় সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। যেমন তত্ত্ব জ্ঞানাবলম্বীর যাগ-যজ্ঞ-সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করা ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ না করিলেও হয়, করিলে মঙ্গল ব্যতীত ক্ষতি নাই; কাশীধাম বাসেও সেই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রে অসী-বরণাতে গঙ্গাম্ভঃ-সংমিলন রূপ তৎসন্ধিকে সন্ধ্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অবগাহন, তাহার নাম ব্রহ্ম সন্ধ্যা। ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসন্ধ্যোপাসনা কালীন আপো মার্জ্জন মন্ত্রার্থে এবং আচমন মন্ত্রার্থের সহিত ঐক্য করিলেই বারাণসীর এই মহিমা প্রকৃত রূপে উপলব্ধি হইতে পারে। অধ্যাত্ম যোগে যোগিগণ স্বশরীরে যে সকল তীর্থের কল্পনাতে ত্রিবিধ পাপক্ষালন করিয়া থাকেন, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রত্যক্ষীভূত অর্থাৎ ভগবৎ কর্ত্তৃক চির প্রকল্পিত রহিয়াছে। এখানে বারাণসী গঙ্গায় স্নান করিলে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল সম্যক সম্পাদন করা যায়। আয়াস সাধ্য বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অপেক্ষা থাকে না। এবিধায় চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, পুক্কশ, যবন, কিরাতাদি নীচ জাতি এবং স্ত্রী শূদ্রাদি—যাহাদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই, তাহাদিগের একমাত্র কাশী বাসেই বেদাধ্যয়ন, বেদানুষ্ঠান ও তদর্থ-ধারণার সম্যক্ ফল লাভ প্রকল্পিত হইয়াছে। যেমন পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ব জীবের মোক্ষের কারণ, তদ্রূপ কাশীবাসও সর্ব্ব জাতির মোক্ষের কারণ হয়। বেদোদিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারীর ভেদ

ও বিচার আছে, সুলভোপায়ীভূত বারাণসী ক্ষেত্রে মোক্ষপদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতির ইতরবিশেষ নাই; স্ত্রী পুরুষাদি কোন অধিকারীর বিচার নাই। কোন মন্ত্র পাঠের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিকের এবং পণ্ডিত ও মূর্খের মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে প্রভেদ নাই। যে কেহ যে কোন রূপে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করেন; একারণ সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন—

"যেষাং ক্কাপি গতির্নাস্তি
তেষাং বারাণসী গতিঃ।"

যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচার-ভ্রষ্ট, অধম ব্যক্তির এক কাশীই পরমা গতি হয়েন।

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন-জননী ব্যাপিনী জ্ঞান-গঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজ গুরুচরণং ধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ স্বাক্ষীভূতান্তরাত্মা,
দেহং সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎকিমস্তি ॥"

বিশ্বেশ্বর অবিমুক্তেশ্বর। বিশ্বপদে ব্রহ্মাণ্ড; পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য বিধানে নরদেহকে ব্রহ্মাণ্ড বলে; সেই মনুষ্যদেহের ঈশ্বর আত্মা; সুতরাং আত্মাই সকলের নিয়ন্তা হয়েন। পরমাত্মা সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বর রূপে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইহাই কাশীক্ষেত্রের মর্ম্ম; ইহাই বারাণসী ধামের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ইহার সহিত

মনুষ্য শরীরের তত্ত্বাবলীর কিছু মাত্র বিভিন্নতা বা অনৈক্য নাই এবং এই নিমিত্তই সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্ব প্রকার মনুষ্য ও মুনি, ঋষি, যোগী, সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে এত প্রেম ও এত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং তথায় দেহোপরতি করিয়া অমরণ-ধর্ম্ম-রূপ মুক্তিপদ লাভের বাসনা করেন। ইহাতে সন্দেহ করা অজ্ঞের কার্য্য।

যে বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রজ্ঞা-চক্ষু-হীন মূর্খ ব্যতীত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংশয় কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে বর্ত্তমান সময়ে পবিত্র ভারতবর্ষের যেরূপ দুরবস্থা এবং মায়া মোহাকৃষ্ট জন সকলের চিত্ত দিন দিন যেরূপ ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে, শত শত শাস্ত্র সত্ত্বেও ঐ সকল ব্যক্তি আপন আপন কুযুক্তি দ্বারা যেরূপ ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অনুধ্যান শীল ব্যক্তির হৃদয় একান্ত ব্যথিত হয়। যদিও হিতোপদেশ জনক অনেক শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে অন্ধবৎ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন উপকার দর্শিতে পারে না।

> "যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা,
> শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
> লোচনাভ্যাং বিহীনানাং
> দর্পণে কিং প্রয়োজনম্॥"

যাহার স্বয়ং প্রজ্ঞা অর্থাৎ ধর্ম্মোৎপাদিনী শোভনা বুদ্ধি

না থাকে, তাহার শুদ্ধ শাস্ত্রে কি করিতে পারে? যে হেতু চক্ষুহীন ব্যক্তির দর্পণে কি প্রয়োজন?

অপরন্তু লোক-চক্ষু বলিয়া সূর্য্যের যে নাম, সেই নাম-গুণে, তিনি জগৎকে প্রকাশ করেন; কিন্তু গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই জগৎ-প্রকাশক সূর্য্যের গৌরব কি? সুবুদ্ধি সত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী, শাস্ত্রও তাহার বুদ্ধির অনুগত হয়। যাহাদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লৌকিক যুক্তির প্রতি নিতান্ত নির্ভর, তাহাদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ শাস্ত্রের মর্ম্ম কদাপি উদ্ভাবিত হইতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র-সিদ্ধ পরমেশ্বরের পরম তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ না করে, শুদ্ধ যথেচ্ছাচার ও কদর্য্য ব্যবহারাদির কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়, সেই সকল বাচাল পুরুষেরাই পূর্ব্বতন শাস্ত্র-বক্তা মহর্ষিগণের বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

অষ্টমাধ্যায়।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মর্ম্ম।

প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে অনেকেই রথ যাত্রার উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

তথায় দারুময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থতা লাভ স্বীকার করেন এবং শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে " জগন্নাথ-মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"।

ইহাতে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কাষ্ঠাদি নির্ম্মিতা কুৎসিতাকারা প্রতিমা দর্শনে মুক্তিলাভ কি রূপে সম্ভব হয়? এই সংশয় নিবারণ জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত পরমা-রাধ্য পরম হংসের কৃত জগন্নাথ মূর্ত্তির ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

এরূপ ইতিহাস আছে যে, পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামা ভূপতি অতি ধার্ম্মিক, ও পরমাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠোপদেশে সর্ব্বজন-হিতার্থ তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত দারু নির্ম্মিত জগন্নাথ মূর্ত্তি অর্থাৎ কল্পিত ব্রহ্ম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ চিত্তে স্বরূপ লক্ষণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে যে ব্যক্তি জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করে, অসংশয়ে তাহার মোক্ষলাভ হয়। রাজাধিরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন। অবন্তী নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ দেওয়াতে, সেই জ্ঞান প্রভাবে, সংসারা-সক্ত জনগণের প্রতি তাঁহার কারুণ্য উপস্থিত হয়; অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানাভাবে অহরহঃ ভ্রাম্যমাণ জীবগণ সংসারে যন্ত্রণা-নলে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তাহাদিগের নিষ্কৃতি জন্য তিনি

সমুদ্র কূলে এই সুধন্য দারুময় ব্রহ্ম মূর্ত্তির সংস্থাপনা করেন। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে সকলেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ঐ পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা মহারাজ ইন্দ্র-দ্যুম্ন শুদ্ধ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণাভাবে অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা এই ব্যাপারকে সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বৈদিক ধর্ম্মী লোকে চিরকালই জগদ্বন্ধুর দর্শন লালসায় শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, জাতি বিচারের প্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া, সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও সকলেই সকলের সহিত একত্র মিলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্ততঃ ইহাতেও বোধ করিতে হইবে, যে পূর্ব্বজাত মহর্ষিগণ যখন এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।

আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনগণ হইতে তাঁহারা যে উচ্চতর জ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষি বেদব্যাস হইতে কেহই অধিক তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। অচিন্ত্যকল্প চারিবেদ যাঁহার লেখনী হইতে সমুদ্ভূত, অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানাত্মক বেদান্ত শাস্ত্র যাঁহার সৃষ্ট পদার্থ, ভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থ সকল যাঁহার সহজ বক্তৃতা, উপনিষৎ প্রণেতা ঋষিগণ যাঁহার শিষ্য, সেই বেদব্যাস যখন স্কন্ধ পুরাণে উৎকল খণ্ডে ও ব্রহ্ম পুরাণে জগন্নাথ দেবের মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ মূর্ত্তি যে পরমাত্মার

স্বরূপ তত্ত্বোপদেশক তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের পূর্ব্বে তথায় একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাহাতেই উপদেশ করা হইয়াছে যে, বিনা যজ্ঞাদি কর্ম্মে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যথা "কষায়ৈকমতৌ পক্বে ততোজ্ঞানমিতি স্মৃতিঃ"। কষায় কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির পরিপাক জন্মে; সেই পরিপক্ক বুদ্ধিতে তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়।

কিন্তু অপক্ক বুদ্ধিতে প্রণবরূপী জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলেও জীব পরিমুক্ত হইবে; "সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে"—ঘোর সংসার বিষয়ে জীব যদি পুনর্ব্বার লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনানন্তর যদি আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তবে দর্শন মাত্রেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। প্রকৃতার্থে শ্রীমজ্জগন্নাথ দেব সাক্ষাৎ প্রণবমূর্ত্তি। যিনি প্রণব, তিনিই পরব্রহ্ম হয়েন।

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়। শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন যে "পরমাত্ম তত্ত্বে জ্ঞাতে সর্ব্বে পবিত্রা ভবন্তীতি। তত্র ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র-সঙ্কর-চণ্ডালান্ত্যজাদিবিচারণা কার্য্যা"।

পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়। সেখানে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর এবং চণ্ডাল অন্ত্যজাদি জাতির কিছু মাত্র বিচার নাই। এই সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞানার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রসাদ ভোজনে

কোন জাতির বিচার নাই; অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে কেহই অপবিত্র থাকে না। শুদ্ধ আত্মাই পরম পবিত্রতার কারণ, ইহা শ্রুতি শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন। যথা মৈত্রেয় উপনিষৎ।

"অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি। অনুপনীত উপনীতো ভবতি। সোঽগ্নি-পূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। স সূর্য্য পূতো ভবতি। স সোমপূতো ভবতি। স সত্য-পূতো ভবতি। স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈ র্হুধ্যাতো ভবতি। সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি। তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি। গায়ত্রী ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। ইত্যাহ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভো জাপ্যেনামৃততত্ত্বং গচ্ছতীতি।

প্রণবাবলম্বী ব্যক্তি অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত হইলেও উপনীত হয়; সে সর্ব্বদা পবিত্র, অগ্নিপূত, বায়ুপূত, সূর্য্যপূত, চন্দ্রপূত এবং সত্যপূত হয়। তাহাকে সকল দেবতাই জানেন, অথবা সে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি জ্ঞাত হয়। সে সমস্ত বেদাধ্যয়নের এবং সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ষষ্টি সহস্র গায়ত্রী জপের ফল পায়। ইহা ভগবান্ বেদাচার্য্য হিরণ্যগর্ভ কহেন। এতৎ শ্রুতি পাঠে অমৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

প্রণবাবলম্বনের যে ফল, তদনুরূপ শ্রীক্ষেত্র গমনের ও জগন্নাথ দর্শনেরও ফল দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তথায় কোন জাতির বিচার নাই, কোন নিয়মের অনুষ্ঠান বা একাদশ্যাদি কোন ব্রতের আবশ্যকতা নাই অথচ তথায় সকলেই সম্যক্

প্রকারে পবিত্র বলিয়া বিচরণ করেন; সকলেই দেববৎ আচারী। তথায় বিধি-মন্ত্র-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান নাই, অথচ সেই স্থান পবিত্ররূপে সকলের গ্রাহ্য। সুতরাং প্রণবাবলম্বন জন্য যে ফল, শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও সেইরূপ ফল; অতএব জগন্নাথ দেব যে প্রণবরূপী পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। শাস্ত্রে জীবের দেহকে পুরী শব্দে উক্ত করেন; তাহাতে অধিষ্ঠান জন্য জীবাত্মাকে পুরুষ, আর পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা যায়। (পুরীষু শেতে যঃ সঃ পুরুষ ইতি)* পুরীতে যিনি শয়ন করেন, তাঁহার নাম পুরুষ। বৃহদারণ্যকে শ্রুতিতেও আত্মাকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সর্ব্ব জীবের শরীরে অধিষ্ঠান জন্য পুরুষ পরমাত্মা। শরীর মধ্যস্থ সমস্ত-স্থান-ব্যাপী আত্মা যদিও প্রণবাকার, তথাপি শরীরোপান্তে ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্মের উপরিভাগে নাদ-বিন্দুরূপে প্রণবাকারে তাঁহার বিশেষ স্থিতি হয়। জন্মরূপ অনুত্তীর্য্য সমুদ্র পারেচ্ছু সাধকগণ সমস্ত উপাসনার শেষে প্রণবাবলম্বন করেন। কেননা, জীব-নিস্তারণ জন্য প্রণবরূপ আত্মা জন্ম-জলধি-কূলেই নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। প্রণবারূঢ় ব্যক্তির ভব-সাগরের তরঙ্গ সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হয়।

---

* ব্যাকরণ বিশেষ দ্বারা এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

পুরুষদিগকে এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাপনার্থ জলধি কূলে পুরু-ষোত্তম ক্ষেত্রে প্রণবাকার মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই হেতুই ক্ষেত্রের নাম পুরী ও তথায় অধিষ্ঠান জন্য জগন্নাথ দেবকে পুরুষোত্তম বলে। সুতরাং অধ্যাত্ম তত্ত্বের সহিত পুরী ও পুরুষোত্তমে ভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ত্রিলোক মণ্ডিত-ব্রহ্মাণ্ডকে পুরী বলে। তন্মধ্যে সর্ব্ব-কারণ পরমাত্মা প্রসুপ্তবৎ থাকেন। একারণ, তাঁহার নাম পুরুষ। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ প্রযুক্ত জীবের অন্তরাত্মা পুরুষরূপে ব্যাখাত হন। বাহ্য লক্ষণে এই উপদেশর নিমি-ত্তই সমুদ্র-কূলে পুরী ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ মূর্ত্তির অব-স্থান হইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দর্শন জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রণবাবলম্বনের ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। পুরাণে এই তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে; যথা—"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" জগন্নাথ দেবের শ্রীমুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

যেমন প্রণবাবলম্বী ব্যক্তি যদি পুনর্ব্বার দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত না হয়, তবে তাহার পুনর্জ্জন্ম নাই; সেইরূপ পুরুষোত্তম দর্শনেও সাক্ষাৎ মুক্তি। কিন্তু "সংসার বিষয়ে ঘোরে পুন-র্যদি ন লিপ্যতে," যদি সংসার ধর্ম্মে পুনর্লিপ্ত না হয়, তবেই জগন্নাথ দর্শনে পরিমুক্ত হইতে পারে।

যেমন প্রণবাবলম্বন জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন প্রযুক্ত প্রাণায়াম দ্বারা মুলস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে

হয়, অর্থাৎ অগ্রেই কুণ্ডলিনী শক্তির উপাসনাদি করিতে হয়, যে হেতু তিনি প্রসন্না হইয়া জাগৃত হইলে, তবে প্রণবাধারে জীবের আজ্ঞাপুরে গতি হইতে পারে, নচেৎ হয় না ; সেই রূপ পুরী মধ্যে কুণ্ডলিনী-রূপা বিমলা-দেবী বিরাজমানা। তৎপ্রসন্নতা ব্যতীত পুরুষোত্তম দর্শন হয় না। এ কারণ জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্র যাত্রাকারী মনুজগণ অগ্রেই বিমলা দেবীর পূজোপকরণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। জগন্নাথ ক্ষেত্রে সমুদ্র-কল্লোল ধ্বনি শ্রবণ নিবারণার্থ পুরী মধ্যে পবনাত্মজ আপন "শ্রুতি" উচ্চ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেই প্রাণায়াম যোগের বল প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি শিরোভাগ প্রণবাত্মা-প্রাপণেচ্ছায় বেদ ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রাণ বায়ুকে সংযম করিলে আর মহোর্ম্মি-মালী সংসার-সাগরের তরঙ্গ,-কল্লোল-ধ্বনি সাধকের শ্রুতি-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই লক্ষ্মী নারায়ণ একত্রাবস্থান করেন। কিন্তু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লক্ষ্মী দেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে অবস্থান নাই। তাহারও এই অভিপ্রায় যে প্রণবাবলম্বী সাধকের ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। যে হেতু পরমাত্মা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মে কদাপি লিপ্ত নহেন। শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বট বৃক্ষের অবস্থিতি, তাহাতে ইহাই জানাইয়াছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ড বটরূপী ; ইহার নিত্যত্ব সিদ্ধি আছে। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড কখন প্রকটিত, কখন বা অপ্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডাখ্য-বট-শাখা-

বলম্বী আত্মা নিরন্তর কারণ স্বরূপ জলে প্রসুপ্ত থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়-সলিলে ভাসমান মার্কেণ্ডেয় কর্ত্তৃক আত্মাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়া-মোহিত মহর্ষি ভগবান্ মার্কণ্ডেয় প্রলয়ে একার্ণবে ভাসমান হইয়া বটদলে পরমাত্মাকে শয়িত দেখিয়া তন্নিকটে অভিগমন করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় জন্য তথায় স্থান না পাইয়া ভগবৎ-শরীরে প্রবিষ্ট ঋষি কর্ত্তৃক তদভ্যন্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকিত হয়। পুনর্ব্বাহ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহর্ষি সমস্ত বিশ্বকে জলময় দেখেন। ভূয়ঃ প্রবেশে তাঁহার উদর মধ্যে বিভাসমান বিশ্ব অবলোকন করেন। অতএব বিশ্বের ও বিশ্বকর্ত্তার নিত্যত্বই সিদ্ধ আছে; অর্থাৎ আত্মাই সকল ও আত্মাতেই সকল। শুদ্ধ মায়া-বিলসিত বিশ্বরাজ্য পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর এবং শ্বেত গঙ্গাদি যে ষট্ তীর্থ পুরী-সন্নিহিত আছে, তাহাতে নানা প্রকার বৈদিক কর্ম্ম করিতে হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণবাবলম্বন হেতু শ্রুত্যুক্ত ষড়ঙ্গযোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে পরতত্ত্ব দর্শন হয় না। সেই উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই স্থলে আঠার নালা পার হইবার বিধি হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ আঠার নালা পুরুষোত্তম দর্শন পথে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্ম-তত্ত্বের মহা বিঘ্ন বোধে

পুত্রাদিকে ঐ অষ্টাদশ স্থলে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন। অতএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু হইবেন, তাঁহারা অসংশয়ে অপত্যদিগের মোহ পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা তৎপথে অবস্থিতি করিবার যোগ্য হইবেন না।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, জগন্নাথ দেবকে প্রণবাকার গ্রহণ করিতে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বোপদেশ-সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু আষাঢ় মাসে যে রথযাত্রা হয়, তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য কি? পুরাণে বর্ণিত আছে যে, "রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথস্থ বামন অর্থাৎ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহা অত্যুক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ পুরাণ বচনে "বামন" শব্দের উল্লেখ আছে, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? রথস্থ জগন্নাথের দর্শনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কি?

এই সকল সংশয়ের মীমাংসা এই যে, মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপাবলোকন হয় না। প্রথমতঃ ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, যে বিষয় অল্প-বুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে অলীক বোধ হয়, তাহা যে বিশিষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন জনের চিত্তে অলীক বোধ হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। জগন্নাথ দেব দারুময় বিগ্রহ, তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিলে যে মোক্ষ হয়, একথা সহজেই অলীক বাদ বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব এরূপ ব্যবস্থার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। যে পর্য্যন্ত সেই স্বরূপ কারণ বোধ বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি না হইবে, সে

পর্য্যন্ত ইহাতে সর্ব্বদাই সংশয় থাকিবে। ফলতঃ শাস্ত্র বচনে কেবল "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা" এই কথাই কহেন নাই, বচনে আরও বিশেষ আছে। যথা—

"দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

দোলাতে গোবিন্দকে, মঞ্চোপরি মধুসূদনকে, আর রথোপরি বামনকে দর্শন করিলে, ইহ সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ইহা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিস্তৃতরূপে তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

উল্লিখিত বচনের অর্থে জগদ্বন্ধু বা জগন্নাথ শব্দের উল্লেখ নাই; কেবল গোবিন্দ, মধুসূদন ও বামন, এই নামত্রয় উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক শ্রীকৃষ্ণেরই নামত্রয় উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য নাম বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বে বিশেষ করিয়া এই তিন নামেরই উল্লেখ হইল কেন? অতএব অবশ্যই এতদ্বিষয়ের কোন গূঢ় কারণ আছে। বস্তুতঃ গোবিন্দ, মধুসূদন ও বামন এই তিন নামই ব্রহ্ম-বিশেষণ, ইহার একমাত্র বিশেষ্য সেই পরমাত্মাই হন। যথা তৈত্তিরিয় শ্রুতিঃ।

ওঁ তৎসৎ ইতি মহাবাক্য বিবেকঃ।
সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি॥

আত্মা, জীব ও মনঃ এই তিনই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ও অপরিমিত। এস্থলে বামন বিশেষণে এক

অনন্ত বিশেষ্য, মধুসূদন বিশেষণে এক সত্য বিশেষ্য, গোবিন্দ বিশেষণে এক জ্ঞান বিশেষ্য উপলব্ধি করিতে হইবে। "গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা গোবিন্দ নামার্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি ভুবনত্রয়কে বুঝায়। গোবিন্দ ত্রিলোক-ব্যাপী; সুতরাং গোবিন্দ শব্দে সর্ব্ব ব্যাপক জ্ঞান-লক্ষ্য পদার্থ হইতেছে। কিন্তু সংশয় রজ্জুতে আবদ্ধবৎ জ্ঞান জীবহৃদয়ে আন্দোলায়মান হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তি দোদুল্যমান সংসারের নাটকরূপে তাঁহাকে অনুদর্শন করিয়া অপুনর্ভব ধর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

এই উপদেশার্থে "দোলায়াং দোল গোবিন্দ মিতি" বচন প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ প্রকৃত অধ্যাত্ম বোধ সকলের সাধ্য নহে; কিন্তু দোলস্থ গোবিন্দ সকলেরই দর্শন-সুলভ।

মধুসূদন বিশেষণে এক সত্যই বিশেষ্য হয়। যিনি অক্ষয় পুরুষ ও সকলের আদি, শ্রুতি শাস্ত্র তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যঃ সদাস্তীতি কেবলমিতি" প্রলয়ে সকলই যায়, কেবল একমাত্র সত্য থাকেন, সেই সত্যই পরমাত্মা "মধুসূদনের" এক বিশেষ্য। "মধুং সূদয়তীতি" এই ব্যুৎপত্তিতে লৌকিকে মধু নামে অসুরকে যিনি নষ্ট করিয়াছেন, তিনি মধুসূদন, এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। এ দিকে অধ্যাত্ম পক্ষে মধু নামে বিদ্যা বিশেষ। যিনি জীব-

রূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, যৎ প্রভাবে সম্ভূতির বিলয় হয়, সেই কার্য্য-ব্রহ্মকে মধুসূদন বলিয়া উক্ত করা যায়। যথা বাজসনেয়ং—

"অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতি মুপাসতে।
ততোভূয়ঃ ইব তে তমো উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অসূর্য্য-রূপ অন্ধতমঃ প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরমালোক প্রাপ্ত হয় না; পুনঃ পুনঃ জন্মমরণানুভব করে। এবং পুনঃ পুনঃ সম্ভূতি-তেই রত থাকে।

অধ্যাকৃত কায়-কর্ম্মাদির বীজাত্মিকা প্রকৃতির নাম সম্ভূতি, সুতরাং প্রকৃতি যুক্ত উপাসনাকে মধুর উপাসনা বলা যায়; ইহাই মধুবিদ্যা। যাঁহার দর্শনে ইহার শান্তি হয়, তিনিই সত্য। হৃদয় মঞ্চে তাঁহার অবস্থান; তিনি নিয়ত যোগামৃতে অভিষিক্ত হন, তাঁহাকেই মধুসূদন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সেই হেতু এখানে মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে মধুসূদন বলিয়া সুস্নিগ্ধ চন্দন বারি দ্বারা জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসীতে স্নান করাইয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছেন যে এই স্নান-যাত্রা দেখিয়া হৃদয় মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে অনুদর্শন করিলে অপুনর্ভব যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয়।

যিনি বামন তিনি অনন্ত-বাচক। অর্থাৎ বামন বিশেষণে একমাত্র অনন্ত বিশেষ্য হয়েন। যিনি সর্ব্ব প্রবেশক, ত্রি-লোক-ব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকেই বামন বলা যায়। যিনি

কালরূপী—ত্রিপাদ-বিক্রমণস্থলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিবিধা কালের গতি দেখাইয়াছেন, আর ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অর্থাৎ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ও পৃথিবী এতৎ লোকত্রয় যে কালরূপীর পদদ্বারা আক্রান্ত, শাস্ত্রে সেই বামন পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মপুরাণং।

"এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্মৃতো বিষ্ণুর্ব্বিষধাতুঃ প্রবেশনে॥"

বিষ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশন; যিনি সর্ব্বত্র প্রবেশ এবং যিনি স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক, তাঁহার নাম বিষ্ণু। বিষ্ণুপদে পরমাত্মা; সেই পরমাত্মা বামন; যে হেতু এই জগৎত্রয় বামন কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখা যায়। আত্মাই জগৎ-ব্যাপ্ত; এই নিমিত্ত বামনই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অনন্তবাচক হয়েন। কিঞ্চ

"বামনো ভূদবামনঃ।"
অবামন অর্থাৎ অনন্তস্বরূপ।

পরমাত্মা বামন হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সেই বামনকে আত্ম শরীরস্থ দর্শন করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এজন্য "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" এই বচন প্রয়োগ করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব কেবল জ্ঞান গম্য; এই নিমিত্ত ভাবনা দ্বারা রথাখ্য শরীরস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে হয়। তাহা সামান্য জীবে ঘটিতে পারে না; এই হেতু রথস্থ জগন্নাথ দর্শনের বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ বাহ্য চক্ষুদ্বারা

(আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়াতে) রথারূঢ় জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলে যোগীদিগের জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শনীয় পরমাত্মার দর্শন ক্রিয়ার অনুকরণ করা হইবে।

মানব শরীর যে রথস্বরূপ, তাহার প্রমাণার্থ কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লী, তৃতীয় শ্রুতি যথা—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুরিত্যাদি।

(মনুষ্য দিগের) এই শরীর রথ, আত্মাই এরথে রথী, বুদ্ধিই সারথি, মনই অশ্ব রজ্জু হয় ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার অশ্ব। ইহারা শরীররূপ রথাকর্ষণে কুশল। রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় রথের গতি। ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মা ভোক্তা পুরুষ। ইহাকে দর্শন করিলে মনীষিগণ মোক্ষপথে অধিগমন করেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেহরূপ পুরীতে অবস্থিত আত্মারূপ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না ; পুরাণে গূঢ়রূপে ইহাই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে পুরীশব্দে শরীর ব্যাখ্যা করা গিয়াছে ; এস্থলে বিশেষরূপে সেই শরীরকেই রথরূপে কল্পনা করিয়া পুনরুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি শরীররূপ রথই হয়, তবে সর্ব্বদাই দর্শনের ব্যবস্থা না করিয়া আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য কি ?

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস মিথুন রাশি, একারণ আষাঢ়কে মিথুন বলে। মানব-শরীর প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিথুন দ্বারা উৎপন্ন হয় ; সুতরাং আষাঢ় মাসের উল্লেখ দ্বারা সঙ্কেতে শরীররূপ রথের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে মানব জীব পিতৃ-দেহে জাত হইয়া পশ্চাৎ মাতৃগর্ব্ভে উৎপন্ন হয়। এতাবতা মিথুনক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন দেহে দ্বিতীয়বার সমুৎপন্ন আত্মাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহাই ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রার বিধি আছে।

জগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা মণ্ডপে অষ্টাহ গমন এবং তথা হইতে অষ্টাহানন্তর পুনরাবৃত্তি কেন হয়, তাহার মীমাংসা এই—

এই অষ্টাহ পদে অষ্টাঙ্গ যোগ। সাধক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষে গুণ্ডিচাখ্য অর্থাৎ পরমাণু-ভূত ব্রহ্মপথে অধিগমন করে। তাহাতেই জগন্নাথের রথ অষ্টাহ গুণ্ডিচা ভবনে থাকে। ইহা অধ্যাত্ম বিষয়ের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পুনরাবৃত্তির তাৎ-পর্য্য অতি উপাদেয়। এই শরীরাখ্য রথে ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মনঃ রজ্জু, বুদ্ধি সারথি, আত্মা রথী ; ঐ রথী বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্পিত শরীর রূপ রথারোহণে মোক্ষপথে গমন করিয়া কারণ বিশেষে পুনরায় সংসার-পথেও পুনরাবৃত্ত হইতে

পারে; ইহাই পরিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম তত্ত্ব সংযোগে নিষ্কাম যোগাভ্যাস করে, তাহার অষ্ট সংখ্যা যোগ পূর্ণ হইলেই অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম যোগাকৃষ্ট-চেতাঃ হইয়া সাধনা করে, সে ব্যক্তি ভোগার্থ স্বর্গস্থানে গমন-পূর্ব্বক অষ্ট বিভূতির অনুভব করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এই দৃষ্টান্তের জন্যই জগন্নাথ দেবের অষ্টাহে গমন ও পুনঃ প্রত্যাগমন পরিদর্শিত হইয়াছে।

পথিমধ্যে "খুদীমাসীর" ভবনে জগন্নাথ দেবের যে পৃথকান্ন ভোজনের বিধি আছে, তাহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই;—

অবিদ্যা প্রভব শরীরে জীব নানা বিষয় উপভোগ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে, তখন মহামায়াকেই মাতা বলিয়া জানে। মোক্ষ-দায়িনী বিদ্যাকে তদ্‌ভগিনীরূপে বোধ হয়। বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বভাবতঃ সহোদরা হন। জীবগণ যখন মোক্ষ-পথের পান্থ হইয়া যোগ-পদবী অবলম্বন করে, তখন সহজেই আহারের সঙ্কোচ করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ বিশেষ ভোগ থাকে না। পরে যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্র গমনকালে অবিদ্যার ভগিনী স্বরূপা "পরা বিদ্যা" সাধকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সহস্রার-গলিত রসমিশ্রিত সহস্রামৃতরূপ পায়স ভোজন করান, তাহাতেই জীবের অমরণ-ধর্ম্ম লাভ হয়। সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ

জগন্নাথ দেব পথপর্য্যটনে অষ্টাহ মধ্যে খুদী মাসীর ভবনে পৃথকান্ন রস ভোজন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্ষেত্রমধ্যে মহামায়া বিমলা দেবীর নিকট ভোজন-পারিপাট্যের সীমা নাই; কিন্তু রথারূঢ় হইয়া পথগমনকালে শুদ্ধ চিপীটক মাত্র ভোগ্য হইয়া থাকে। গুণ্ডিচালয়ের যে পরম সুখকর ভোগ, তাহা নিবৃত্তি-মার্গ-গামীরাই পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ যাহারা তথায় থাকে, তাহারাই পায়। যাহারা প্রবৃত্তি-মার্গে সংসারাভিমুখে অভিগমন করে, তাহারা পায় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষ-সুখভোগ মুমুক্ষুরই হইয়া থাকে, সংসার-রাগীর সে সুখলাভ হয় না।

পঞ্চকোষ-বিবেক-তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে যে সংবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এখানে হোরা পঞ্চমীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, তাহার পর আর অধিকার নাই। অনন্তর জীবের আর কোন ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ থাকে না। ইহাই পঞ্চমীপর্ব্বে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। ঐ ব্রতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথকে আনিবার নিমিত্ত লক্ষ্মীদেবী পুরুষোত্তমে যত্ন করিয়া বেড়ান; যৎকালে তাঁহাকে উত্তরগামী দেখেন, তখন কমলা দেবী বিমলার দ্বারে অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা মাগিয়া থাকেন; অর্থাৎ আমার আর কিছুই নাই, যাঁহার সত্ত্বায় এই ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এতা-

বতা এই তত্ত্বোপদেশ হইতেছে যে, মোক্ষাভিলাষীর ঐশ্ব র্য্যের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে প্রকারান্তরে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদানই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রথ যাত্রাদির তাৎপর্য্য। এই অভিপ্রায়েই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি একবাক্য হইয়া ইহাকে এরূপ মান্য করিবেন কেন? এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, জগন্নাথ ক্ষেত্রের পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষ দাতৃত্ব বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুদর্শন ও সুভদ্রা, ইতি চতুষ্টয় প্রণবমাত্রা, আকার, উকার, মকার ও নাদ; ইহাতে কোন অনৈক্য নাই; সুতরাং প্রণব স্বরূপ পর ব্রহ্মের মূর্ত্তি জগন্নাথকে সমুদ্র তীরে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি প্রণবরূপী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া জগল্লোকে কৃতার্থ হইতেছে। অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন করাই ভব সমুদ্রের উপায়, প্রণবই শেষ মূর্ত্তি, সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুই পরিণামে প্রণবে লয় পায়, কিন্তু প্রণব পর্য্যন্তই বিজ্ঞান বিষয় হয়। যথা মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

"অত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্ত ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ, এ সমস্তই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা-প্রভব; ইত্যর্থে শ্রুতি শিরঃ প্রণব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি কল্পিতা

হয় ; পরা বিদ্যা অনির্দ্দেশ্যা, যদ্দারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং প্রণবাবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থে শেষ উপাসনা, সেই প্রণবই সগুণ ব্রহ্ম, তদুপাসনায় চীর্ণব্রত ব্যক্তি নিগু র্ণতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়। যথা মাণ্ডুক্য শ্রুতিঃ।

"জাগরিতাবস্থা বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা।
সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।"

জাগরিতাবস্থায় বৈশ্বানরাখ্য অনিরুদ্ধ অহংকার স্বরূপ অকার প্রণবের প্রথমা মাত্রা, যদ্দারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। যিনি সর্ব্বাভিলাষ পূরণের আদি, যদবলম্বনে সকল কর্ম্মে জীব প্রবৃত্ত হয়, যিনি এরূপ জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞসপ্তাঙ্গএকোনবিংশতি মুখ।
স্থূলভূক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১॥

জাগরিত স্থান বহিঃ প্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বীয় আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে বুদ্ধির অভিনিবেশ, যাহাতে অবিদ্যাকৃত বিষয়ে বুদ্ধির আপ্রভাস ; সুতরাং তাহাকে বৈশ্বানর উক্ত করা যায় ; যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্দৃষ্টি পৃথক্ পৃথক্ পথে পতিত হয়। প্রণবের প্রথম পাদ সেই আকার, আত্মব্যূহ প্রথমা মাত্রা, অগ্নি মস্তক জিহ্বা আহবনীয় গার্হপত্যাদক্ষিণাগ্নি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বানর ; এতকারণ অকারকে সপ্তাঙ্গ কহেন, এবং একোনবিংশতি মুখ, যথা—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, এই ঊনবিংশতি

মুখ, ইহাতে স্থুল দেহস্থ শব্দাদি বিষয় পরিগ্রহ হয়, সুতরাং অকার প্রথমঃ পাদঃ। ইহাতে ভদ্রা দেবীই অকার স্বরূপা, স্থুল দেহাদির বিষয়েন্দ্রিয়-বোধ-স্বরূপা; ইহার সপ্তাঙ্গ যথা— হস্ত পদাদি শূন্য কেবল মুখ, নাসিকাদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় এই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট, সংপ্রতি সুখ স্বরূপ ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিয়ন্ত্রী, তন্নিমিত্ত সুভদ্রার সহযোগে জাগরিতাবস্থায় জগন্নাথ মূর্ত্তি লোকের দর্শন-যোগ্য হইয়াছেন।

" স্বপ্নাবস্থায়াং মন তৈজস উকার দ্বিতীয়া মাত্রা
জ্ঞানসন্ততিং সমানাশ্চ ভবতি।"

স্বপ্নাবস্থায় মন উকার বর্ণ তেজঃস্বরূপ দ্বিতীয়া মাত্রা, জ্ঞান সংকুলাতিশয় সংকীর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট স্থুল দৃষ্টির অভাব হেতু অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্ট।

স্বপ্নস্থান তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাহ্যভয়ত্ব।
ষোৎকর্ষতি বৈবজ্ঞান সন্ততিং সমানাশ্চ ভবতি
নাস্যা ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি ব্রহ্ম য এবম্বেদ ॥

স্বপ্নাবস্থায় মন তৈজস অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ উকার মূর্ত্তি দ্বিতীয়া মাত্রা, অন্তর্দৃষ্টি, তাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য নাই, সুতরাং বাহ্য বিষয় অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মই অন্তরে সম্পাদিত হয়, আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান হেতু শ্বাস প্রশ্বাসাদির পরিগ্রহণ আছে, গার্হপত্য অগ্নির সম্বন্ধ রহিত, কিন্তু আকারে তাহা আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি সকল অন্তরে কার্য্য করে, বাহ্যে প্রকাশ নাই; অগ্নি সপ্তাঙ্গ ও উনবিংশতি

মুখ বাহিরে নাই ; অন্তরে উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থিত, বাহ্যে ভোগ বিলাসাদির অভাব, অন্তরে বাসনা মাত্র, এই প্রবিভক্ত বাহ্য ভোগ্য বস্তুর রসবোধক বলিয়া ভোক্তা বলা যায় ; বিষয় বোধ শূন্য কেবল প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ মন আছে এই মাত্র উপলব্ধি জন্য বৈষয়িত্বে কল্পিত হন। ইহাতে উকার-রূপী সুদর্শন শ্রীক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন। ইনি তৈজস, যেহেতু সূর্য্যরূপে সুদর্শনের বর্ণনা নানা শাস্ত্রে আছে ; সুদর্শন যে মনোরূপ, তাহা ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুরূপ বর্ণনে কহিয়াছেন।

"চলস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং সুদর্শন মিতি।"

অত্যন্ত বেগবান্ মনোরূপ সুদর্শন চক্র হয়।

অতএব শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সুদর্শন মূর্ত্তি দারুভূত আছেন এইমাত্র ; তাঁহার মূর্ত্তি অপ্রকাশ শুদ্ধ লগুড়বৎ সংস্থিত, মনঃসংযোগ ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয় না। একারণ উকারাখ্য তৈজস মনোদ্বারা শোভন মূর্ত্তির দর্শন হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সুখে দর্শন হয়, তাহার নাম সুদর্শন।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। তৎ সুষুপ্তং সুষুপ্ত স্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার তৃতীয়া মাত্রা॥

সুষুপ্তাবস্থা তাহাকে বলি, যাহাতে কোন অভিলাষের অবস্থান নাই এবং কোন স্বপ্নাদিও দর্শন হয় না। সুষুপ্ত স্থান অতি সুখদ কেবল বুদ্ধির স্থিরতা মাত্র, মকাররূপ তৃতীয়া মাত্রা হয়।

সুষুপ্ত স্থান একীভূত প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দ ময়োহ্যা।
নন্দভুক্চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞ স্তৃতীয়পাদঃ॥

সুষুপ্ত স্থান মকার তৃতীয়া মাত্রা, যে হেতু প্রণবের সমাপ্তি মাত্রা, তাহাতে সন্ধিযোগে আত্মাতে সমস্ত একীভূত হয়, অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয় সন্ধিযোগে লয় প্রাপ্ত হইয়া এক বর্ণ মাত্র দৃষ্ট হয়। তাহাতে ভাব্য ভাবনার অভাবে আনন্দ মাত্রোদয় হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু মাত্র স্মরণ থাকে না। কেবল সুখ স্বরূপ চিত্ত মাত্র, তাহাতে আনন্দ মাত্রই ভোগ করা হয়, সুতরাং জীবাত্মাও পরমাত্মার একীভূত অবস্থার নাম প্রণব, অর্থাৎ (ওঁ) তাহার উচ্চারণে যে যে পরমাত্মাতে একীভূত হওয়া যায়, তাহাতেই সুষুপ্তাবস্থা বলে। তদবস্থায় নিয়তমনোরমণ করিতে থাকে, এজন্য তাঁহার নাম রামঃ। এবিষয়ে বলরামকেই মকাররূপী সুষুপ্তাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল আনন্দময় মূর্ত্তি, শুদ্ধ আনন্দ মাত্র ভোক্তা, তদ্দর্শনে আনন্দাপ্লুতচিত্তে প্রথমে মনুষ্যমাত্র আত্মবিস্মৃত হয়। যাহারা জগন্নাথ ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্নচেতাঃ হন, অর্থাৎ তৎকালে আর আত্মগৃহ, ধন জনাদি কিছু মাত্রকে স্মরণ বা মনে থাকে না, সে কেবল সেই মকারাত্মক শ্রীবলরামের মহিমা।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ
শিবোঽদ্বৈত। এব মোঙ্কার আত্মৈব সং বিশত্যাত্মনা।
আত্মানং য এবং বেদ ॥

তুরীয়াবস্থা অমাত্রা অব্যবহার্য্যা, যাহাতে সমস্ত মায়া

কার্য্যের উপশম, সেই মঙ্গল স্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ধ্বন্যাত্মক প্রণবস্বরূপ আত্মা, আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যে এরূপ জানে সেই বেদবিৎ। এই অমাত্র তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ, তাঁহাতে কোন মায়ার কার্য্য নাই, তিনি অজিত, অমৃত, পরম মঙ্গলরূপ অদ্বিতীয়, সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থাণুবৎ রহিয়াছেন, এই জন্য প্রণবাকারে জগন্নাথের স্বরূপ রূপ দারুভূত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব আত্মাতে অনুদর্শন করিলে জীবের অমরণ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি থাকে না।

নবম অধ্যায়।

তান্ত্রিক উপাসনার মর্ম্ম

মানব জাতির প্রকৃতিগত স্বতঃসিদ্ধ বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অস্মদ্দেশে অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থিত ও প্রচলিত আছে। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও

সমাধি এই পঞ্চবিধ যোগাঙ্গ দ্বারা, বৈষ্ণবগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ সাধনা দ্বারা, এবং শক্তি উপাসকগণ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চবিধ উপাসনা দ্বারা আপনাপন ইষ্ট দেবতার আরাধনা ও স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বেদে অষ্টাঙ্গ যোগ, পুরাণে শান্তাদি ভাব, এবং তন্ত্রে মদ্যাদি পঞ্চ তত্ত্বকে পরমার্থ লাভের একমাত্র উপায় রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাৎ তত্তন্মতে ঐ ঐ উপায় অবলম্বন না করিলে ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দেশে এই ভিন্ন ভিন্ন পান্থগণ আপনাদিগকে এক মতাবলম্বী জ্ঞান না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিপরীতাচারী বোধ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, সে ব্যক্তি শক্তি দেবতার নাম গ্রহণেও পরাঙ্মুখ, এবং যে ব্যক্তি শাক্ত, সে বৈষ্ণবগণকে বিধর্ম্মী বোধে মনে মনে ঘৃণা ও তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিলে কেহই কাহারও বিপক্ষ বা বিধর্ম্মাচারী নহেন। প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা সাধক ব্যক্তি যাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন, শান্তাদি পঞ্চভাবে বিষ্ণুভক্তগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং মদ্যাদি-সাধক ব্যক্তিও তাঁহাকেই লাভ করা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। কেবল পরস্পরে অজ্ঞানান্ধতা প্রযুক্ত যথার্থ মর্ম্ম স্থির করিতে না পারিয়া অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা ও দ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়েন। আহা! একথা কেহই অনুধাবন

করেন না যে, যাহাকে " প্রাণায়াম " যোগ বলে, তাহাকেই " শান্তভাব " এবং পুনর্ব্বার তাহাকেই " মদ্য সাধন " বলা যায়। যাহাকে বেদ মাগে " সমাধি " কহে, তাহাকেই পুরাণে "মধুরভাব" এবং তাহাকেই তন্ত্রে "মৈথুন যোগ" বলিয়া উক্তি করেন। কেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত লোকে জগদীশ্বরের রূপক বর্ণনা বিষয়ক কৌশল বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্যগত ঐক্য সম্পাদন করিতে অপারগ হওয়াতেই বিষম বিশৃঙ্খলা অনুভব করেন। ফলতঃ কোন উপাসনাই পরস্পর বিরোধী নহে। সকলেরই সম্যকরূপে মিলন ও ঐক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

" ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদপদং পথ্যমিতিচ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল-নানা-পথজুষাং,
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসিপয়সা মর্ণব ইব॥ "

মহিম্ন স্তোত্রম্।

হে শিব! তুমি ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয়াবলম্বিগণের ও সাংখ্যযোগাবলম্বিগণের এবং পশুপত মতধারিগণের ও বৈষ্ণব-গণের উপাস্য দেবতা স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন পান্থগণের তুমিই পরম পদ ও পন্থা। কেবল রুচির বৈচিত্রতা প্রযুক্ত কেহ ঋজু ও কেহ কুটিল ইত্যাদি বিবিধ পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। ফলতঃ যেমন নানা নদ নদীর জল নানা দিক্ হইতে ঋজু ও বক্রভাবে বাহিত হইয়া অবশেষে একমাত্র সমুদ্রে

পতিত হয়, তদ্রূপ যে, যে ভাবে ও যে পন্থানুসারে তোমার উপাসনা করুক, অবশেষে সে সকলেরই তোমাতে সমাধান হইয়া থাকে।

এক্ষণে তন্ত্রমতের উপাসনা সম্বন্ধীয় প্রকৃত প্রস্তাবের বিবরণ করা যাইতেছে। তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান উপচার পঞ্চ মকার। যথা,—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। ইহাদের অভাব হইলে পূজা বা উপাসনা আদৌ সিদ্ধি হইতে পারে না।

"পঞ্চ তত্বং বিনা দেবি নার্চ্চয়েৎ জগদাম্বিকাং।"

পঞ্চতত্ত্বরূপ যে পঞ্চ মকার তদভাবে জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে না। কিন্তু ইদানীন্তন ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ যুবকদল এই পঞ্চ মকারের কথা শ্রবণ করিলেই মনে মনে ঘৃণার উদয় করেন এবং তান্ত্রিক উপাসকগণকে কদাচারী ও অসৎ-কর্ম্মাবলম্বী বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সহজেই সংশয় উপস্থিত হয় যে, শুণ্ডিকালয়ের অন্ন-বিকারাত্মক মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য ও মাংসাদি এবং স্ত্রী সহযোগাদি কর্ম্ম কখনই চিত্ত শুদ্ধির বা ঈশ্বর সাধনার উপকরণ হইতে পারে না, বরং তাহা সেবনে মনের ও দেহের গ্লানি, লোকনিন্দা ও অধর্ম্মোৎ-পাদন হইয়া থাকে। মদ্যাদি সেবনকে শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ পাপ জনক কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছাগাদি হনন ও তন্মাংস ভক্ষণ এবং পরস্ত্রী আলিঙ্গন করিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা দূরে থাকুক বরং পুঞ্জ পুঞ্জ অধর্ম্ম সঞ্চয় হইতে থাকে।

সুতরাং এতাদৃশ পাপজনক কার্য্য সকল কি প্রকারে ইষ্ট দেবতার সাধনা ও উপাসনার অঙ্গ হইতে পারে? এতাদৃশ কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের সন্তোষোৎপত্তি না হইয়া বরং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন রূপ পাপোৎপত্তি হয় এবং তাহা হইলেই কর্ম্মী ব্যক্তি ঘোরতর দুর্ভেদ্য নরকাগ্নিতে পতিত ও দগ্ধীভূত হইতে থাকে। ফলতঃ তান্ত্রিক উপাসকগণ একালে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সহসা কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের দ্বারা যে কোন কুকর্ম্মই বাধে না, অর্থাৎ তাঁহারা সকলই করিতে পারেন, অনেকের মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে। পঞ্চ মকার যে কি পদার্থ এবং তাহার ব্যবহারই বা কি প্রকারে ও কি কারণে করিতে হয়, ইষ্ট আরাধনার সহিত তাহার সংশ্রবই বা কি, তাহা যদি বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন তাহা হইলে ঐ পরম তত্ত্বের উপর আর কাহারই অশ্রদ্ধা থাকে না; প্রত্যুত অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া ঐ পঞ্চ মকারের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের মনের ভ্রম নিরাকরণ জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত পঞ্চ মকারের মর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে।

অনাচারীর সিদ্ধি কোন কালেই নাই; কি তন্ত্র, কি বেদ, কি স্মৃতি কোন শাস্ত্রই কদাচার করিতে উপদেশ দেন নাই; আচার-হীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সফল হয় না। বেদাভিপ্রায়কে খণ্ডন করিয়া তন্ত্রাভিপ্রায় প্রকাশ পায় নাই;

বেদেও যেরূপ সাধনার উপদেশ আছে, তন্ত্রেও প্রকারান্তরে বা ভাষান্তরে সেইরূপ সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। লোকে কেবল অনভিজ্ঞতা দোষেই অত্যাচার করিতে থাকে। ঈশ্বরোপাসক ব্যক্তি কি কখন অনাচার-শীল হয়? তন্ত্র শাস্ত্রে ভগবান্ ভূতনাথ রূপক-ব্যাজে উপাসনা ঘটিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মেধাবী সাধক তন্মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কামাচার-শীল যথেষ্টাচারী ব্যক্তিরাই যথেষ্টাচার করিবার নিমিত্ত তন্ত্র-বাক্যের অর্থান্তরকে সোপান-ভূত করিয়া লইয়াছে। ফলে তাহারা ঐ পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থ পরিগ্রহ করে নাই। যে যে তন্ত্রে পঞ্চ মকারের বিধি আছে, সেই তন্ত্রেই তাহার প্রকৃত অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,

মদ্য সাধক।

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ॥"

আগম-সারং।

(পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন) হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত যে অমৃত ধারা, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, তাহাকেই মদ্য সাধক বলা যায়।

মাংস সাধক।

"মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ॥"

হে দেবি রসনপ্রিয়ে! (পার্ব্বতি) রসনার নাম মা;

তদংশ বাক্য ; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাক্য সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগী, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়।

কোন ব্যক্তি ছাগ-মেষাদি-মাংস নিবেদন ও ভক্ষণ-পূর্ব্বক জগদীশ্বরীর আরাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, তন্ত্র শাস্ত্রের কদাচ এরূপ অভিপ্রায় নহে।

মৎস্য সাধক।

"গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষযেদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুই মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, সেই মৎস্যকে যে ব্যক্তি আহার করে তাহার নাম মৎস্য-সাধক। স্পষ্টার্থ এই যে, এ স্থলে গঙ্গা শব্দে ইড়ানাড়ী, যমুনা শব্দে পিঙ্গলা ; এই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর-মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ত গতায়াত করিতেছে তাহারাই মৎস্যদ্বয় ; সেই মৎস্যদ্বয়ের ভক্ষক যোগী অর্থাৎ যে প্রাণায়ামসাধক শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছেন তাঁহাকেই মৎস্য সাধক বলে। নতুবা সামান্য জলচর মৎস্যাদিভক্ষণপটু ব্যক্তিকে আমিষ-আহারী ব্যতীত মৎস্য সাধক বলা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

মুদ্রা সাধক।

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রা-সাধক উচ্যতে॥"

হে দেবেশি! শিরসিস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ আত্মার অবস্থিতি। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হয়েন। তিনি অতিশয় কমনীয় এবং মহা কুণ্ডলিনী-শক্তি-সংযুক্ত; যাহার সেই পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম মুদ্রা সাধক।

মৈথুন সাধক।

এই মৈথুনতত্ত্বের অর্থ বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে। প্রথমতঃ বায়ুরূপ লিঙ্গ, শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ অর্থাৎ পূরণ করিয়া যে রমণ করা যায়, অর্থাৎ কুম্ভকরূপ যোগ করা যায়, ঐ যোগপরায়ণ ব্যক্তিকে মৈথুন-সাধক বলিয়া যোগশাস্ত্রে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রে উক্তি আছে যে,

"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি র্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাস-কুণ্ড-মধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারশ্চ বিন্দুরূপ-মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য একতাচ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥

আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারাম স্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং॥
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি॥"

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণস্বরূপ মৈথুন পরমতত্ত্ব। মৈথুনে সিদ্ধ ব্যক্তির সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আনন্দ উদয় হয়। রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে; মকার বিন্দুরূপ মহা যোনিতে স্থিত। হে প্রিয়ে! আকাররূপ হংসকে আরোহণ করিয়া যখন ঐ উভয়ের (র ও ম এই অক্ষর দ্বয়ের) একতা হয় তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। ঐ পদার্থ (অর্থাৎ রাম এই শব্দের বিষয়ীভূত পরমাত্মা) আত্মাতে রমণ করেন, এই জন্য তাঁহাকে আত্মারাম বলে। অতএব "রাম" এই নাম নিশ্চয়ই তারকব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে "রাম" এই অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ শব্দ স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক (অর্থাৎ পাপ পুণ্যাদি সকল কার্য্যের ফলভোগরহিত হইয়া ব্রহ্মময় হয়। তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এই মৈথুন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরম তত্ত্ব, ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বরূপ, সর্ব্ব পূজাময়

এবং জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ দ্বারা পূজা করিলে সকল মন্ত্রই প্রসন্ন হয়।

এস্থলে প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করুন যে, আপাততঃ একান্ত অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান মৈথুন শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রে কেমন গূঢ় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যেমন পুংজাতির কোষ মধ্যে সন্তানোৎপাদক ডিম্বাকৃতি পদার্থ থাকে, এস্থলে সেইরূপ কুণ্ডবিশেষ অর্থাৎ "ব" এই অক্ষরের মধ্যে "ব=র" এই বর্ণ অবস্থিত। যেমন স্ত্রীজাতির উদরমধ্যস্থ কোষ বিশেষে সন্তান জীবের পুষ্টিসাধক ডিম্ব পদার্থ বিশেষ অবস্থিত, সেইরূপ বিন্দু অর্থাৎ (০) অনুস্বররূপ মহাযোনিতে "ম" এই অক্ষররূপ ডিম্ব বিশেষ অবস্থিত। যেমন পুংজাতির ডিম্ব পদার্থ পুংযন্ত্র বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রীযন্ত্র বিশেষ গামী না হইলে, পারিভাষিক মৈথুন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ " র " এই বর্ণ " আ " সাহায্যে পরিচালিত হইয়া "ম" এই বর্ণে মিলিত না হইলে, রাম নাম উচ্চারণরূপ তন্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক মৈথুন সিদ্ধ হয় না।

মৈথুনের ষড়ঙ্গ।

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্য মনুলেপনং॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণাং।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥

মৈথুন ক্রিয়াতে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীতকার, অনুলেপন, রমণ ও রেতো বিবর্জ্জন এই যে ছয় অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে মৈথুন যোগে তত্ত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীতকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম বীর্য্যপাতন। হে প্রিয়ে (পার্ব্বতি) তুমি সর্ব্বদা আমার এই প্রাণাধিক প্রিয়তত্ত্ব গোপন করিবে।

এই ষড়ঙ্গ যোগে মৈথুন ষড়ঙ্গ সাধন করিলে মৈথুন-সাধক বলে। নতুবা যুবতী-কলেবরালিঙ্গনকে ন্যাস, যুবতীমুখ চুম্বনকে ধ্যান, কামিনী-স্পর্শ শীতকারকে আবাহন, যোষিৎ-অঙ্গ-বিলেপনকে নৈবেদ্য ও রমণী রমণকে জপ এবং রেতো-বিসর্জ্জনকে দক্ষিণা বলিয়া অসদাচার করিতে শাস্ত্রে উপদেশ নাই। এই পঞ্চ মকার দ্বারা কলিকালের মনুষ্যেরা সাধনা করিতে পটু নহে। একারণ কলিকালে পঞ্চ মকার সাধনা বিষয়ে শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। নতুবা শৌণ্ডিকালয়ের মদ্যপান ও কিঞ্চিৎ মুদ্রা ব্যয় দ্বারা মৎস্য মাংসাদি আহার করিয়া পরম-সুন্দরী-রমণী-মৈথুন-রূপ-সাধন করা কঠিন কি? অতএব তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে শাস্ত্রে মদ্যাদির যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুযায়ী সাধন অতি কঠিন ব্যাপার, তজ্জন্যই তাহা কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দিব্য ও বীর ভাবেই এই পঞ্চ মকার সাধনা হয়, কিন্তু কলিযুগে সাধকের ক্ষীণতা প্রযুক্ত তন্ত্র শাস্ত্রে কেবল পশু-ভাব সাধনাকেই প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

" মৎস্যং মাংসং তথা মুদ্রাং মদ্যং মৈথুন মেবচ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুঃ কলিকালে নচেষ্টদং॥ "

কালীবিলাসং।

মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন এই পাঁচটীকে পঞ্চ মকার কহা যায়। ইহা কলিকালে ইষ্টদ নহে। অর্থাৎ এই কালে মনুষ্যের চিত্ত স্থির নহে, একারণ এ সাধনায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

" দিব্য-বীরমতং দেবি কলিকালে নচেষ্টদং।
কলৌ পশুমতং শাস্ত্রমতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ "

হে দেবি! দিব্য মত ও বীরমত কলিকালে সাধকের ইষ্টদ নহে। অতএব কলিযুগে সাধনার পক্ষে কেবল পশু মতই প্রশস্ত হয়। একালে পশু-মত সাধনাতেই সকল সিদ্ধি লাভ হইবে।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকার উপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য এই। এ কালের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা অতি অসঙ্গত। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বেদান্তী বলিয়া জানান, অথচ অসদাচরণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখেন অথবা মদ্য, মাংস ভক্ষণ পরায়ণ, পরস্ত্রী-লোলুপ ব্যক্তিরা যদি তান্ত্রিক বলিয়া জানায় তবে তন্নিমিত্ত বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি কোন দোষ স্পর্শ হইতে পারে না।

এস্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি

মদ্য, মাংস বা মৈথুন ইত্যাদি শব্দে এরূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ বুঝাইল, তবে যে তন্ত্র শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য, তাহাতে এরূপ জটিলার্থ শব্দ প্রয়োগে তাৎপর্য্য কি? ইহাতে অনেক লোক অবাস্তবিক অর্থ অনুসারে চলিয়া উচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তিগত বৈলক্ষণ্যই ইহার কারণ। যে সকল ব্যক্তির এরূপ জঘন্য প্রকৃতি যে, তাহারা কোন মতেই ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম প্রসঙ্গ করিতে চাহেন না, তাহাদিগের নিমিত্ত একবারে কঠোর শাসনাত্মক ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিলে, তাহারা তাহা স্পর্শও করিবেন না; কিন্তু যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে, তাদৃশ ব্যক্তির আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিকৃষ্ট কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, তবে তাহারা ক্রমশঃ মনের পবিত্রতা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা উন্নতি সোপানে উত্থিত হইয়া পরিণামে পরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী অবলম্বন ও যুক্তিপথের অনুসন্ধান করিবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে ঐরূপ জটিলার্থ শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আদৌ মানসিক গুণানুসারে লোকের সদসৎপ্রবৃত্তি জন্মে। যে বিষয়ে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত করা অতি কঠিন এবং করিলেও তাহা বিফল হয়। অনিচ্ছায় কোন কর্ম্মেই কাহারও মন নিবিষ্ট হয় না এবং উৎসাহও জন্মে না। সত্ত্ব গুণাবলম্বীদিগকে বৈরাগ্যোপদেশ

দান করিলে তাহারা সম্পূর্ণ যত্ন সহকারে তাহা গ্রহণ করে। রজোগুণাধিক পুরুষকে রাজস কর্ম্মের উপদেশ দিলে সে তাহাতে সম্মত হয়। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা তামস কর্ম্মের উপদেশ গ্রহণে যেরূপ যত্নবান হয়, সাত্ত্বিকোপদেশ প্রদান করিলে তাহারা তাহা কখনই সেইরূপে গ্রহণ করে না। তাহারা তামসকর্ম্মা; মদ্যমাংসভোজনেই নিয়ত হর্ষের আহরণ করিয়া থাকে। সুতরাং তামসী উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়; নতুবা সাত্ত্বিকী উপাসনায় আনিতে চাহিলেই তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠে। একারণ মহাকারুণিক শিব দেবতা তামসদিগকে ভগবদ্‌ভজনার পথে আনিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অবস্থানুরূপ উপাসনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থকে গোপন করিয়া দ্ব্যর্থ বা কূটার্থ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রকারান্তরে বাহ্য পঞ্চ মকার সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন না, যাহারা নিয়ত মদ্যপান ও অবৈধ মাংসাদি ভোজন এবং পরস্ত্রী ভজনেই রত থাকে, তাহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ শ্রুতিপথে স্থান দান করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের উদ্ধারার্থ ঐ ব্যবহারের সহিত পরমার্থোপদেশের জন্য বীরাচার মতের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এই আচারকে গৌণকল্পে মুক্তির পথ বলিতে হইবে; নতুবা তামসিক ব্যক্তিগণ এককালেই নাস্তিক হইয়া যায়। যে রোগী ব্যক্তির সর্ব্বদা মিষ্টরসযুক্ত সামগ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি, সেই রোগী অবশ্যই

কটু তিক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত ঔষধ মাত্রই সেবন করিতে চাহে না; অতএব তাদৃশস্থলে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য যেমন রোগবর্দ্ধক মিষ্টান্ন মধ্যেও দিব্যৌষধি মিশ্রিত করিয়া আহার করাইয়া তাহাকে রোগ হইতে পরিমুক্ত করেন, তদ্রূপ তামসিক ব্যক্তি-গণের সত্ত্বগুণ বিরোধী মদ্য মাংস ও স্ত্রী সেবনাদি অনিষ্টোৎ-পাদক কর্ম্মের মধ্যে ভগবদারাধনারূপ ঔষধ মিশ্রিত থাকাতে ভবরোগের শান্তি হইতে পারিবে। যাহারা কোন উপাসনা করে না, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশ উত্তম কল্প বলিতে হয়। কেন না (অকরণাৎ মন্দকরণং শ্রেয়ঃ) না করার অপেক্ষা এরূপ উপাসনা করাও শ্রেয়স্কর। কালে ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুচিন্তন-বলে ক্রমে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান করি-বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে—ইহাই পঞ্চ মকারের নিগূঢ় মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য।

মদ্যপানাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম বটে, তথাপি তন্মধ্যে মদ্যের একটী গুণ এই যে, লোকে পূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়া মদ্যপান করে, পানানন্তর মত্ততা জন্মিলেও পূর্ব্ব-চিন্তিত সেই বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মদ্যপায়ী সাধক-দিগের কিঞ্চিৎকাল ভগবানের প্রতি তামসী নিষ্ঠা উপস্থিত হয়। সেই নিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া যদি সে ব্যক্তি কোন নারীকে স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী জ্ঞানে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার জন্য, তাঁহাকে সুরাপান করাইয়া প্রসাদ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ আপনি পান করে এবং আত্ম-সুখার্থ

কামার্থী না হইয়া রতিক্রীড়া করে, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা দেবী রতিপ্রিয়া এই তামসিক বোধে তৎতৃপ্ত্যর্থ শৃঙ্গারাদি করে, তবে ঐ সকল কর্ম্মে ঈশ্বরানুচিন্তন দ্বারা তাহাদিগের ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব ও কালে ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ তাদৃশ লোকের পক্ষে ঈশ্বর ভজনা না করার অপেক্ষা এইরূপে উপাসনা করাও শ্রেয়ঃ হয়।

যাহারা কামুক পুরুষ, নিজ সুখার্থ মদ্যাদি পান, মৎস্য মাংসাহার, এবং পরস্ত্রী সম্ভোগাদি করে, তাহাদিগের শাস্ত্র-সিদ্ধ অপকৃষ্ট গতিই হইয়া থাকে এবং ইহলোকে মাতাল ও লম্পট পুরুষদিগের যেরূপ সম্মান, লোক সমাজে তাহা-দিগেরও সেইরূপ সম্মান লাভ হয়। অনাদি-নিধন ভূতেশ্বর মহাদেব বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতীত অশিষ্ট-সম্মত উপদেশ কোন তন্ত্রেই দান করেন নাই। তবে অনেকানেক লোকে অনেক প্রকার তন্ত্র রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া শাসন দিলে অবহুজ্ঞ মুর্খ লোকেরা যাদৃশ বিশ্বাস করে, মানব-বচনে তাদৃশ বিশ্বাস কখনই করে না। এই জন্য অনেকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া অনেক তন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলিতার্থ, সে সকল শাস্ত্রও ঈশ্বরোপাসনা-প্রবৃত্তি-জনক। সুতরাং তাহা মনুষ্য-কৃত হইলেও নিন্দনীয় নহে।

যাহারা পঞ্চ মকারের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া

বাহ্যে ঐ সকল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধি-বিক্রিয়ার এবং ব্যবহারাদির উপর কেবল কদর্য্য কার্য্যের জন্য নিতান্ত নির্ভর। সেই সকল অনার্য্যশীল ব্যক্তিরা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত আপন আপন অভীষ্ট দেবতার তুষ্টি-জনক হয় বলিয়া যথেচ্ছাচারীর ন্যায় পারিভাষিক মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনাদিতে মহা আমোদ করিয়া থাকে। তাহাতে মুক্তিপদ লাভ দূরে থাকুক, বরং তাদৃশ ব্যক্তিকে দেহাবসানে মহানরক-জ্বালাতেই আপতিত হইতে হইবে।

একান্ত নিকৃষ্ট পথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তন্ত্র শাস্ত্রে নিম্ন লিখিত রূপ নিকৃষ্ট গতি লাভের শাসনবাক্য রহিয়াছে।

কলৌ প্রিয়ে মহেশানি রাজসাস্তামসাস্তথা।
নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্তঃ পরান্ বহূন্।
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি।
বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম মবিচার্য্যার্পয়ন্তি তে।
ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥

(তন্ত্রম্)

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন, হে মহেশানি! কলিযুগে মানবমাত্র প্রায় রজোগুণ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট হইবে; ইহারা বেদ-শাস্ত্রাদি-উক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল যে নিষিদ্ধাচার-পরায়ণ হইবে, এমত নহে; অপর বহু লোক-কেও ভুলাইয়া ঐ মত গ্রহণ করাইবে। হে সুরেশ্বরি! তোমাকে ও আমাকে মদ্য, মাংস ও রক্ত প্রিয় বলিয়া ঐ সকল

কদর্য্য দ্রব্য নিবেদন করিবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচার না করিয়া সকল জাতি একত্র মিলিত হইয়া মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যাদি পান করিবে ; সেই সকল যথেষ্টাচারিগণ, ইহ জন্মকৃত ঐ নিষিদ্ধাচরণ করণ জন্য অন্তে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও ব্রহ্মরাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইবে।

ফলিতার্থ, বর্ত্তমান কালে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানিগণ লোক ভুলাইয়া দল-পুষ্টি করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ মতকে প্রসিদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। তদ্রূপ ঐ সকল ভ্রষ্ট লোকেরাও তন্ত্র মন্ত্র বলিয়া ঐ কদর্য্য মত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। প্রকৃত পঞ্চ মকারের অসাধ্যতা প্রযুক্ত বাহ্য পঞ্চ মকার গ্রহণ করিয়া সাধকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া আপন আপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ উপায় স্থির করিয়া লইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

দশ মহাবিদ্যার বিবরণ।

পরাৎপর পরমাত্মার সাধনোদ্দেশে যে সমস্ত স্থূল মূর্ত্তির কল্পনা করা যায়, তন্মধ্যে দশ মহাবিদ্যার মূর্ত্তি অতি প্রধানা। এই দশ মহাবিদ্যার সহিত দশাবতারের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; কেবল স্ত্রী পুরুষ উপাধি ভেদ মাত্র। এই স্ত্রী পুরুষ

উভয় সংজ্ঞাই সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে আরোপিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। ভ্রান্ত লোকে ভ্রান্তিবশতঃ সেই একমাত্র পদার্থে দ্বিধা কল্পনা করিয়া থাকে। পরম ব্রহ্মের বিশেষণে স্ত্রী আর পুরুষের পৃথক্ ভাবের সম্বন্ধ নাই। কারণ, সর্ব্বশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সর্ব্বরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং যোগতত্বে এই জগৎকে "হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ" বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। অতএব এই দশ মহাবিদ্যার সগুণ ও নির্গুণ ভাব ব্যক্ত করা যাইতেছে।

এতৎপ্রসঙ্গে দশটি রাত্রির বিবরণ ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ এই দশ মহাবিদ্যার এক একটি পৃথক পৃথক রাত্রি নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা হয়েন; তদ্রূপ, কালরাত্রি, দিব্যরাত্রি, তাররাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণরাত্রি, ক্রোধরাত্রি, বীররাত্রি ও ঘোররাত্রি, এই দশটী রাত্রি নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকল মহাবিদ্যার সাধন ভজনাদিরূপ যে কোন কার্য্য ঐ ঐ রাত্রিতে সমাধা হইয়া থাকে, তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রন্থ-বাহুল্য হইয়া পড়ে। ফলতঃ মহাবিদ্যার উপাসকগণ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ঐ দশরাত্রির বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণন করা হইল না।

দশ মহাবিদ্যার সহিত ভগবানের দশাবতারের অধ্যাত্ম কল্পে ও ব্রহ্মোপকরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। কে-

বল অজ্ঞান-বিকার প্রযুক্ত প্রকৃতিপুরুষ-উপাসকগণ নির্দ্বন্দ্ব ঐশ্বরিক ভাবের সংমিলনে অক্ষম হইয়া নানাবিধ কুতর্ক উপস্থিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পরমহংস মহাশয়ের ব্যাখ্যানুযায়ী এই দশ মহাবিদ্যা বিষয়ক স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

এই দশ মহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধানা; এতদ্ভিন্ন অষ্টাদশ মহাবিদ্যা এবং শত কোটি উপবিদ্যা আছেন। সে সকলের সম্যক্ বৃত্তান্ত কহিতে কাহারই সাধ্য নাই; ফলে ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্ম-স্বরূপা হয়েন। ইহাঁদিগের বেশ, ভূষা, ভুজ, পাদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়। ইহাঁরা এক এক দেবীরূপে বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তাহাকে অলৌকিক বোধ করিয়া কেহ কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচক্ষণ সুধীগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেননা, ঈশ্বরের কার্য্য নিরঙ্কুশ, তন্মধ্যে কোন কার্য্য লৌকিক যুক্তির অনুকূল, কোন কার্য্য সম্যক্‌রূপে অলৌকিক হয়; তাহাতে লোকের বিশ্বাস হউক বা না হউক, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সদসদাত্মক, তাঁহাতে যুক্ত ও অযুক্ত উভয়ই সম্ভব হয়। এপ্রযুক্ত যুক্ত পুরুষেরা মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরকে প্রকৃতি পুরুষ যুক্ত ভাবে ভাবনা দ্বারা ঊহ-শূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন। কালীতারাদি মহাবিদ্যাগণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ইহাঁরা এক

ব্রহ্ম বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন। এক্ষণে দশ মহাবিদ্যা ঘটিত শাস্ত্রীয় ইতিহাস বিবৃত হইতেছে।

[কালী।]

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোক বিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষ রাজর্ষিং সতীত্যক্ত্বা কলেবরাং॥
অনুগৃহ্যচ মেনায়াং জাতা তস্মাত্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

[নারদ পঞ্চরাত্র, তৃতীয় অধ্যায়]

লোক বিশ্রুতা যে সতী মহারাজ দক্ষের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সতী (দক্ষ যজ্ঞে শিব নিন্দা শ্রবণে) দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজাত কলেবর পরিত্যাগ করত অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাগর্ভে আবির্ভূতা হয়েন। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই পার্ব্বতী তথায় কালী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সেই কালীই যে কালে একরূপে অনেক রূপা হয়েন তাহা "স্বতন্ত্র তন্ত্র" গ্রন্থে ব্যক্ত আছে। যথা—

"মহারাত্রি দিনেঽবন্ত্যাং নগর্য্যাং জাতমেব তৎ।
কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কম্॥"

হে মহেশানি! মহারাত্রি দিনে অবন্তী নগরীতে কালীরূপ প্রকাশিত হয়েন। সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রদায়ক।

মহারাত্রি পদে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা একাদশী; তাহাতে যে

মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহারও নাম কালী ; কেবল কিঞ্চিৎ মাত্র রূপভেদ আছে। এই কালী মূর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অপর অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে ; স্নতরাং এস্থলে আর তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারার মাহাত্ম্য ও বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

[তারা]

শাস্ত্রে এই তারা মূর্ত্তিকেই নীল সরস্বতী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইনি কাল রাত্রিতে সাধকের উগ্র আপৎ-তারণার্থ আবির্ভূ্তা হন ; এই কারণে লোকে ইহাঁকে "উগ্র-তারা" বলিয়া অর্চ্চনা করে। এই তারা সাক্ষাৎ তারক ব্রহ্ম-রূপ প্রণব স্বরূপা হয়েন ; এই জন্য ইহাঁর নাম তারা। ইহার দেহ সামান্য পদার্থ নহে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপকরণ মাত্র ; ইহাঁর ক্ষয়োদয় নাই। ইনি গগন-সদৃশ অতি-স্বচ্ছ-নির্ম্মল নীলবর্ণা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ভুজ-বিশিষ্টা। ইহাঁর উদর ব্রহ্মাণ্ডবৎ লম্বমানা ; (তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোদরে সকলেরই অবস্থিতি ; একারণ ইনি লম্বোদরী হইয়াছেন। মহাকালের অপরা মূর্ত্তি অক্ষোভ্য ইহাঁর ভৈরব। (তাৎপর্য্য এই যে) সকলেই ক্ষোভিত হয়, অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল ক্ষোভশূন্য কালেরই নাশ নাই ; কাল নিত্যই দণ্ডায়মান আছেন। তারা পঞ্চেন্দু-ভূষণা। ফলতঃ তারারূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ইহাঁর উপাসনাই ব্রহ্মোপা-সনা। পরব্রহ্ম আত্মস্বরূপ প্রদর্শনার্থ কালে কালে এক এক

রূপ ধারণ করেন; নতুবা তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি জীবের বিশ্বাস থাকে না। কেবল "একজন পরব্রহ্ম আছেন" এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, কালে লোকে নাস্তিক হইয়া উঠে। এই মহাবিদ্যা তারা কালীরূপা; ইহাঁর আবির্ভাব দিবসকেই শাস্ত্রে কালরাত্রি বলিয়া থাকে। যথা—

"কালরাত্রিদিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।
উগ্রাপত্তারণার্থন্তু উগ্রতারা স্বয়ং কলা।
মেরোঃ পশ্চিমকূলেতু চোলাখ্যোঽস্তি হ্রদো মহান্।
তত্রযজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী॥"

(স্বতন্ত্র তন্ত্র)

কালরাত্রি দিবসে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে মধ্য রাত্রিকালে স্বয়ং লক্ষ্মী-মূর্ত্তি মাতা নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা সাধকদিগের উগ্রাপৎ তারণের নিমিত্ত, সুমেরুর পশ্চিমস্থ চোলাখ্য মহাহ্রদের কূলে আবির্ভূতা হন।

উগ্রাপত্তারণ নিমিত্ত অর্থাৎ শুম্ভ, নিশুম্ভ অসুরদ্বয় হইতে দেবতাদিগের যে অত্যুগ্র আপৎ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে দেবতাগণের উদ্ধরণার্থ স্বয়ং ব্রহ্ম চোলনাখ্য হ্রদ-কূলে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন। ঐ আপদে আক্রান্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে গঙ্গাবতরণ দেশে হিমালয়ে কালীপূজা করিবার উদ্যোগ করাতে, শুম্ভ নিশুম্ভের দূত "চণ্ডমুণ্ড" তাহা দেখিয়া তদুপকরণ সকল নষ্ট করে এবং প্রতিমাকেও ভগ্ন করিয়া ফেলে। পরে রাজাকে

সংবাদ দিয়া তথায় অনুসন্ধান করিতে সেনা সংস্থাপিত করিয়া রাখে এবং দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দেয়; কোন মতেই স্বস্ত্যয়নাদি করিতে দেয় না। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি গুপ্ত ভাবে অমাবস্যার নিশীথ কালে সুমেরুর পশ্চিমস্থ চোলন হ্রদের তীরে রাত্রি মধ্যেই কালী প্রতিমা করিয়া রাত্রিতেই পূজা করত বিসর্জ্জন করিলেন। প্রভাতে তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিল না এবং অসুরদলেও ইহার কিছুমাত্র অনু-সন্ধান করিতে পারিল না। তদবধি কার্ত্তিকের অমাবস্যার নাম কাল-রাত্রি। শাস্ত্রে তাহাকে কালিকা পূজার রাত্রি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানে মাতা কালিকা গৌরীদেহ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের উগ্র আপৎ নিস্তারণ জন্য সরস্বতী রূপে প্রকাশিত হন। * তথা হইতে যেখানে পূর্ব্বে দেবতারা পূজার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেই জাহ্নবী-তীরে স্নানার্থ গমন করেন, যথা—

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথা পুরা।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥

মহিষাসুর বধানন্তর, পুনর্ব্বার তিনি গৌরীরূপা হইয়া দুষ্ট দৈত্যদিগের বিনাশার্থ এবং শুম্ভ নিশুম্ভের বধের নিমিত্ত সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন।

---

* সপ্তশতী গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ আছে।

উৎপত্তি কালে দেবী হিমকুন্দেন্দু-ধবলা ছিলেন, পরে তৎ-কালে শিবের ঊর্দ্ধবদন-গলিত তেজঃপ্রভাবে নীলবর্ণা হন; যথা

তপস্যাং চরত তস্মিন্ ত্রিযুগং সমবর্ত্তত॥
মমোর্দ্ধ বক্ত্রান্নিঃসৃত্য তেজোরাশিবিবর্দ্ধিতঃ।
হ্রদে চোলে নিপত্যেব নীলবর্ণা ভবত্তদা॥

(হে পার্ব্বতি!) আমি সেই স্থানে ত্রিযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা করি। সেই তপোবিরামে আমার ঊর্দ্ধ বদন হইতে তেজোরাশি বিনির্গত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ চোল হ্রদে নিপ-তিত হয়, তাহাতে ঐ হ্রদ নীলবর্ণ হইল; মাতা সরস্বতীও তাহাতে নীলবর্ণা হয়েন।

চণ্ডীতে ইহাঁকেই কৌশিকী বলিয়াছেন; তন্ত্রে তাঁহাকে নীল সরস্বতী বলিয়া উক্ত করেন। ঐ চোলাখ্য হ্রদ তদবধি নীল সাগর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা এই নদীকে এক্ষণে "নাইল" বলিয়া উল্লেখ করেন।

হ্রদস্য চোত্তরে ভাগে ঋষি রেকা মহত্তমঃ।
মদংশোঽক্ষোভ্য নামাসৌ তদারাধনতৎপরঃ।
কূর্চ্চবীজস্বরূপা সা প্রত্যালীঢ়পদাঽভবৎ।

ঐ হ্রদের উত্তর তীরে অক্ষোভ্য নামে এক মহত্তম ঋষি তাঁহার আরাধনা করেন। হে পার্ব্বতি! সেই ঋষি আমার অংশ অর্থাৎ আমি মহাকাল রূপ; তিনি আমার অপর মূর্ত্তি-বিশেষ। কূর্চ্চবীজস্বরূপা তারাও তাহাতে প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ সংযুক্তা আছেন।

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং।
রহস্যং তারিণী দেব্যা ন সমর্থোঽস্মি বিস্তরাৎ॥

তোমার নিকট এই কিঞ্চিৎ অতি পবিত্র দেবী মাহাত্ম্য কথিত হইল। আমি তারা দেবীর এই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহি।

উল্লিখিত তারাও কালী মূর্ত্তির রূপমাত্র ভেদ, স্বরূপের ভেদ নাই। কালে এই কালীই সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে।

[ষোড়শী]

শৃণু ভূয়ো মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
যেন কালী মহাবিদ্যা সুন্দরীত্বমুপাগতা॥

নারদ পঞ্চরাত্রং।

ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! তুমি পুনরায় পরম অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর, যাহাতে আদ্যা মহাবিদ্যা কালী সুন্দরিত্ব প্রাপ্তা হইয়াছেন।

কৈলাসশিখরে রম্যে বসমানে চ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো মুদা॥
আগতাস্ত মহাদেবং তুষ্টবুস্তং মহেশ্বরং।

একদা মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতের রম্য শিখরে উপবিষ্ট আছেন, এমত কালে ইন্দ্রদেব শিবের সন্তোষার্থ আনন্দের সহিত সমস্ত অপ্সরোকে প্রেরণ করেন। অপ্সরাগণ শিবান্তেকে আগতা হইয়া যথাবিহিত রূপে মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাসাং স বৃষভধ্বজঃ।
আভাষ্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা করুণামৃতয়া ততঃ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! বৃষভধ্বজ শঙ্কর সেই অপ্সরোগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রেমভাবে করুণামৃতপূরিত বাক্যে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন।

পুরুষস্যাতিথি র্জ্ঞেয়ঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
স্ত্রীণাং স্ত্রী চাতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাদ্গচ্ছত কালিকাং।
ইত্যুক্ত্বা তৎ পুরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ॥

পুরুষের আতিথ্য পুরুষের কর্ত্তব্য; স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রী করিবে। অতএব তোমরা কালিকার নিকট গমন কর, তিনিই তোমাদিগের আতিথ্য করিবেন। এই বলিয়া পরমেশ্বর শঙ্কর সেই রম্যপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উবাচ কালীং ভবানীমীশ্বরঃ পরমেশ্বর।
তা অপ্যবাপুঃ পরমাং প্রীতিং পরমদুর্ল্লভাং॥

অনন্তর ভগবান মহাদেব, পরমেশ্বরী কালীকে সেই সংবাদ কহিলেন। তাহারও পুরপ্রবিষ্ট হইয়া কালিকাকৃত সৎকারে অতি দুর্লভ প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

পরম-প্রিয়-পতি মহাদেব পুনঃ পুনঃ কালী, কালী, বলিয়া অপ্সরাদিগের অগ্রে সম্বোধন করাতে কালিকা কিঞ্চিৎ অভিমানিনী হইলেন। যথা—

ততো দেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
এতদ্রূপমপাকৃত্য শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং।
যস্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্বয়েৎ॥

অনন্তর মহাদেবী কালী বারম্বার চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন, যে আমি এই কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ গৌরীরূপা হইব। যে হেতু, মহাদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া আহ্বান করেন।

অনন্তর মহাদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেবোঽপি কালেন গতোঽহ্যন্তঃ পুরং শিবঃ।
নাপশ্যত তদা কালীং তস্থৌ তস্মিন্ পুরে হরঃ॥

মহাদেবও কিছুকাল পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন; কিন্তু অন্তঃপুরে কালীকে না দেখিয়া তখন তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং।
কৃতাঞ্জলিপুট স্তস্থৌ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ॥

অনন্তর হঠাৎ মহামুনি নারদ শিবদর্শনার্থ কৈলাসে সমাগত হইয়া ভূমিনত-মস্তকে দেব-দেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

মহাদেবোঽপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং।
উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং॥

মহাদেবও বাম হস্তে মুনিসত্তম নারদকে স্পর্শ করিয়া এবং

কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদির দ্বারা আশ্বাস করতঃ পুণ্যজনক নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাদেবী কালীও পরম সুন্দরী রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন মহাদেব নারদসমক্ষে দেবীকে কহিলেন ;—

যস্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে।
তস্মাৎ স্বর্গেচ মর্ত্ত্যেচ পাতালে হ্যত্র পার্ব্বতি ॥
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ ॥
যৎ ছায়াং হৃদয়ে মেঽদ্য দৃষ্ট্বা ভীতাঽভুরিশ্বরী।
তস্মাৎ ত্বং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুর ভৈরবী ॥

হে শিবে পার্ব্বতি ! যে হেতু এই ত্রিভুবন মধ্যে তুমি আপনার রূপকে অতিশ্রেষ্ঠ করিলে, একারণ স্বর্গ লোকে ও মর্ত্ত্য লোকে এবং পাতালাদি অন্য লোকে, তুমি সুন্দরী, পঞ্চমী, শ্রীবিদ্যা এবং ত্রিপুর-সুন্দরী নামে খ্যাতা হইবে ; এজন্য তোমাকে সকলে "ষোড়শী" বলিয়াও বিখ্যাতা করিবে। হে সুরেশ্বরি, তুমি অদ্য আমাতে তোমার যে আপন ছায়া দেখিয়া ভীতা হইলে, একারণ, ত্রিলোক মধ্যে তুমি ত্রিপুর ভৈরবী নামে বিখ্যাত হইবে।

[ভুবনেশ্বরী]

যাঽবস্থা ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্তা কৃপাময়ী।
ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ ॥

ভগবতীর যে অবস্থা অতি সুস্থচিত্তা, এবং সর্ব্বজীবে কৃপা প্রদান করেন, তাহাকেই "ভুবনেশ্বরী" বলা যায়। ঐ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিভেদই রাজরাজেশ্বরী নামে বিখ্যাত।

যাচোগ্রতারিণী প্রোক্তা যাচ দিক্করবাসিনী।
যৈষা ললিতকান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা।
কৌশিকী দেবদূতীচ যাশ্চান্যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ইত্যাদি।

যিনি উগ্রতারা নামে উক্তা হইয়াছেন, যাহাকে দিক্করবাসিনী বলা যায়, যিনি ললিতকান্তাখ্যা, যিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে বিখ্যাতা, যাঁহাকে কৌশিকী ও দেবদূতী বলা যায়, তাঁহাদিগকে এবং আর আর এইরূপ মূর্ত্তি সকলকে তারারূপবিভূতি জানিবে।

যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্যা ভেদা হ্যনেকধা।
ত্রিপুটা জয়দুর্গাচ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী॥
কাত্যায়নী মহিষঘ্নী দুর্গাচ বনদেবতা।
শ্রীরামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণীচ শূলিনী॥
গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধা রাধাচ কালিকা।
কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ॥

হে নারদ। যাঁহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাত করা যায়, তাঁহার ভেদ অর্থাৎ বিভূতিরূপ অনেক প্রকার। যথা, ত্রিপুটা, দুর্গা, (বীজত্রয়বিশিষ্টা) জয়দুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকণ্টকী, মহিষঘাতিনী দুর্গা—যাহাকে কাত্যায়নী বলেন, আর বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্র-প্রস্তারিণী দুর্গা, শূলধারিণী দুর্গা, গৃহদেবী,

গৃহারূঢ়া অর্থাৎ গন্ধেশ্বরী, এবং মেধা, যাঁহাকে রাধা বলা যায় ও কালিকা অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডী। সংক্ষেপতঃ ভুবনেশ্বরীর এই সকল মূর্ত্তিভেদ কহিলাম।

ফলিতার্থে এক কালীই সকল রূপ হইয়াছেন। পূর্ব্বে কালীমাহাত্ম্য কহাতেই এ সকলের ব্রহ্মতা সিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেক রূপে মহাদেবী যে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উপাসকদিগের বোধার্থ বিবৃত হইতেছে।

সা কালী জগতাং মাতা পতিং প্রাহ সনাতনী।
আজ্ঞাপয় মহাদেব রূপমন্যদ্ধরাম্যহং॥

সেই আদ্যাশক্তি সনাতনী কালী নিজপতি সদাশিবকে কহিলেন, হে মহাদেব! আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি অন্য প্রকার রূপ ধারণ করি।

ঈশ্বর উবাচ।

অধুনৈব জগদ্ধাত্রি যদ্রূপং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
করিষ্যামি চ তৎ সর্ব্বং যত্র প্রীতি স্তবাচলা॥

পার্ব্বতীর প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব কহিলেন, হে জগদ্ধাত্রি, (অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারিণী ব্রহ্মশক্তি) ইদানীং তুমি যে প্রকার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ এবং যাহাতে তোমার অচলা প্রীতির উদ্ভাবন হয়, আমি সে সমস্তই করিব।

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ব্যক্তি, এই উভয়ের ভেদ নাই। পরমাত্মা কালরূপ; কালী পরমাত্মশক্তি; কালে এই নানারূপ

বিশ্ব কালীকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়; এখানে সেই ভাব উক্ত হইয়াছে। যথা, মহাদেবকহিলেন, হে কালি! তুমি যত রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, আমিও ততরূপে প্রকাশিত হইব। আত্মা নিরঞ্জন, তিনি কেবল প্রকৃতিতে ভাসমান হন। এই দশ মহাবিদ্যা তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অর্থাৎ দশবিধা শক্তিতে জ্ঞান স্বরূপ আত্মাও দশবিধ রূপে ভাসমান হইয়াছেন। মৎস্যাদি দশ অবতারে তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এতাবতা আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দেবী উবাচ।

সর্ব্বকর্ত্তাসি দেবশ তব শক্ত্যা জগৎপতে।
কিন্তু বাক্যং তব বিভো শ্রূয়তাং পরমেশ্বর॥

মহাদেবী মহাদেবকে কহিলেন, হে জগৎপতে! তুমিই তোমার শক্তি দ্বারা সকলের কর্ত্তা হও। হে বিভো, হে পরমেশ্বর! কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ তোমার কথা কহি, তাহা শ্রবণ কর।

মর্য্যাদাং স্থাপয়িষ্যামি তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করং।
ত্বৎপ্রীতয়ে মহাভাগ প্রীতিস্তু কুরু তন্ময়ি॥

হে মহাভাগ। আমি কঠিনতর তপস্যা করিয়া তোমার প্রীতির নিমিত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিব। অতএব তুমি আমাতে প্রীতি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর। অর্থাৎ তুমি অতি দুর্ল্লভ্য, দুষ্কর তপস্যা ভিন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; আমি জগতে তোমার এই মহিমা স্থাপনা করিব।

গৌরম্বা রক্তগৌরম্বা শ্যামং শুক্লমথাপি বা।
যদন্যদ্বা স্বরূপং মে তৎ কুরুষ জগৎপতে॥

হে জগৎপতে শিব! গৌরবর্ণ বা রক্তগৌর, কিম্বা শ্যামবর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ, কি অন্য কোন বর্ণ, যাহা আপনারই স্বরূপ ও প্রীতিজনক হয়, আমাকে সেইরূপ বর্ণবিশিষ্টা করুন।

বামেন পাণিনা সাধ্বী মুত্থাপ্য পরমেশ্বরঃ।
মার্জ্জয়িত্বা প্রিয়াদেহং নির্ম্মলং কৃতবান্ হরঃ॥

মহাদেব পার্ব্বতীবাক্য শ্রবণ করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং স্বপ্রিয়া পার্ব্বতীর শরীরকে মার্জ্জন করিয়া নির্ম্মল করিলেন।

মন্দাকিন্যা জলে রম্যে স্নাপয়ামাস পার্ব্বতীং।
বিদ্যুদ্রূপাঽভবদ্গৌরী বিদ্যুদ্গৌরীতি বিশ্রুতা॥

মন্দাকিনীর নির্ম্মল মনোহর জলে পার্ব্বতীকে স্নান করাইলেন; সর্ব্বরূপা পার্ব্বতী তচ্ছলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হইলেন; তদবধি সুন্দরীশক্তি "বিদ্যুদ্‌গৌরী" নামে বিশ্রুতা হন।

স্বাহা গৌরীতি শ্যামা চ শুক্লা চ রক্তগৌরিকা।
অনন্তরূপিণী মূর্ত্তিঃ কোটিকোটিস্বরূপিণী॥
শাকম্ভর্য্যমলা সূক্ষ্মা ষট্‌পদী ভ্রামরী তথা।
অনেকবর্ণা গন্তব্যানন্দরূপা সনাতনী॥

বিদ্যুদ্-গৌরীরূপা হইবার পর সুন্দরী স্বাহা-গৌরী নামে শ্যামবর্ণা হইলেন এবং শুক্লবর্ণা ও রক্তগৌরী শাকম্ভরী,

অমলা, সূক্ষ্মরূপা, ষট্‌পদী ও ভ্রামরীরূপা হইয়া প্রকাশ পাইলেন। ফলতঃ তৎকালে কোটি কোটি রূপ-ধারিণী, অনন্তরূপা, অনেকবর্ণা, অনেক-মূর্ত্তি হইলেন। তিনি সনাতনী, ক্ষয়োদয়রহিতা, আনন্দরূপা, নিত্যা প্রকৃতি হয়েন। কেবল সাধক-প্রীতির নিমিত্ত নানা রূপবতী হইয়াছেন।

ষোড়শী বিদ্যাই সুন্দরী। ইহঁার নানা-রূপ-ভেদ-মাত্র। যিনি বালা ত্রিপুরা, তিনিই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। দেবী ত্রিপুরা পঞ্চ-প্রেতাসনা। যথা।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ, ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতা দেব্যাঃ পর্য্যঙ্কবাহিনঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর এই পঞ্চ দেবতা পঞ্চ মহাপ্রেতরূপে দেবীর সিংহাসন বহন করেন।

সাধকেরা এইবচনমূলক রাজরাজেশ্বরীর ধ্যান করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিকে দেবীর পর্য্যঙ্ক বাহক বলিয়া পরিহাসও করিয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল তান্ত্রিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের স্বরূপার্থ গ্রহণাভাবে লোকে নানা প্রকার বিতর্ক করে। ইহার প্রকৃত ভাব অবগত হইলে, আর কোন উৎপাত থাকে না।

যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি ও পরা বিদ্যা, তিনি প্রণবাকারে পরিণতা; ইহা জানাইবার নিমিত্ত ভগবান ভূতভাবন, শঙ্কর জীবের সন্নিধানার্থ রূপকব্যাজে উক্তরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ভূর্ভুবস্বঃ—এইতিন লোককে তিন পুর বলে।

যিনি এতৎপুরত্রয় ব্যাপ্তা, তাহার নাম ত্রিপুরা জ্ঞানশক্তি। বিশ্ব-ব্যাপ্ত জ্ঞানকে প্রণবাকারে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ বিরাটরূপের মহিমা বর্ণনস্থলে ত্রিপুরা মূর্ত্তির উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে, যাহারা তৎস্বরূপের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা ত্রিপুরা মূর্ত্তির আরাধনাতেই প্রণবাবলম্বন-জনিত ফলভাগী হইবে ; এই সদুপায় করিয়া দিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ এই "ভুবনেশ্বরী" ত্রিপুরা মূর্ত্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; যথা—

প্রণব জীবদিগের আপাদ মস্তক ব্যাপ্ত। তৎক্ষমতাকে ত্রিপুরা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন। এই প্রেতশব্দ ভূত-বাচক। ভূত পদে জীব।

মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে।

মণিপুরে তথা তেজো হৃদি মারুত এবচ।

বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাশং আজ্ঞাখ্যে চন্দ্র এবচ॥

ষট্‌চক্র ব্যাখ্যায় পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত এবং চন্দ্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপুর—এই ষট্‌চক্রে অবস্থিত।

মূলে (লং) বীজ, লিঙ্গে (বং) বীজ, নাড়ীতে (রং) বীজ, হৃদয়ে (যং) বীজ, কণ্ঠদেশে (হং) বীজ, ভ্রূমধ্যে (ঠং) বীজ,—এই সঙ্কেতানুসারে প্রণবমাহাত্ম্য উপবর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনা দ্বারা উপর্য্যুপরি বীজাধারের সংস্থাভেদে প্রণবের স্বরূপার্থ ব্যক্ত হইয়াছে। ভ্রূমধ্যে নাদ বিন্দু, তাহাতে

নাদ শক্তি প্রণবরূপ বিন্দু শিবস্বরূপ।

"বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদশক্তিসমন্বিতঃ।"

নাদ-শক্তি-সমন্বিত বিন্দু সাক্ষাৎ শিব হয়েন। একারণ মস্তকোপরিস্থ প্রকৃতিকে ত্রিপুরা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা করেন। তারাপতি তন্ত্রে এই তত্ত্ব উক্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর পূজাপদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন। ফলে যিনি ত্রিপুরা, তিনিই প্রণব, ইহার অন্যথা নাই। যথা—

"যথা কালী তথা তারা তথৈব ত্রিপুরেশ্বরী।"

যে কালী, সেই তারা, সেই ত্রিপুরেশ্বরী।

এই অর্থে কালী তারার মাহাত্ম্য বর্ণন হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপকরণ-বিনির্ম্মিত এই সকল দেবীরূপ প্রকৃতি-ব্রহ্ম-স্বরূপ। ইহার সূক্ষ্মার্থ অবগত হইলেই চিত্তস্থ সন্দেহ সকল অনায়াসেই নিরস্ত হয়। ভগবান ভূতপতি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বোধার্থ অজ্ঞদিগের পক্ষে প্রকারান্তরে তত্ত্বসংঘাত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা বোধশক্তির অভাবে চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, তাহাদিগকে ঘটস্থ অপ্রকট বিষয় প্রকট স্বরূপে এবং অরূপ তত্ত্বকে রূপক ব্যাজে বলিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্বানভিজ্ঞজনে ত্রিপুরা রূপের উপাসনাতে অপূর্ব্বরূপ ভগবানকে স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক মতে নাদচক্রে সূর্য্য, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, এই চন্দ্র সূর্য্যাত্মক জগৎকে ত্রিপুর বলে। তদধিষ্ঠাতৃদেবী নাদরূপা শক্তিই ত্রিপুরা বলিয়া বিখ্যাতা। সূর্য্য রক্তবর্ণ, রক্তাত্মক; সোম শ্বেতবর্ণ, শুক্রাত্মক; এই হেতু পরমপুরুষ

শিব শুক্লবর্ণ, পরমা প্রকৃতি বালা ত্রিপুরা রক্তবর্ণা হয়েন, শিবশক্তি হইতেই এতৎ জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

"হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ।"

বিশ্বসার গ্রন্থের লিখনানুসারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রিপুরা জগদ্ব্যাপ্তা জগদীশ্বরী। একারণ তাঁহাকে ত্রিপুরেশ্বরী বলা যায়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি পুরত্রয়স্থ লোক সকল তাঁহাকে স্মরণ করিলে জনন-মরণ-ভয়ে পরিত্রাণ পায়। এজন্য সকলে ষোড়শী শক্তিকে ত্রিপুর ভৈরবী বলিয়া উপাসনা করেন। অপর, ত্রিশব্দে তিনগুণ—যাহাতে পরিপূর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত, সেই ঐশী শক্তিকে ত্রিপুর বলে; তিনি নিত্যা। যথা—

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবোযস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা॥

যামলং।

ব্রহ্ম- বিষ্ণু- শিবাদি যাঁহার নিজ ইচ্ছাতে উৎপন্ন এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে নিত্যা বল যায়।

পুনরপি

সত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।
সাম্যাবস্থেতি যা তেষাং সাব্যক্ত ত্রিপুরেশ্বরী॥

যামলং।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় যে শক্তিতে সমতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে অব্যক্তা ও ত্রিপুরেশ্বরী বলে।

[ভৈরবী]

ভৈরবী শব্দের প্রকৃত অর্থ এই—ভ শব্দে ভয়; যে ব্যক্তি ভয়যুক্ত তাহাকে ভীরু বলে; ঈ শব্দে শক্তি; অতএব যে ঐশ্বরিকশক্তি ভীরু ব্যক্তিগণের ভয়নাশক, তাহাকে "ভৈরবী" বলে।

জীবগণের পক্ষে মরণ হইতে ভয় আর নাই; সেই জনন-মরণ ভয়-যুক্ত ব্যক্তি সকলকে ভীরু বলে; তাহাদিগের পরিত্রাণ-কারক পরমাত্মাকে ভৈরব বলা যায়; দীর্ঘ ঈকার তৎ-শক্তি রূপা পরমাত্মার ক্ষমতাই তদীয় শক্তি বলিয়া বর্ণিত। সেই শক্তিকে নামভেদে ত্রিপুরা ভৈরবী ও ত্রিপুরেশ্বরী বলে। তিনিই পরমাত্ম তত্ত্ব-স্বরূপা; অত-এব তদুপাসনাতে নিঃসংশয়ে জীবদিগের সংসার ভীতির অপহরণ হয়। ভৈরবী শক্তি নিত্য পদার্থ। যথা—

"অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজাগ্রবৎ।"

ব্রহ্মরূপা শক্তির অবস্থান্তর নাই; অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ নাই। তিনি সর্ব্ব-দাই জাগরূকা আছেন।

যেমন বাহিরে ভূর্ভুবস্বঃ এই লোক-ত্রয় সেই রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডজীব-শরীরও লোক-ত্রয় বলিয়া পরিগণিত। যথা,

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি লোকময়ঃ পুমান্ (তন্ত্রং)

পাদ দেশ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত ভূর্লোক, নাভির ঊর্দ্ধ হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভুবর্ল্লোক; কণ্ঠের ঊর্দ্ধ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বর্ল্লোক। অতএব জীবদেহ লোক ত্রয় ময়। ত্রিপুরা ভৈরবী শক্তি সেই সমস্ত দেহ ব্যাপ্তা। যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও সোম-সূর্য্য পরাপর হয়েন, সেই রূপ জীবের মূলাধার চক্রাবধি আজ্ঞাপুর পর্য্যন্ত চক্র সকল পরস্পর অবস্থিত রহিয়াছে। পঞ্চচক্রের উপরি ভাগস্থ পদ্মে বিন্দুরূপ পরম শিব অবস্থিত। তদুপর নাদ শক্তি; তাঁহাকেই ত্রিপুরা ভৈরবী শক্তি বলা যায়। পরস্পর চক্র সকল পরাপরে চক্রের আধাররূপে পরস্পর বহন করিতেছে। যথা,—

মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে॥ ইত্যাদি *

[ছিন্নমস্তা।]

ছিন্নমস্তা দেবীর স্বরূপ-জ্ঞান অতি দুরূহ। তাহা স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহসা বোধগম্য হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে ভগবান ভূতনাথের যে ভঙ্গী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ নৈপুণ্যের কার্য্য। ইহাতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম ভেদে তিন প্রকার উপদেশ আছে।

যাহার যেমন প্রজ্ঞা, সে সেই প্রজ্ঞানুসারে তাৎপর্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ যে কোন রূপে হউক, গ্রহণ

---

* এই বিষয় বিশেষরূপে ভুবনেশ্বরী প্রকরণে ব্যাখাত হইয়াছে।

তদ্ভাবনা-যুক্ত পুরুষ বিমুক্ত হয় ; তাহাতে সংশয় নাই।

প্রথমতঃ ভগবতী ছিন্নমস্তার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত হইতেছে।

"ছিন্নোৎপত্তিং প্রবক্ষামি তারা সৈবচ কালিকা।"

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে শিবে! সংপ্রতি তোমাকে মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা দেবীর উৎপত্তির বিবরণ বলিব। বস্তুতঃ যে তারা, সেই কালী।

কালীই ছিন্নমস্তা রূপে আবির্ভূতা ও রক্তবর্ণা হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে "উগ্ররূপা রক্ত-চামুণ্ডা" বলিয়াও খ্যাত করা যায়।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে।
মহামায়া ময়া সার্দ্ধং মহারতপরায়ণা॥ (স্বতন্ত্র তন্ত্রং)

পূর্ব্বে সত্যযুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পের প্রথম সত্যযুগে পর্ব্বতোত্তম কৈলাস শিখরে মহামায়া আমার সহিত মহা-রতি-ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

শুক্রোৎসারণ কালেচ চণ্ডমূর্ত্তি রভূত্তদা।
তস্যাঃ স্বদেহ সম্ভূতে দ্বেশক্তী সম্বভূবতুঃ॥

সেই রতিতে শুক্রোৎসারণ সময়ে মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি বিশিষ্টা হন। তন্নিমিত্ত সেই সময়ে তাঁহার শরীর হইতে দুই শক্তি উৎপন্না হয়েন। যথা—

ডাকিনী-বর্ণিনী নাম্না সখ্যৌ তাভ্যাং সহম্বিকা।
পুষ্পভদ্রা নদীকূলং জগাম চণ্ডনায়িকা॥

একের নাম ডাকিনী, অপরার নাম বর্ণিনী। এই উভয় সখীর সহিত ঐ চণ্ডমূর্ত্তি জগৎপ্রসূ চণ্ডনায়িকা পুষ্পভদ্রা নদী তীরে স্বচ্ছজলে স্নান এবং বিহরণার্থ গমন করেন।

মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্ত্তে তে চণ্ডিকাং পৃচ্ছত স্ততঃ॥
ভক্ষণং দেহি, তৎ শ্রুত্বা বিহস্য চণ্ডিকা শুভা।
চিচ্ছেদ নিজ মূর্দ্ধানং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং॥

অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, ঐ দুই সখী ক্ষুধাতুর হইয়া চণ্ডিকাকে কহিলেন, হে মাতঃ! ক্ষুধা আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে; আপনি কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করুন। সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডিকা ঈষৎ হাস্য করতঃ দশদিক্ অবলোকন করিয়া (বাম হস্তের নখাগ্র দ্বারা) নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

ছিন্নমাত্রস্তু তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ।
কণ্ঠাৎ বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন॥
(পঞ্চরাত্রং)

হে তপোধন! ছেদন করিবা মাত্র ঐ ছিন্ন মস্তক দেবীর বাম হস্তে পতিত হয় এবং কণ্ঠস্থান হইতে তিন ধারে রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

বামদক্ষিণভেদেন দ্বে ধারে চ বিনির্গতে।
সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারাং স্বকাননে।

দেবীর কণ্ঠ হইতে তিন ধারা বহির্গত হয়। যথা—বাম দিকে একধারা, দক্ষিণ দিকে একধারা এবং মধ্যস্থলে এক-

ধারা। বামদিকের রক্তধারা ডাকিনী-মুখে, আর দক্ষিণ দিকের ধারা বর্ণিনী মুখে নিয়োজন করিয়া ছিন্নমস্তা দেবী মধ্য-দেশোত্থিতা শোণিতধারা স্বীয় বদনে নিক্ষেপ করিলেন।

এবং কৃত্বাতু তাস্তত্র গতাঃ সর্ব্বা যথাগতং।
ছিন্নং তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্মৃতাঃ॥

এইরূপে দেবীর স্বদেহোত্থিত শোণিত পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা সকলে যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। মহাদেবী ছিন্নমুণ্ড ধারণ প্রযুক্ত "ছিন্নমস্তা" বলিয়া বিখ্যাতা হইলেন।

বস্তুতঃ ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তি কালী ভিন্ন অন্যরূপা নহেন। কেবল শিব-সম্ভোগে চণ্ডমূর্ত্তি হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত "চণ্ডনায়িকা" নাম খ্যাত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে এক ভৈরবের উৎপত্তি হয়। সেই ভৈরবের নাম "ক্রোধ ভৈরব"; ঐ ক্রোধ ভৈরবই চণ্ড-নায়িকার রক্ষক হয়েন।

তন্ত্রান্তরে ছিন্নমস্তা দেবীর দক্ষিণ ও বাম নাসিকা এবং কণ্ঠ হইতে তিন ধারা রক্ত নির্গত হওয়া বর্ণিত আছে। যথা,—

বামনাসাগলদ্রক্তৈ র্ডাকিনীং পর্য্যতোষয়ৎ।
দাক্ষিণ্যে বর্ণিনীং দেবী মপায়য়ত শোণিতং॥
গ্রীবামূলাদ্গলদ্রক্তৈ র্মস্তকং পর্য্যতোষয়ৎ॥

(স্বতন্ত্র তন্ত্রং)

বাম নাসিকা হইতে গলিত রক্তধারাতে ডাকিনীকে পরি-তোষিত করিয়া দক্ষিণ নাসিকা হইতে গলিত রক্তধারা বর্ণিনীকে পান করাইলেন এবং গলদেশ হইতে নির্গত রক্তে আত্মমস্তক পরিতুষ্ট করিলেন।

এই বর্ণনার ভেদ নাই। কেবল নাসা কণ্ঠের ভেদ মাত্র। অধ্যাত্মপক্ষে ইহাতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুসুম্না এই নাড়ীত্রয়ের সংজ্ঞাভেদে ইড়া ডাকিনী শক্তি, পিঙ্গলা বর্ণিনী শক্তি এবং ভগবতী ছিন্নমস্তা সুসুম্না নাড়ী রূপা। ইড়ায় প্রবৃত্তি মার্গ, পিঙ্গলায় নিবৃত্তি মার্গ, সুসুম্নায় মোক্ষমার্গ হয়। অর্থাৎ জীবের বীজভূত রক্ত ইড়া-মার্গে শোষিত হইলে পুনরায় রক্তোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; আর পিঙ্গলা মার্গে পরিশোষিত হইলে ক্রমে মুক্তিপথে গমন হয়, আর সুসুম্না মার্গে পরিশোষিত হইলে শিরঃস্থিত সহস্রারাখ্যে জীবের গতি হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। পৌরাণিক কল্পনাতে দেবী রক্তপানচ্ছলে ইহাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মহামায়ার ছিন্নমস্তারূপ হইতে এই উপদেশ লভ্য হইতেছে যে, পরমাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রূপে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল রূপই উপাস্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই জগতে যত স্ত্রীরূপ আছে, সে সকলই মহামায়ার রূপ; অতএব সকল স্ত্রীকেই তদ্রূপ-জ্ঞানে অর্চ্চনাদি করিলে মুক্তিলাভ হয়।

পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে,

নিত্যং স্ত্রীং পূজয়েদ্ যস্তু বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রকৃত্য তস্য তুষ্টাশ্চ যথা কৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চনে॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে।)

যেমন দ্বিজগণের অর্চ্চনাতে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়েন, সেইরূপ যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনাদি উপকরণ দ্বারা নিত্য স্ত্রীলোকের অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি এই দশ মহাবিদ্যা মহাপ্রকৃতিগণ পরিতুষ্টা হইয়া সদ্‌গতি প্রদান করেন।

এতাবতা সকল স্ত্রীই যে প্রকৃতি-স্বরূপা— তাহাতে সংশয় নাই। তথাহি, শাস্ত্রে কুমারী পূজার বিধি আছে; অতএব প্রকৃতি কুমারী-রূপা। অপর, কালী তারাদি মহাবিদ্যাগণ যুবতীরূপা হয়েন। আবার বৃদ্ধা এবং বিধবা স্ত্রীগণও প্রকৃতিস্বরূপা। কারণ, বৃদ্ধা বিধবারূপে ধূমাবতী মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। কেহ ভাবিতে পারেন যে, রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা, সর্ব্ব শাস্ত্রেই রজস্বলা স্পর্শ নিষেধ আছে। ইহাতে রজস্বলা স্ত্রী কোন মতেই পূজার্হা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মহাবিদ্যা মধ্যে ছিন্নমস্তা দেবী রজস্বলা মূর্ত্তি। যখন ত্রিকোণাকার বেদী বিপরীত রতিতে সংযুক্ত, রতি-কামোপরি আসন এবং কবন্ধ-গলিত ত্রিধারা শোণিতের বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বিশেষ রূপে বিবেচনা করিলেই রজস্বলা মূর্ত্তির লক্ষণ লক্ষিত হইবে।

ছিন্নমস্তা দেবীর বিবরণ অতি গোপনীয় তত্ত্ব। ইহার

সম্যকরূপ অর্থ করিতে হইলে অনেক গুপ্তকথা বাহির করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ বোধ হইতে পারে; যেহেতু সে বিষয় সাধক ব্যতীত অন্যের অবিজ্ঞাত। বিশেষতঃ অনেকেই তদ্বিষয়ে অনেক সংশয় করেন। তজ্জন্যই তৎ প্রকাশে কিঞ্চিৎ যত্ন করা আবশ্যক।

ব্রহ্মশক্তি জগৎকারিণী ও সংহারিণী। তিনি জগন্ময়ী, নিস্তারকারিণী ও মোক্ষমার্গ-স্বরূপা। তাঁহাতেই সর্ব্বশক্তিরূপে জগতের স্থিতি হয়। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এই জগতে ব্রহ্মশক্তিই সমস্ত স্ত্রীরূপা হয়েন। রজস্বলা স্ত্রীও যে সর্ব্বত্র পবিত্রা ও পূজনীয়া, তাহা জানাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি দেবী ছিন্নমস্তা রূপে প্রকাশ পাইয়া উপদেশ করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ প্রবৃত্তিমার্গে আমার উপাসনা করে, তবে তাহার পুনঃ পুনঃ মৃত্যু অবস্থা দর্শন হয়। একারণ তিনি জীব সম্বন্ধীয় বহু-মস্তকমালা ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীসম্ভোগে জীবনের অবিরত বিনাশের দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহার মুণ্ডমালা ধারণ হইয়াছে। জীবকে রক্তবিকার বলা যায়, সেই রক্ত স্ত্রীলোকের দেহোদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করা যায়। রজস্বলাগামী পুরুষকে কালশক্তি গ্রাস করেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে রক্তকালী ছিন্নমস্তাকে স্বরক্তপানাসক্তা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

তিন ধারা রক্তস্রাব বর্ণনের তাৎপর্য্য এই যে ঋতুমতী স্ত্রীর নিষিদ্ধ দিবসত্রয়-সম্ভূত শোণিতকে শাস্ত্রে ত্রিধারা

বলিয়া উক্ত করেন। ঐ তিন দিবসের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মঘাতিনী, রজকী ও চণ্ডালিনী। তদর্থে ছিন্না, ডাকিনী ও বর্ণিনী নায়িকারূপে বর্ণিতা হয়। ডাকিনী ব্রহ্মঘাতিনী, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব বিঘাতিনী। রজকী মলকারিণী অর্থাৎ জীব-চিত্তে সমলতা প্রদায়িনী। চণ্ডালিনী ছিন্না অর্থাৎ নির্দ্দয়-শীলা। যে স্বীয় মস্তক ছেদন করে, তাহার তুল্য নিষ্করুণা আর কে হইতে পারে? সর্ব্ব শরীরে শক্তিত্রয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একারণ প্রকৃতি দেবী স্বভাবের পরিচয়ার্থ শক্তি-রূপে তৎকার্য্যের অনুদর্শন করাইয়াছেন।

মোহপাশে বদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি রজস্বলা রমণী রমণে রত থাকে, তাহার মোক্ষপথ অবরোধ হয় এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ মরণপথে বিচরণ করিতে হয়। এই ছিন্না প্রকরণে রজস্বলা দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় অনুমানে সারতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। স্মরগৃহ স্বরূপ যোনিতে প্রকৃতির অধিষ্ঠান; শোণিতও যোনিকূপ হইতে নিঃসৃত হয়। রতি-কাম-বিপরীতা শক্তির তাৎপর্য্য এই যে, রজোযোগে স্ত্রীলোকের মনে রমণাশা অত্যন্ত বলবতী হয়; সুতরাং ঔৎসুক্যাতিরিক্ততা প্রযুক্ত রমণাজন রমণেচ্ছায় সমুত্থিতা হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে কামের বিপরীতাসন-বিশিষ্টা রক্তচামুণ্ডাকে "ছিন্নমস্তা" বলেন। রজস্বলা স্ত্রীতে সম্ভোগেচ্ছু পুরুষ আপন মস্তককে আপনি নিরস্ত করে এবং আপনিই আপন শোণিত-পায়ী হয়, যে হেতু ঐ শোণিতধারাত্রয়ই তৎকালে তাহার বুদ্ধির

নিয়ন্তৃরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরন্তু ছিন্নমস্তা দেবীর হস্তদ্বয় নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গের কার্য্য-প্রদর্শক। যে হস্তে খড়্গ, সেই হস্তে প্রবৃত্তি মার্গীয় কার্য্য, যে হস্তে মুণ্ড, সেই হস্তেই নিবৃত্তিমার্গীয় কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে। ছিন্নমুণ্ডে শোণিত পানদ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নিষ্কাশিত হইতেছে। সর্ব্বশক্তিময়ী ছিন্নমস্তার উপাসনায় জীবের সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়। যে শক্তির উপাসনায় জীবের পুনর্জ্জন্মাদি নিবারণ হইয়া থাকে, বেদশাস্ত্রে তাঁহাকেই পরাবিদ্যা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণা প্রকৃতি রূপা হয়েন। প্রকৃতির সেই অংশত্রয় অথবা ত্রিসংখ্যক দেবীই ছিন্নমস্তা প্রকরণে জীবের উৎপাদিকা ত্রিসংখ্যকরুধির ধারা রূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন। সেই গুণত্রয় যাহাতে সমতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। সেই প্রকৃতিই ছিন্নমস্তা। তাঁহার উপাসনায় জীবের পুনরুৎপত্তির কারণ যে রক্ত সেই রক্তকে তিনি স্বয়ং পান করিয়া ভবার্ণব হইতে জীবের উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহাই ছিন্নমস্তামূর্ত্তির অন্তর্নিগূঢ় তাৎপর্য্য; অতএব ছিন্নমস্তাদেবীর স্বরূপ তত্ত্ব জানিলে আর তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, এবং জীবগণ অসংশয়ে পরমাশক্তিকে লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত কালী প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণনেই তদ্বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু এক কালিকাই ঐ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্টা হয়েন।

[ধূমাবতী]

ধূমশব্দের তেজোভাগের আবরক তমঃ। তমঃ সর্ব্বাচ্ছাদক। যে শক্তি সকলের আচ্ছাদিনী, সেই ঐশী শক্তিকে ধূমা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। অথবা তমোবিশিষ্টা তামসী শক্তিকে ধূমাবতী বলা যায়, অর্থাৎ স্বয়ং শুদ্ধা হইয়াও যিনি বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ সংসারসংহরণক্রিয়াকারিণী হন, সেই ঐশ্বরী শক্তির নাম ধূমাবতী।

পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির মহিমা বর্ণনায় যাহা উল্লেখ করা গিয়াছিল, এই মূর্ত্তির বর্ণনদ্বারা তদর্থের পোষকতা প্রকাশ পায়; অর্থাৎ সকল স্ত্রীই এক ব্রহ্ম-শক্তিরূপা এবং সকলেই পূজ্যা। তন্নিদর্শনার্থ ভগবতী প্রকৃতিদেবী দশমহাবিদ্যা রূপে আবির্ভূতা হন। ধূমাবতী বৃদ্ধাস্ত্রীরূপে প্রকাশমানা হইয়াছেন, সুতরাং বৃদ্ধা স্ত্রীও সকলের পূজ্যা হন।

এতদ্ভিন্ন যদি কেহ বিধবা স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করেন, এই জন্য তাঁহাকেও সাবধান করা হইয়াছে যে, বিধবাস্ত্রীও আমি; আমিই সকল স্ত্রী; আমাভিন্ন প্রকৃতি নাই, যেহেতু ধূমাবতী নামে আমি বৃদ্ধা এবং বিধবা স্ত্রীরূপা হই।

[ভুবনেশ্বরী ও বগলা]

ভুবন শব্দে সংসার। যিনি তাহার ঈশ্বরী অর্থাৎ সম্পাদনকর্ত্রী তিনিই "ভুবনেশ্বরী" হয়েন; তদর্থে পরব্রহ্ম বুঝায়।

বগ শব্দে জড় ; ল শব্দে চৈতন্য ; আকারের অর্থ কর্ত্রী ; সমস্ত জড় বস্তুকে যাঁহার সত্ত্বায় চৈতন্য বিশিষ্ট করে, সেই ঐশী শক্তিকে "বগলা" বলা যায়। যিনি বাচালকে মূক করেন, মূককে বাচাল করেন, সেই কারণভূতা শক্তির নাম "বগলা"। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনেই ইহা প্রতীয়মান হয়। যে হেতু ঐ মূর্ত্তিবাদীর রসনা গ্রহণ করতঃ শিলা মুদ্গর প্রহারোদ্যতা হইয়াছেন।

[মাতঙ্গী]

মত শব্দে অভিমত। গকারের অর্থ গমন। ঈকারের অর্থ গ্রহণ। অতএব যাঁহাতে ভক্তগণের গমন অভিমত এবং যিনি ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম মাতঙ্গী।

[কমলাত্মিকা]

ক শব্দে ব্রহ্মা। ম শব্দে শিব। লা শব্দে দান। অতএব, যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রদান করেন, তাঁহার নাম "কমলা" বা "কমলাত্মিকা"। এই মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপা, তাহাতে সংশয় নাই।

পরব্রহ্ম সর্ব্বরূপ ; তিনি স্ত্রীও বটেন, পুরুষরূপও হয়েন। তিনি বালকও হয়েন ; যুবা ও বৃদ্ধও বটেন। ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শ্রুতিতে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—

"পুমাংস্ত্বং স্ত্রী ত্বং উতত্বং বালোযুবা বৃদ্ধস্ত্বং দণ্ডোদণ্ডেন জীর্য্যতে।"

তুমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং দণ্ডস্বরূপ ও আঘাতী স্বরূপও হও।

অতএব ব্রহ্মে সকলই সম্ভবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পুরুষ, সেই স্ত্রী; (যথা দুর্গা তথা বিষ্ণু যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ) যে দুর্গা সেই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু সেই শিব, ইহাতে ভেদ নাই। যে দশ মহাবিদ্যা রূপ সেই বিষ্ণুর দশান্তর রূপ।

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী যামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলা দেবী মীনো ধূমাবতী তথা॥
বুদ্ধো জ্ঞেয়াহি মাতঙ্গী কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশ বিদ্যাঃ প্রকর্ত্তিতা॥"

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালিকা, (এই কৃষ্ণনামোল্লেখে রামমূর্ত্তি বুঝিতে হইবে,) তারা বরাহরূপা, ষোড়শী পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামনরূপা। ভৈরবী বলরামমূর্ত্তি। মাতঙ্গী বুদ্ধমূর্ত্তি, কমলাত্মিকা কল্কিরূপা। এই দশাবতারই দশমহাবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত।

অতএব ব্রহ্ম-বিশেষণে স্ত্রী-পুরুষদিগের বিশেষ নাই। পরব্রহ্মকে সর্ব্বরূপী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

একাদশ অধ্যায়।

রামায়ণমর্ম্ম।

চির পবিত্র ভারতবর্ষের অমূল্য নিধিস্বরূপ সর্ব্বদর্শী মহর্ষি বাল্মীকি পরম পবিত্র রামারণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষবাসী পুরাকালীন হিন্দুবর্গ ঐ গ্রন্থকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান শাস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন এবং পরম পবিত্র মুক্তিপদ রাম নামকে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ব মঙ্গলের আধার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। ইদানীন্তন নব্য যুবকগণ এই গ্রন্থকে সামান্য ইতিহাস কথা বলিয়া রাবণাদির যুদ্ধ বৃত্তান্তকে অমূলক স্থির করেন এবং ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই ঘৃণার সহিত হাস্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই জ্ঞানরাশি রামায়ণের মর্ম্মাবধারণ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই এবং ইহা যে রূপক ব্যাজে পরমার্থ-তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ, ইহা তাঁহারা আদৌ জানিতে বা বুঝিতে পারেন না। ঐ সকল অল্পদর্শী জ্ঞানিগণের প্রবোধন জন্য পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিবর পরমহংসের ব্যাখ্যানুযায়ী রামায়ণ-মর্ম্ম বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে সকল ব্যক্তির এ সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রম আছে, তাঁহাদিগের ইহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা উচিত।

রামায়ণ-মর্ম্ম দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথমতঃ ইহাতে বিবিধ সাংসারিক উপদেশ ও শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে রূপকচ্ছলে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন ও আত্মতত্ত্বের জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত এবং রামায়ণের প্রত্যেক অংশের সহিত তদ্বিষয়ক ঐক্য সম্পাদন করা হইয়াছে। স্থির-চিত্তে নিরপেক্ষ অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিলেই তাহা অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য অখণ্ডনীয়। ঋষিগণ সাধনবলে ঈশ্বর-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সকল অযথার্থ বাক্যে পরিপূর্ণ, ইহা বলাই অসঙ্গত। সামান্য বুদ্ধিতে কোন কোন বিষয়ের বর্ণনা অসঙ্গত বোধ হইতে পারে; কিন্তু সদ্‌যুক্তিযুক্ত করিতে পারিলে তাহার সে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রামায়ণ গ্রন্থে রামাবতারের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ দুই প্রকার। একতঃ ভগবান্ মর্ত্ত্যলীলা প্রকাশার্থ অবতার হইয়া জগদ্ধাতার বিশ্বকার্য্যের প্রতিহর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি নরাবতার হইয়া মনুষ্যাধিকারে যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা আপনি লোক শিক্ষার্থ আচরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দর্শনে সেইরূপ আচরণ করিলে মনুষ্যেরা মহাত্ম-পদের বাচ্য হয়েন; অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পিতা যেরূপ মান্য, পুত্রেরা পিতাকে যেরূপ মান্য করিবে এবং পিতার আজ্ঞাকে যেরূপ রক্ষা করিতে হইবে, তাহা শ্রীরাম-বনবাস-চ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। রাজা দশরথ ধার্ম্মিকের

শ্রেষ্ঠ। কেন না, তিনি রামগত-প্রাণ হইয়াও সত্যধর্ম্ম-রক্ষার্থ প্রতিশ্রুত বরদানে বাধ্য হইয়া সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ, কুল-শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম পুত্র রামকেও বনবাস দিয়াছিলেন। সুতীব্র রাম-বিরহ যন্ত্রণায় সন্দহ্যমান হইয়া পরিণামে প্রাণত্যাগও করিয়াছিলেন; তথাপি স্ববাক্যের অন্যথা করিতে পারেন নাই। অতএব মনুষ্যদিগের সত্য প্রতিপালনে যে বিশেষ যত্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহা দ্বারা তাহাই সর্ব্বতোভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেক সময়ে নিষ্ক-ণ্টক সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একমাত্র পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষণকে পরম ধর্ম্ম বোধ করিয়া সমস্ত সুখ-সম্পত্তি-ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনবাসস্বীকার ও সুদু-র্গম দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে, তাহারা পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষণার্থ সমস্ত প্রকার ঐশ্ব-র্য্যে ও বরং বিযুক্ত হইবে, তথাপি পিতার আজ্ঞা অপ্রতিপালন বা অবহেলন করিবে না। শ্রীমান সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রতি পিতার বন-বাসাজ্ঞা ছিল না; কিন্তু তিনি পিতৃবৎ মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিচর্য্যার্থ আত্মসুখ-ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক জটাবল্কল-ধারী হইয়া রামের সহিত বিপিনবাসে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, সমস্ত সুখ সম্পত্তি ভোগে বঞ্চিত হওয়াও ভাল, তথাপি ভ্রাতৃসেবায় পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে।

মনুষ্য স্ত্রৈণ হইলে যে অশেষ অমঙ্গলের কারণ হয় এবং তাহাতে যে পদে পদে বিপদ ঘটে, কৈকেয়ীর বাক্যে রাজা দশরথের শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওয়াতেই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। স্ত্রৈণ পুরুষ যদিও জীবিত থাকে, তথাপি তাহাকে মৃত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

জনকরাজনন্দিনী রামমোহিনী সীতা দেবীকে রাজা দশরথ বনবাস দেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে কৌশল্যার নিকট থাকিতেই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু পবিত্রতার একাধার, বিনয়, শীলতা, সদাচার, ও সতীত্বধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ জনকনন্দিনী পতিব্রতা-ধর্ম্মের দৃঢ়তা জানাইবার নিমিত্ত রাম সহ বনবাসিনী হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও তাঁহাকে কত প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বনগমনে নিবৃত্তা করিতে পারেন নাই।

"ছায়েবানুগতা স্ত্রিয়ঃ।"

স্ত্রীগণ ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা হইবে।

এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া পতিসেবা করিবার নিমিত্তই মিথিলরাজ-দুহিতা রামের সহিত বনচারিণী হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যলোকে পতিব্রতা স্ত্রীগণ পতি-সন্নিধান ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই অবস্থিতি করিবেন না এবং পতি বিপদ্‌গ্রস্ত বা সম্পত্তিহীন হইলেও স্ত্রীগণ তৎসেবায়

তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না ;—দৃঢ়রূপে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আচণ্ডাল ঋষিলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রেই যে সমান ভাব প্রদর্শন করা মহতের কার্য্য, তাহাই দেখাইবার জন্য সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্র গুহকের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইবে, অভিমান বশে আমি শ্রেষ্ঠ ও তুমি অপকৃষ্ট, এমত জ্ঞান করিয়া কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সীতাহরণ ব্যাপার অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ। পত্নীকে একাকী রাখিয়া কোন স্থানে গমন করা পতির উচিত নহে ; তাহা করিলে অবশ্যই কোন না কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে। যদি উপাদেয় বস্তুও লাভ হয়, তাহাও পরিত্যাগ করিবে, তথাপি স্ত্রীকে একাকী রাখিয়া কোথাও গমন করিবে না ; অপরন্তু, স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, তথাহি, অভাবনীয়-চেতন-বিশিষ্ট স্বর্ণময় মৃগ দর্শনে বিমুগ্ধা সীতা রামকে কহিয়াছিলেন, হে রাম! তুমি আমাকে এই উপাদেয় হরিণটী ধরিয়া দাও। শ্রীরামচন্দ্রও এই সীতা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিপিন-স্থলে সীতা রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে রাখিয়া মৃগান্বেষণে গমন করেন। অনন্তর অতি দূর বনে গিয়া মায়ামৃগকে হত করাতে সে "হা লক্ষ্মণ!"—উচ্চৈঃস্বরে এই শব্দ করিয়া মৃত হয়। তদ্ধ্বনিশ্রবণকাতরা

জনককনন্দিনী রামান্বেষণ জন্য রামানুজ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করেন। তজ্জন্য বিষম বিপদের ঘটনা হয়। (একারণ লোকে ভ্রাতার অন্বেষণে ভ্রাতাকে গমন করিতে নিষেধ করে) অর্থাৎ দুরাত্মা রাবণ সীতা হরণ করিয়া অভাবনীয় বিপৎপাত উপস্থিত করে। ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, স্ত্রীবুদ্ধিতে প্রলয় উপস্থিত হয়। উপাদেয় বস্তু দেখিলেই লোভ করা কর্ত্তব্য হয় না, প্রত্যুত তাহার তথ্যানুসন্ধান একান্ত আবশ্যক।

রাবণ সীতা হরণ করিতে আসিয়াও লক্ষ্মণ-দত্ত গণ্ডী পার হইতে পারিলেন না, অর্থাৎ পরানিষ্টকারী ব্যক্তিও সহসা পরগৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; পরে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা-গ্রহণচ্ছলে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতেও এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সাধু-রূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া অসাধুকর্ম্ম করা অবিধেয়; করিলেও তাহার মঙ্গল হয় না। যেহেতু, রাবণের তৎকর্ম্ম-ফলেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী কি যোগী প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তির ন্যায় বেশভূষা দেখিলেই কোন ব্যক্তিকে যথার্থ সাধু বলিয়া বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহার পরীক্ষা লইয়া বিশ্বাস করা গৃহস্থদিগের উচিত হয়।

"অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মাচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিরূপপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাং॥"

অভব্য অর্থাৎ অসাধু ব্যক্তি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সাধুরূপে প্রতিচ্ছন্ন থাকে; দেখ, অনিন্দিতা সীতাকে হরণ

করিবার জন্য অসৎস্বভাব রাবণ সাধু-সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়াছিল।

ফলিতার্থে দুরাত্মারা আপনাকে সজ্জনরূপে পরিচিত করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করে; অতএব এতাদৃশ বিষয়ে সকলকে সাবধানতার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আগত অতিথিকে বিমুখ করা গৃহস্থের যে অকর্ত্তব্য, তাহা সন্ন্যাসিদর্শনে সীতা দেবীর ভিক্ষা দানেই প্রতীতি হইতেছে। কেন না, বনবাসী হইয়া ও পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও সীতা আতিথেয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে সম্পন্নাসম্পন্নের বিচার নাই; স্বয়ং বিপন্ন হইলেও অতিথিকে সাধ্যানুরূপ অন্নদান করিতে হইবে।

রাবণ-ভগিনী সূর্পনখা কামাতুরা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছিল। তন্নিমিত্ত লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা-কর্ণ-চ্ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপিণী করিয়াছিলেন। ইহাতে কুলকামিনীদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে, কুলবধূজন কামের অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষান্তরের নিকট রতি যাচ্ঞা করিলে এতদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন হয়; অর্থাৎ তাহার মান রক্ষা পায় না। অন্য কোন ব্যক্তিই তাহাকে আদর করে না; পদে পদে অগৌরব হয় এবং অবশেষে সেই লক্ষিত পুরুষও তাহাকে ঘৃণা করে।

পরদার হরণে যে স্বকুল বিনষ্ট হয় এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য

ভ্রষ্ট হয়, তাহা রাবণের পারদারিক কর্ম্মের ফল দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সুদুর্গম দুর্গমধ্যস্থ ব্যক্তিও যদ্যপি পরানিষ্ট-কর্ম্ম করিয়া সাহস করে যে, আমার দুর্গ অভেদ্য ও অজেয়, এজন্য কেহই আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তবে তাহার সে স্পর্দ্ধাও বিফলা হয়। রাবণের সুদুর্গম লঙ্কা-বাসেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফলতঃ পরপীড়ক ব্যক্তির কোন স্থানেই আত্মপরিত্রাণ নাই। অসৎ ব্যক্তি যদিও অসংখ্য ধনজনাদিতে যুক্ত থাকে, তথাপি হিংসাধর্ম্মে রত হইলে তাহার বিনাশ হয়। তদ্দৃষ্টান্ত এই যে, রাবণের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা ছিল না। তাহার এক লক্ষ পুত্র, সপাদ লক্ষ পৌত্র এবং দৌহিত্রাদি অসংখ্য পরিবার ছিল। ত্রিলোক মধ্যে অজেয় কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি তাহার ভ্রাতা। কিন্তু পরা-নিষ্টকারী রাবণের সাহায্য করিতে গিয়া সে সকলেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

নির্দ্দোষা পরগৃহস্থা ভার্য্যাকে উদ্ধার করা স্বামীর অত্যা-বশ্যক কার্য্য, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ে—সীতার উদ্ধারেই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য জঘন্য পুরুষেরও সহায়তা গ্রহণ করা উচিত, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের বানর-সখ্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। যথা—

স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা।
বানরেণ সহায়েন জিতো লঙ্কাং রঘূত্তমঃ ॥

যে ব্যক্তি যেরূপে স্বকার্য্যোদ্ধার করিতে পারে, তাহা

করিবে। না করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। যেহেতু, বান্দর সাহায্যেও রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে সামান্য জন হইতেও বিশেষ উপকার হয়, তাহার সংশয় নাই।

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ মনুষ্যকে লঘু জ্ঞানে অবজ্ঞা করা মূর্খের কার্য্য। কেন না ভল্লুক ও বানরের দ্বারাও দুর্ল্লঙ্ঘ্য সমুদ্র বদ্ধ হইয়াছিল। পরগৃহস্থা ভার্য্যা সম্যকরূপে দোষ-রহিতা হইলেও বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহা সীতার পরীক্ষাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। অসতের সহিত বন্ধুতা করিলে নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরও বিনাশ হয়; রাবণ বালি রাজার সহিত অগ্নি স্বাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছিল, সেই মিত্রতা সূত্রে নির্দ্দোষ বালি রাম হস্তে নিপাতিত হয়। ইহাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। বিপন্ন হইলেও পিতৃদেবার্চ্চন করা বিধেয়, আপন অবস্থার উপযুক্তরূপেই তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। তথাহি, রামচন্দ্র মৃত পিতার উদ্দেশে মন্দাকিনী নদীতীরে পিণ্যাকশাকে চিত্রকূটে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং গয়াভূমে ফল্গু তীর্থে বালির পিণ্ডও দিয়াছিলেন। এইরূপ রামায়ণের প্রত্যেক ঘটনাতে যে সকল নীতিসূত্র নিখাত রহিয়াছে, অনুধ্যানশীল ব্যক্তিগণ তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়রসে নিমগ্ন হয়েন।

লঙ্কাতে নিত্য পৌর্ণমাসী চন্দ্রোদয় হইত; ইহা শ্রবণ

সত্রই অসঙ্গত বোধ হয়। কেন না লঙ্কা অতি ক্ষুদ্র স্থান, চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী হইতে অনেক বৃহৎ। পৃথিবীর আর আর স্থানে চন্দ্রোদয় না হইয়া কেবল লঙ্কা-মধ্যেই উদয় হইত, ইহাতে অবশ্যই সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, একজন পরম জ্ঞানী ঋষি এতাদৃশ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহার কারণ কি? অতএব অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।

রাজাধিরাজ রাবণ ত্রিলোকাধিকার করিয়াছিল। তাহার নিকট বিদ্যুৎ-জিহ্বাদি অনেকানেক শিল্পকর মিলিত হইয়াছিল, তাহারা বিশেষ বিশেষ পদার্থ-তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিশারদ ছিল। তাহারা রাজনিয়োগে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুবিধ অভাবনীয় যন্ত্র কৌশলাদির উদ্ভাবন করিত। বিদ্যুৎজিহ্বার শিল্প নৈপুণ্যে কে না বিস্ময়াপন্ন হয়? তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবতারাও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যখন সীতাকে ভুলাইবার নিমিত্ত রামলক্ষ্মণের সদ্যশ্ছিন্ন-গলিত-শোণিত মস্তক প্রদর্শিত হইযাছিল, তখন তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া কোন ক্রমেই বোধ হয় নাই। মায়াসীতামূর্ত্তি দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রাদিরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল। অতএব এতাদৃশ অনুভব অসঙ্গত নহে—যে সেই সকল শিল্পকরের বুদ্ধি-কৌশলে লঙ্কার উপরিভাগে কোন এক প্রকার চন্দ্রাকৃতি আলোকমণ্ডল সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাতেই সমস্ত লঙ্কা উপদ্বীপ আলোকময় হইত। লোকে

তাহাকেই যথার্থ চন্দ্রোদয় হইয়াছে বলিয়া মান্য করিত। একারণ গ্রন্থকর্ত্তা নিত্য পূর্ণচন্দ্রোদয় বলিয়া অদ্ভুতরসে গ্রন্থ বর্ণন করিয়াছেন।

অপর রাজা দশানন দেবতার নিকট বরপ্রাপ্তিনিবন্ধন বাহুবলে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিল; সমস্ত দিক্‌পতিদিগকে পরাভূত করিয়া স্ব-সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিল। সুতরাং সে ব্যক্তি যে চন্দ্রসূর্য্যাদিকে জয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এ বিষয়ে এই সন্দেহ করিতে পারে যে, অতি প্রকাণ্ড এবং অচেতন জড় পদার্থ সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্র-মণ্ডল লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া রাবণের সেবা করিয়াছিল, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল নিশ্চেতন জড় পদার্থ—ইহা যথার্থ। তাহার সচেতনবৎ সেবা-কার্য্য সম্পাদন করা সঙ্গত নহে; কিন্তু সেই মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ জঙ্গম শরীরী, তাঁহাদিগের পটুতা আছে এবং স্বল্পাধারেও অবস্থিতি করিবার সামর্থ্য আছে। যেমন পৃথিবীমণ্ডল অতি বিস্তৃত, তাহাকে জয় করা শব্দে তৎস্বামীকে জয় করা বুঝায়; (নতুবা অচেতন জড় বস্তুর জয় পরাজয় কি?) সেইরূপ চন্দ্রসূর্য্য পরাজয় শব্দে তদ-ধিষ্ঠাতৃদেবগণের পরাজয় বুঝিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত রামায়ণের লোকশিক্ষার্থ উপদেশ ভাগ বর্ণিত হইল। এক্ষণে পরমাত্ম-তত্ত্ব-ভাগ বর্ণন করা যাই-তেছে। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে এক পরমাত্মাই উপাস্য;

নির্গুণ-ব্রহ্মে প্রসন্নাপ্রসন্ন ভাব নাই। মূঢ়তম লোকে তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে পাছে অপ্রত্যয় করে, এজন্য জগৎসর্জ্জনকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া পরমাত্মা এক এক সময়ে এক এক রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্ব রক্ষা করেন। ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন;—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

আমি পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

পরমাত্মা এইরূপ যে যে রূপ ধারণ করেন, সেই সেই রূপেই জগতে সর্ব্বলোকের ধ্যেয় হয়েন এবং ধর্ম্মমার্গধ্বংসকারী অসুরাদির বিনাশ করিয়া জগতের শান্তি বিধান করেন। সেই সগুণ রূপের উপাসনা করিয়া যেরূপে নির্গুণতাপ্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্তই নির্গুণ পরমাত্মা সগুণ হইয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রথ শব্দে গমনার্থ যান; এখানে দশধর্ম্মকে রথ কল্পনা করিয়া তাঁহার নাম দশরথ হয়। মম্বাদি শাস্ত্রোক্ত

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্ম লক্ষণ।

ইহাতে নিষ্ণাত হইলে অর্থাৎ এতদ্দশধর্ম্মে অস্খলিতরূপে চলিলে, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং রাজা কোশলাধিপতি দশধর্ম্মারূঢ় হইয়া অস্খলিতরূপে চলিতেন, একারণ তাঁহার নাম দশরথ ছিল। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই যে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতিশাস্ত্রে আত্মা, জীব, মনঃ ও অহঙ্কার এই চারিটীকে ব্রহ্মপুচ্ছ কহেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়—ইহাদিগকে অবস্থা চতুষ্টয় বলেন। সগুণ অবস্থায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি জন আত্মব্যূহ চতুষ্টয় বলিয়া গণ্য। এখানে তুরীয়াবস্থায় বাসুদেবাখ্য আত্মা শ্রীরাম। সুষুপ্তাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা শ্রীলক্ষ্মণ। স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য আত্মা ভরত; জাগ্রদবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন। এই চারিরূপে শ্রীরামের অবতার হয়। এস্থলে পরমা বিদ্যাই সীতানামে অভিহিতা। তিনি ভূমি হইতে উত্থিতা হন। শাস্ত্রে উক্তি আছে, যে পৃথিবী সমস্ত ধর্ম্মের আধারভূতা, "ধর্ম্মধারা বসুন্ধরা।" এই নিমিত্তই পৃথিবী হইতে সীতার উৎপত্তি কহিয়াছেন। বিনাধর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, বিনা যজ্ঞে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বিদ্যালাভ হওয়া কঠিন, তজ্জন্যই যজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতার জন্ম সর্ব্বরামায়ণে খ্যাত হইয়াছে। মিথিলাধিপতি জনক রাজা রাজর্ষি

ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাজযোগ-নিষ্ণাত যোগী। তিনি যোগ সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞান লাভ হইলে যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা জ্ঞান-স্বরূপা সীতাকন্যাদানে পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হওয়াতেই সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

অপরন্তু, জ্ঞান প্রদানে পুরুষ-পরীক্ষার্থ কঠিন প্রতিজ্ঞা আবশ্যক; অর্থাৎ যে ব্যক্তি কঠিন ব্যাপার ভূত ক্রিয়াবান হইবে, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন সেরূপ পুরুষান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেই সীতা-বিবাহে হরধনু ভঙ্গরূপ "পণ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন পুরুষান্তর অপ্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীরামচন্দ্রই স্বয়ং ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন।

অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানাপহারক যে সমস্ত দোষ রাক্ষসরূপে জন্মিয়াছে, তাহাদিগের অন্বেষণার্থ সংসার কাননে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান রামচন্দ্র সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক মুনিজন-নিকেতন পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগিগণ যেস্থানে নিয়ত যোগাভ্যাস করেন, সেইস্থানেই পরমাত্মার নিত্যাধিষ্ঠান হয়। যথা

> নিম্বমামলকং বিল্বং ন্যগ্রোধশ্চাথ পিপ্পলং।
> জ্ঞেয়ং পঞ্চবটং দেবী যোগিনাং যোগসিদ্ধিদং ॥ (যামল বচনম্)

নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট ও অশ্বত্থ এই পঞ্চবট যোগ-সিদ্ধির স্থান।

এতাদৃশ স্থানে ভগবানের নিত্যাধিবাস হয়। তজ্জন্য জ্ঞানার্থী যোগীরা এই সকল স্থানে বাস করিয়া তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধান করিয়া থাকেন। পরমাত্মার বিশেষ স্থান যে পঞ্চবট, ইহা জানাইবার নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র আর আর সকল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পঞ্চবটীতেই বাস করিয়াছিলেন।

অপর পরমাত্মার সহিত কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নভাবে যোগস্থানস্থিত হইলেও তত্ত্ববিরোধী রাক্ষসস্বরূপ বিঘ্নচয় জ্ঞানকে অপহরণ করে। তাহার প্রমাণ স্বরূপে পরমাত্ম-মূর্ত্তি রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ বিরহে জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যা সীতাকে কপটসন্ন্যাসিরূপে রাক্ষসাধিপ রাবণ যোগস্থান পঞ্চবটী হইতেও অপহরণ করিয়াছিল। কপট সন্ন্যাসী-রূপের তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষে সন্ন্যাসী না হইয়া যে ব্যক্তি শুদ্ধ বিষয় কর্ম্মানুষ্ঠানরত ভিক্ষুক রূপে পরিচিত হয়, তাহাকেই জ্ঞানাপহারক কপট সন্ন্যাসী বলে। এতদুপদেশার্থ রাবণের সন্ন্যাসিবেশে সীতাহরণ প্রস্তাব উক্ত হইয়াছে।

সূর্য্যারিকা খণ্ড নিবাসিনী নিকষা নাম্নী রাক্ষসী, বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্র প্রার্থনা করাতে ঋষি তাহাকে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র ও সূর্পনখা নামে এক কন্যা প্রদান করেন এবং বিনা প্রার্থনাতে ঋষিতুল্য পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ নামে আরও এক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সূর্য্যারিক নামক অংশ দুইখণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক খণ্ডের নাম মুনিদেশ, তাহাতে মুনিদিগের আশ্রম,—অপর

খণ্ডের নাম কানিবল, তাহাতে মাল্যবান প্রভৃতি রাক্ষসেরা বাস করে। নিকষা সেই কানিবল খণ্ড হইতে আসিয়া মুনিদেশ-স্থিত বিশ্বশ্রবার নিকট পুত্রপ্রার্থনা করে; ইহাই পৌরাণিক ইতিহাস। বিশ্রবস ঋষিকে কোন স্থানে বিশ্বশ্রবা, কোন স্থানে বিশ্রবস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ফলিতার্থে যিনি একোগম্য, তাঁহার নাম ঋষি; পরমার্থ-ঘটিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে ঋষি পদে পরমাত্মা নারায়ণ। সকল শ্রবণ হইতে যাঁহার শ্রবণ বিশিষ্ট রূপ হয়, তাঁহার নাম "বিশ্রবা" অথবা বিশ্বলীলা শ্রবণ হেতু পরমাত্মাকে বিশ্রবস বলা যায়। কিম্বা যিনি শ্রোতব্য, তিনিই বিশ্রবা, এ অর্থে আত্মাই শ্রোতব্য। সূর্য্যারিক পদে সূর্য্য যেথনে তীব্রতা প্রয়োগ করেন, এমত দেশ অথবা যেখানে সূর্য্যাগ্নি বিদ্যুতের দীপ্তি নাই; তাহার নাম সূর্য্যারিক, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদ। যথা—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, নেমা বিদ্যুতঃ কুতোঽয়মগ্নি রিতি শ্রুতিঃ।

সেই পরমাত্মা সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে তদিঙ্গিতাজ্ঞাতে সৃষ্টিকারিণী মায়া তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন, তাহাতেই মায়া-সম্ভব মহামোহ, মহাতম প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে মায়া শব্দে নিকষা।

সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে "কষ্ বিলোড়নে বিলোমনে চেতি। কিঞ্চ নিকষতি নিকষা"।

কষ্ ধাতুতে বিলোড়ন ক্রিয়া, কখনও বা বিলোমন ক্রিয়াও

বুঝায়। নি + কষ্ ধাতু, কর্ত্তৃবাচ্যে অট্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "নিকষা" এই পদ সিদ্ধ হয়।

স্থতরাং এ স্থলে নিকষা শব্দে জগদাকর্ষিণী এবং জগচ্ছিদ্র-কারিণী মায়া। বিশ্ব-শ্রবস পদে পরমাত্মা নারায়ণ, সেই দুরন্ত মায়াকে মহামোহ ও মহাতম নামে দুই পুত্র আর কলহকারিণী নিকৃতি নামে এক কন্যা প্রদান করেন। ঐ কন্যার নাম সূর্পনখা; আর মহামোহের নাম রাবণ ও মহা-তমের নাম কুম্ভকর্ণ খ্যাত হয়। অযাচিত পুত্র বিবেক, এখানে তাঁহার নাম বিভীষণ। অধ্যাত্ম-পক্ষে লঙ্কাদ্বীপ শব্দে দেহীর দেহকে বুঝাইবে; লঙ্কাস্বরূপে দেহ-বর্ণনার তাৎপর্য্য লইতে হইবে। যেমন স্থবর্ণময় লঙ্কাদ্বীপ লবণ সমুদ্র মধ্যে ভাসমান, সেইরূপ শোভন-বর্ণ-বিশিষ্ট জীবের দেহও সংসার-সমুদ্র মধ্যে দ্বীপবৎ ভাসমান হইয়াছে। লঙ্কা দ্বীপকে অধিকার করিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণাদিরা বাস করিয়াছিল। সেইরূপ জীবের দেহকে অধিকার করিয়া মহামোহ, মহাতম ও নিকৃতি এবং বিবেক অবস্থিতি করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, মহা-মোহর এই দশ প্রধানাঙ্গ। স্থতরাং অঙ্গ সকলের মধ্যে মুখের প্রধানতা প্রযুক্ত রাবণকে দশানন বলিয়া উক্ত করিয়া-ছেন। ন্যায্যান্যায্যরূপে প্রত্যেক মুখে দুই দুই হস্ত কল্পনা দ্বারা বিংশতি হস্ত বর্ণনা হইয়াছে। অর্থাৎ কাম ক্রোধাদিরা বিহিতাবিহিত রূপে দ্বিবিধ কর্ম্ম করে। ন্যায় পূর্ব্বক কামাদি

ক্রিয়া অর্থাৎ স্বদারোপভোগ, এবং অন্যায় পূর্ব্বক পরদারোপ-ভোগাদি, উভয় কর্ম্মই মহামোহের অনুষ্ঠেয় হয়। যেখানে মহামোহের অধিষ্ঠান, সেখানে কোনক্রমেই ভদ্রতা নাই; অতএব রাবণকে সকলেই অহিতাচারী বলে। ঐ মহামোহ এতাদৃশ বলবান্ যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি ত্রিলোকস্থজন-মাত্রই তাহার বশীভূত; এই অভিপ্রায়ে রাবণকে ত্রিলোকজয়ী বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। হস্ত পদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গণ মহামোহের অধীনে দেহস্থ সমস্ত কর্ম্ম করে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলিয়া উক্ত করিয়া-ছেন। একারণ রাবণের আজ্ঞাধীন দেবগণ লঙ্কাদ্বীপে অধি-বাস করিয়া রাবণের নিয়োগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা রূপক ব্যাজে বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র শব্দে আকাশ এবং আকাশ শব্দে কণ্ঠদেশ। সুতরাং কণ্ঠ সন্নিহিত বাহুযুগল ইন্দ্রাংশ স্বরূপ। তজ্জন্যই ইন্দ্রকে কণ্ঠভূষণ মাল্যগ্রন্থন কর্ম্মে নিয়োগ করার উক্তি আছে। সূর্য্যশব্দে চক্ষু, চক্ষুর অবলোকনশক্তি,অতএব সূর্য্যকে পুরীদর্শক দ্বারপালস্বরূপ বলিয়াছেন। পবন অর্থাৎ বায়ু দেহবিশোধক, একারণ তাঁহাকে পুরী শোধনে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বরুণ দেহ-মার্জ্জক, এজন্য বরুণকে রাবণের মন্দির মার্জ্জনার্থ নিযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমসংজ্ঞক অপান বায়ু দেহবিনাশক, মহামোহ তাহারও দুর্দ্ধর্ষ। এজন্য জঘন্য রূপে বর্ণনা করিয়া যমকে অশ্বের

যবসাহরণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। চন্দ্র সর্ব্ব সন্তোষ-কারক, চন্দ্রই দেহের উপরিস্থ মস্তকে ভ্রূদলমধ্যে মনোরূপে সংস্থিত। পরকাল-পরাঙ্মুখ মহামোহের অধীনে জীব সকল বিষয়ালোচনায় সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করে। একারণ লঙ্কাতে নিত্য পূর্ণচন্দ্রোদয় বর্ণিত হইয়াছে। মহামোহ মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, মনঃ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ছত্রধারক ভৃত্যস্বরূপে অনুগামী হয়। চন্দ্রাখ্য মন মহামোহের অনুগত, তজ্জন্য রামায়ণে চন্দ্রকে রাবণের ছত্রধারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা বিধাতা বেদবক্তা; যেমন পিতা পুত্রগণকে ইতিহাসচ্ছলে উপদেশ দেন, সেইরূপ ব্রহ্মা পুত্রগণকে অর্থাৎ মানবগণকে বেদের উপদেশ দিয়া থাকেন। এই হেতু ব্রহ্মাকে লঙ্কায় শিশুপাঠনায় নিযুক্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। লঙ্কাস্থ জীবদিগকে ব্রাহ্মণ অথচ রাক্ষস বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহারা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এজন্য ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য; আর রাক্ষস পদে জগদ্ভক্ষক; অতএব জগদ্-গ্রাসিনী মহামায়ার উদরে জন্ম গ্রহণ জন্য রাক্ষস বলা হইয়াছে। কিঞ্চ, মহামোহ ও মহাতম, ইহারাও জগৎকে গ্রাস করিয়াছে, এপক্ষেও রাক্ষস শব্দের বাচ্য না হইবে কেন? বিশেষতঃ মহাতম কুম্ভকর্ণ সাক্ষাৎ অহঙ্কারমূর্ত্তি, অহঙ্কার জগদ্-গ্রাসক হয়, তজ্জন্যই কুম্ভকর্ণ, জন্মকালাবধি দেবতীর্য্যকে নর-অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদিকে গ্রাস করিয়াছিল; ইহা রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অহঙ্কার জগৎ-ব্যাপক, এজন্য

কুম্ভকর্ণকে বৃহদাকারে বর্ণনা করেন। স্বল্পাধার লঙ্কায় কুম্ভকর্ণ কিরূপে বাস করিয়াছিল ? —অজ্ঞেরা যে এই আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহার খণ্ডন এই যে, অল্পাধার লঙ্কাখ্যদেহে ত্রিলোক গ্রাস কর্ত্তা অহঙ্কার অবস্থিতি করিতেছে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে। ফলিতার্থ অহঙ্কারের তুল্য বৃহৎ পদার্থ ত্রিজগতে আর নাই। অহঙ্কারে উন্মত্ত হইলে জীবগণ সর্ব্বদা অভিভূত ও মূর্চ্ছিত থাকে। ইহা দেখাইবার জন্য অহঙ্কারের রূপ বর্ণনা করিয়া কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহঙ্কারী জীব জগৎকে তৃণতুল্য দেখে, ইহা রামায়ণে কুম্ভকর্ণের বক্তৃতাতেই প্রকাশ আঁছে।

মোহাকৃষ্ট ব্যক্তির সম্যক জ্ঞানের অপহরণ হয়; তজ্জন্যই মহামোহরূপ রাবণ কর্ত্তৃক জ্ঞানস্বরূপা মহাবিদ্যা সীতাহরণ ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। শরীরমধ্যে সন্তোষের নাম নন্দনবন, সেই নন্দন বনকেই এখানে অশোক বন বলেন। তাহাতেই বিদ্যার স্থিতি; কিন্তু মহামোহের দাসী স্বরূপা কুমতি, ঈর্ষা, অসূয়া, প্রভৃতি সেই সন্তোষ কাননে বিদ্যাকে মহামোহের বশে আনিবার নিমিত্ত সদাই উপদেশ দেয় এবং ভয়প্রদর্শনার্থ বিবিধ যন্ত্রণা-জালে আবৃত করে। এস্থলে, লঙ্কাদ্বীপে অশোক কাননে সীতাদেবী দুর্ম্মুখা, দুর্ম্মতি, ত্রিজটাদি চেড়ীগণ কর্ত্তৃক সতত রক্ষিতা ও ভৎসিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবেকপত্নী সুমতি কখন কখন বিবেকানুশাসনে জ্ঞানের উদ্দীপন করেন। এস্থলে বিভীষণানুমতিতে

তৎপত্নী সরমা অশোক বনে মধ্যে মধ্যে সীতার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, মহামোহে আকৃষ্ট হইলে জ্ঞানের অপহরণ হয় ও তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

জ্ঞান কাণ্ডে বিবেকের সহচর সাধন-চতুষ্টয়; বিভীষণেরও সুবাহু, সুমুখ, সুভদ্র, সুকেতু প্রভৃতি সচিব চতুষ্টয় ছিল। এক শরীরে মহামোহ ও বিবেক বাস করেন এবং ঐ উভয়ে এক মায়াগুণেই উৎপন্ন। এখানে বিভীষণ ও রাবণ উভয় সহোদরের এক লঙ্কাদ্বীপেই অধিবাস; কিন্তু উভয়ে অরিভাবাপন্ন ছিল। মহামোহ কেবল বিষয় দর্শন করে; বিবেক শুদ্ধ পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এখানে রাবণ সীতাসম্ভোগে মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু বিভীষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। মহামোহ সর্ব্বদাই বিবেকের পীড়াদায়ক, একারণ বিবেক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধন চতুষ্টয়ের সহিত অখণ্ড সুখপ্রদ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন; এস্থলে বিভীষণও রাবণ কর্ত্তৃক পদাঘাতে পীড্যমান হইয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অখণ্ড সুখপ্রদ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন। আসনাদি ষড়ঙ্গ যোগ বেদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি কারণ; অর্থাৎ আসন,প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ষড়ঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের সাধন। এখানেও ষড়ঙ্গ যোগরূপ সুগ্রীবাদি ছয় কপি, বিদ্যারূপা সীতার উদ্ধারের প্রতি কারণ বা সাধন হইয়া

ছলেন। যেমন ষড়ঙ্গ যোগযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাত্মক দোষ রাশির বিনাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তি সীতার উদ্ধারের প্রতি বিঘ্নবৎ রাক্ষস সমূহ ঐ কপিকুল দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। একাগ্রচিত্ততার নাম সমাধি, অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অভেদ ভাবনাকে সমাধি কহে। এস্থলে সুগ্রীব নামক কপি সমাধিস্থানীয় বলিতে হইবে। কারণ সুগ্রীবে ও রামে অভেদ্য ভাব ছিল। যিনি নল, তিনি আসন-স্থানীয়। আসনস্থ যোগীর আসনই ভবসমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ; একারণ নল দ্বারা সেতু-বন্ধন প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। অগ্নিস্বরূপ নীলবানর প্রত্যাহার স্থানীয়। যে সাধক প্রত্যাহারপরায়ণ হয়, সে মহামোহের শিরোপরি পদাঘাত করিতে সক্ষম, একারণ নীল বানর রাবণের দশ-শিরোপরি পদাঘাত এবং শক্রমূত্রাদি ত্যাগ করিয়াছিল,—রামায়ণে ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। পবনপুত্র হনুমান প্রাণায়াম স্বরূপ। প্রাণায়ামের অপরিসীম ক্ষমতা।

"প্রাণায়ামৈর্দহে দোষানিত্যাদি শ্রুতয়ঃ।"

প্রণায়াম দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাবরোধক দোষ সকল দগ্ধ হয়।

একারণ জ্ঞানশক্তি সীতার রোধক রাক্ষসচয়ের বিনাশ জন্য হনুমান প্রথমেই লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিলেন। বিনা প্রাণায়ামে কখনই জন্ম-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান পদবী দর্শন করিতে পারে না; এই হেতু প্রাণায়াম যোগস্বরূপ হনুমান শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে লঙ্ঘন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ সীতার উদ্দেশ

করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামী ব্যক্তিই যে পরমাত্মার বিশেষ পরিজ্ঞাত অর্থাৎ অনুগৃহীত ও সুবর্ণত্রয়মিলিত প্রণবই যে পরমাত্মার স্বীয় ধন, ইহা জানাইবার জন্য পরম-রাম-ভক্ত হনূমান চিহ্নার্থ রামের সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক লইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাত্মপক্ষে সুবর্ণ শব্দে প্রকৃত স্বর্ণ নহে; শোভন বর্ণকে সুবর্ণ বলে। এস্থলে অকার, উকার ও মকার এই সুবর্ণত্রয় মিলিত হইয়া প্রণব রূপ অঙ্গুরীয়ক উৎপাদন করে। ঐ প্রণব প্রাণায়াম-জপসংখ্যার বীজ, এবং প্রণবাবলম্বী ব্যক্তিই পরমাত্মার স্বীয় জন; একারণ শ্রীরামের অঙ্গুরীয়ক দৃষ্টে সীতা দেবী হনূমানকে রামের নিজজন বলিয়া জানিয়াছিলেন। অঙ্গদ কপি ধারণা-যোগ-স্বরূপ। ধারণা যোগের নিকট মহা- মোহ নিরন্তর তিরস্কৃত থাকে; এস্থলে লঙ্কার মধ্যে অঙ্গদ কর্ত্তৃক অপহৃত-মুকুট রাবণ তিরস্কৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- ছিল। ধ্যান-যোগীর শরীরে কোন রোগোৎপত্তি হয় না, হইলেও তাহা ধ্যান প্রভাবে বিনষ্ট হয়; তজ্জন্য রামায়ণে ধ্যান-যোগ-স্বরূপ সুসেন বানরকে বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করি- য়াছেন। যক্ষরাজ জাম্ববান অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে ধীযোগ- স্বরূপ। মেধাবী যোগীর নিকট মহামোহাদির মন্ত্রকৌশল বিফল হইয়া যায়; এস্থলে জাম্ববান মন্ত্রিকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, যে হেতু তত্তুল্য বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। মহামোহের শক্তিতে জীবের হৃদয় বিদ্ধ হয় এবং জীবগণ সেই বেদনায় অভিভূত থাকে; এখানে

সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধহৃদয় হইয়া মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অপরন্তু মহামোহ হইতে উৎপন্ন লোভ অতি বলিষ্ঠ, তাহার নিকট সকলেই পরাজিত— অন্যে পরে কা কথা, দেবাদিদেব দেবরাজ ইন্দ্রও লোভের নিকট পরাজিত আছেন। তজ্জন্য লোভস্বরূপ রাবণের পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রজিত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেহী মাত্রের দেহেই লোভ আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান জীব তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলেই লোভের পরাজয় গণ্য হয়; এস্থলে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণে উক্ত হইয়াছে। মায়াত্মজা নিকৃতি কলহরূপিণী। যাহার দেহে তাহার অধিষ্ঠান হয়, সে দেহীর নিরন্তর কলহ দ্বারা শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং সেই শত্রু দ্বারা পরিণামে সকলই বিনাশ পায়; 'এখানে নিকৃতিরূপিণী সূর্পনখা ভেদ প্রদর্শন দ্বারা রাম-রাবণে বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিল; সেই বিরোধ জন্য লঙ্কাপতি রাবণ সমস্ত রাক্ষসকুলের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিল। মহামোহ সংস্রবে হিরণ্যস্বরূপ জ্ঞানেরও মলিনতা জন্মে; কিন্তু যোগাগ্নি জ্বালিতে পারিলে তাহার সে মলিনতা দূর হয়,—ইহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র রাবণগৃহস্থা জ্ঞান-শক্তি সীতাকে উদ্ধার করিয়াও অগ্নিতে পরীক্ষা লইয়াছিলেন। ভগবৎকৃপা ভিন্ন যে মহামোহ ও মহাতমঃ বিনষ্ট হয় না, সেই পরমতত্ত্ব জানাইবার জন্য

পরমাত্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র অবতার হইয়া রাবণ কুম্ভকর্ণাদিকে বিনাশ পূর্ব্বক জ্ঞানশক্তির সহিত এবং জীবাত্মস্বরূপ লক্ষ্মণের সহিত স্বধামে গমন করিয়াছিলেন। স্বধাম পদে এস্থলে—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

সেই বিষ্ণুর পরম পদ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

রামাবতার-ঘটিত প্রস্তাবের সার মর্ম্ম এই। তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী হইলে, মোহ বা তমঃ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে মোহ বা অহঙ্কারের অধিবাস হয় না; ইহাই রামায়ণের নিগূঢ় মর্ম্ম। এই বৃত্তান্তকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞজনে মনে মনে কত প্রকার কুতর্ক ও সন্দেহ উপস্থিত করে; কিন্তু সুসমাহিত-চিত্ত সাধক ব্যক্তি এই রূপকাত্মক পরম তত্ত্বঘটিত রামাবতার বৃত্তান্ত মনন ও অনুষ্ঠান করিয়া মনে মনে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হন

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহারাসের মর্ম্ম।

মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি যতই সূক্ষ্ম হউক না, ঐশ্বরিক জগতের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান দ্বারা যতই অভিজ্ঞতা লাভ হউক না, তথাপি পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি মানব, ঐশ্বরিক কার্য্যকলাপের সর্ব্বতোভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবে, ইহা বিবেচক ব্যক্তিদিগের কল্পনাপথেও উপস্থিত হয় না। পক্ষান্তরে বিচাররহিত অন্ধ-সংস্কার দ্বারা ধর্ম্মালোচনাও বিধেয়—বলিয়া

গণ্য হয় নাই। এই নিমিত্ত ঐশ্বরিক অবতার স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাঘটিত ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম যে পরিমাণে অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

সংসারে যখন এরূপ কোন বিপত্তি উপস্থিত হয় যে, মানবজাতি তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ নহে, তখন সর্ব্বসামঞ্জস্যকারী জগদীশ্বর কোনরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক সংসারকে অনিবার্য্য বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন; শাস্ত্রে এ বিষয়ের বহুতর প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

" পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ "

(ভগবদ্গীতা উপনিষৎ)

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন)—সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিমান্ ব্যক্তিদিগের বিনাশ, এতাবতা ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই মূর্ত্তিমান জীবের ন্যায় ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যকতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।

(বেদান্তং)

আত্মা সর্ব্বগত, অনির্ব্বচনীয়, নিরীহ, নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার। কিন্তু তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহকালে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় লীলা করেন।

অপিচ।

"মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ।
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ॥
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলাপহাং।
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ॥
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে।
তত্তৎ কামোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ।

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

অজ্ঞানাপন্ন জন সকল মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছে। ইহাদিগের পরমাত্ম তত্ত্ব জানিবার কোন ক্ষমতা নাই। ইহারা কিরূপে মুক্ত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু রাম নাম ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যরূপে অবতার হইয়া সর্ব্বলোকের মানস-মলা পাপরাশির অপহরণের নিমিত্ত মনুষ্যচেষ্টা সমূহ দ্বারা লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত তৎকার্য্যের উপযোগী ক্রোধ, মোহ ও কামাদি অবলম্বন করিয়া অবশীভূত ব্যক্তিদিগকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধি—এই হেতু প্রদর্শন দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, রাম তাহার কোন কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন না; তিনি গগনসদৃশ নির্ম্মল।

সেই রূপ ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণও লোক পরিত্রাণার্থ নানা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও আকাশবৎ নির্ম্মল, তাঁহার রাসাদি লীলা দ্বারা সাংসারিক ও তত্ত্বজ্ঞান ঘটিত বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ে তাঁহার যে বিকারিত্ব তাহা সম্পূর্ণ ভাক্ত। তিনি সংসারধর্ম্মের উপদেশচ্ছলে

দ্বারকালীলা ও পরমাত্মতত্ত্বোপদেশচ্ছলে ব্রজলীলা প্রকটন করিয়াছেন।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলাতে গোপীশৃঙ্গার দ্বারা পরদারামর্ষণজ পাপ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাকে কিরূপে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে? অন্যে পরে কা কথা,—পরীক্ষিতেরই এবিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদিও কোন কার্য্য লৌকিক রীতি বিরুদ্ধ বোধ হয়, তথাপি তাহাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অবতার হানি হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের পাপ পুণ্য কি? তিনি সকলেই আছেন, তাঁহাতেই সকল আছে; ঈশ্বরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার নাই। প্রাকৃত লোকবৎ সদসৎ আচার দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যে যেমন দোষারোপ করা যায়, ঈশ্বরে সেরূপ দোষ বর্ত্তেনা। যথা,

"বুদ্ধাদ্বৈতস্য তত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শূনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কোভেদোঽশুচিভক্ষণে॥"

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান হইলেও যদি যথেষ্টাচরণ বাসনা হয়, তবে অশুচিভুক কুক্কুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর বিশেষ কি থাকিল? প্রকৃতপক্ষেও এতাদৃশ দৃষ্টান্ত ঈশ্বরাবতার শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণাদিতে কোনমতে বর্ত্তিতে পারে না। এ দোষ জ্ঞানসাধক ব্যক্তি বিশেষে সম্ভব হয়। যে পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বিরাজমান, তাঁহার শুচি অশুচি কি? যিনি বিষ্ঠাসঞ্জাত কৃমিরও অন্তরাত্মা, তাঁহার আবার অশুচি ভক্ষণ বিষয়ে বাধা

কি থাকিল ? পরমাত্মা সর্ব্বকারণস্বরূপ, সমস্ত-কার্য্য-স্বরূপ, তিনি সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা মহেশ্বর ও সর্ব্ব ঈশান। সুতরাং ঐরূপ সামান্য ব্যতিক্রম দ্বারা কি তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে ? যে স্থলে সকল শ্রুতি, সকল স্মৃতি ও সকল সংহিতাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে স্থলে মূর্ত্তি গ্রহণের আনুষঙ্গিক দুই একটী সাংসারিক ব্যবহারের দোষানুসন্ধান করিয়া তদীয় অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

"তস্যোদিতির্নাম সত্রষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য
উদিত উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ স এবং বেদ"।

(ইতি ছন্দোগ্য-উপনিষৎ)

স্বপ্রকাশ দেব পরমাত্মা পরম পুরুষ সকল পাপের সহিত অর্থাৎ পাপকার্য্যের সহিত উদিত হয়েন, সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে অঙ্গীকার করেন ; কিন্তু তাঁহাতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না।

বেদে আত্মাকে "অপহতপাপ" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তিনি সকল শুভাশুভ কার্য্যের উৎপাদক, সংস্থাপক এবং সংহারক হয়েন ; অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে শুভাশুভ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া যে সাধক তাঁহাকে নির্লিপ্ত জানে, সেই বেদজ্ঞ। তাহাতে কোন পাপ স্পর্শ হয় না। যেমন সূর্য্যদেব সকল শুভাশুভ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত, আত্মাও তদ্রূপ শুভাশুভ কার্য্যে লিপ্তবৎ থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন।

ফলিতার্থে ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন। ইহাতে আশঙ্কা মাত্র নাই। পাপকার্য্য যে দেবতাদিগের প্রতি বর্ত্তে না, শ্রুতিশাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকৈকচক্ষু
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে শোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

যেমন সর্ব্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ সূর্য্যদেব স্বকর বিস্তারে এতজ্জগতে চাক্ষুষ পবিত্রাপবিত্র সকল বস্তু স্পর্শন করিয়াও মনুষ্যবৎ অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা এক পরমাত্মা শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন। তদর্থে রাসপঞ্চাধ্যায়ে পরীক্ষিৎ-প্রশ্নে শুক-দেব কহেন,—

"ধর্ম্ম ব্যতিক্রমোদৃষ্ট
ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায়
বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে কার্য্য ও কর্ম্মাদিতে লিপ্ত বিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে মূর্খতাই প্রকাশ পায়। যিনি মৃত পুত্রকে জীবিতরূপে আনয়ন দ্বারা সান্দীপনীকে সান্ত্বনা করেন, যিনি বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জ্জু-নের মোহ বিধ্বংস করেন, যিনি যশোদাকে নিজ বদনে

ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করান এবং যিনি রাসস্থলে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করেন ও শত কোটি স্ত্রীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাকে কদর্য্যাচারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, হতজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয়। যখন “ নিত্যং সদসদাত্মকং ” বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববেদে উক্ত করিয়াছেন, তখন আত্মাতে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম প্রোথিত আছে, ইহাতে সংশয় কি ? কিন্তু যদি আত্মাতে কেবল শুভকর্ম্মাচরণের অবস্থিতি, কোন মতে অশুভ কর্ম্মের অবস্থান নাই,—এরূপ বোধ করা যায়, তবে অশুভকর্ম্ম সকলের অবস্থান কোথায় ? ফলতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা একবারে পরমেশ্বরের অদ্বৈততা খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সেরূপ হইলে পাপ-কর্ম্মের উৎপাদকরূপে পরমেশ্বরান্তর মান্য করিতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে পুণ্যবানের আত্মা স্বতন্ত্র, পাপাত্মার আত্মা স্বতন্ত্র,—কল্পনা করিতে হয় ; অর্থাৎ বিট্‌ক্রিমি প্রভৃতি নিকৃষ্টাচারী জীব ও পবিত্রাচারী ব্যক্তির ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হন, এরূপ স্বীকার করিতে হয়। তাহাহইলে যে কত প্রকার বিপ্লুত ভাবের উদয় হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে। অতএব এক পরমাত্মাতে অগ্নি ও তন্নির্ব্বাপক জল, অমৃত এবং বিষ, হিংস্রকতা ও অহিংস্রকতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অজিতেন্দ্রিয়তাদি শুভাশুভ সকল কর্ম্মই অবস্থিতি করে ; কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত নহেন ; এইরূপ মীমাংসাই যারপর নাই যুক্তিসঙ্গত। ফলিতার্থ উভয়াত্মক ঈশ্বর, এই জ্ঞানই মোক্ষের পরম কারণ। ইহা

দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সদসৎকার্য্য পরিগ্রহ করিয়া আপনার অখণ্ডতা বোধ করাইয়াছেন।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, ঈশ্বরের পক্ষে শুভাশুভ সকল কার্য্য সমান হইলেও, উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা সংসারের হিতসাধনের চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত জঘন্য শৃঙ্গাররস অবলম্বন পূর্ব্বক হিতসাধনের চেষ্টা পাইলেন ?

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ভাগবতের রাসলীলা-বিষয়ক বর্ণনার মধ্যেই এতাদৃশ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে,—

"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥"

অর্থ। ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্তই জগদীশ্বর আপন অংশদ্বারা অবতীর্ণ হয়েন। সেই ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া কিরূপে পরদারাভিমর্ষণ রূপ প্রতিকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন ?

তদুত্তরে পরম জ্ঞানী শুকদেব বলিয়াছেন যে,—

মূল।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

টীকা।

"শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসো বহির্মুখানপি
স্বপরান্ কর্তুমিতি ভাবঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ।

শৃঙ্গাররসের সম্ভোগ ঈশ্বরের প্রয়োজন নহে। যাহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, সুতরাং যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ তাহাদিগকেও ঐ জঘন্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মপথে আনয়ন করাই শৃঙ্গার রস অবলম্বনের উদ্দেশ্য।

অপরন্তু মহৎ লোকে যেরূপ আচরণ করেন, সামান্য-লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ়তাৎপর্য্য না বুঝিয়া লোকে ঐরূপ আচরণ দ্বারা উচ্ছিন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিত হইয়াছে যে,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

তাৎপর্য্য।

সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর মানবের অগোচর উদ্দেশ্য সাধনার্থ এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া অল্পশক্তি মনুষ্যগণ তাহা করিবেন না। এমন কি, মনেও কল্পনা করিবেন না। কারণ ভগবান রুদ্রদেব যেরূপ শক্তিদ্বারা যেরূপ উদ্দেশে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল পান করিয়াছিলেন, তাদৃশ শক্তিও তাদৃশ উদ্দেশ্য সহিত মনুষ্যগণ বিষপান করিলে যেমন

উচ্ছিন্ন হইবে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঐশ্বরিক শক্তি রহিত মানবগণ কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে রাস ক্রীড়াদির অনুকরণ করিলে উচ্ছিন্ন হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদিগকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিবার বিষয়ে শৃঙ্গার রসের অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন, তাহারদিগকে তাৎপর্য্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

শৃঙ্গার করুণা ইত্যাদি ছয়টী রস মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিতি করে।

কোনস্থানে কোন্ রসের অবস্থান, তাহারও নির্ণয় আছে। যথা—

শৃঙ্গারং শিরসি জ্ঞেয়ং
ক্রোধমাজ্ঞাপুরে তথা।
বিশুদ্ধাখ্যেতু করুণাং
হৃদি ভীষণমেবচ ॥
মণিপূরেঽদ্ভুতং হাস্যং
স্বাধিষ্ঠানে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

ইত্যাদি।

মস্তকে শৃঙ্গার রসের স্থান, ভ্রূদলে রৌদ্ররস, কণ্ঠস্থানে করুণরস, হৃদয়ে ভয়ানক রস, নাভিমণ্ডলে অদ্ভুতরস ও লিঙ্গমূলে হাস্যরস ইত্যাদি।

অতএব সহস্রারস্থিত আত্মতত্ত্বকে শৃঙ্গার রসভাবে প্রকাশাভিপ্রায়ে শৃঙ্গারোদ্দীপন রাসলীলা প্রকাশ হয়। ইহা-

রই নাম মধুর ভাব। মধুর ভাবেই সকল ভাব সিদ্ধ হয়। যেহেতু, আপাদতল পর্য্যন্ত সমস্তাবয়ব এক মস্তকের অধীন, তজ্জন্য শাস্ত্রে মধুরভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বই শ্রেষ্ঠ হয়। এস্থলে স্ত্রী-সম্ভোগকে মধুর রস বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, এমত তাৎ-পর্য্য নহে। আত্মাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে উপাসনা করিবার যে অনুশাসন আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য জানিতে পারিলেই ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তির শান্তি হয়। শান্তভাবের অর্থ ঐকান্তিকী নিষ্ঠা; দাস্যের অর্থ সেবা করণ; সখ্যের অর্থ সমতা অর্থাৎ সমাধি-যোগ; বাৎসল্যের অর্থ স্নেহ; মধুরের অর্থ আত্ম নিবেদন। সুতরাং আত্মশরীর পরমাত্মাতে সমর্পণ করার নাম শৃঙ্গার-ভাব। অতএব যে সাধক আত্মাতে আত্মসমর্পণ করে, সে তন্ময় হয়। ইহা উপদেশ দিবার নিমিত্তই ভগবচ্ছক্তি শ্রীরাধিকা রাসাবেশে পরতত্ত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞানশক্তি পরা প্রকৃতির শাখা, অনসূয়া, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া, শান্তি, ধৃতি, স্মৃতি ও মেধা এই অষ্ট মাতৃকা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র সংখ্যায় পরিগণিত। এ দিকে নিবৃত্তি-মার্গস্থা পরাশক্তি রাধিকারও বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, ইন্দু-রেখা, তুঙ্গবিদ্যা, চিত্রা, চম্পকলতা, অশোকা ইত্যাদি ষোড়শ সহস্র গোপীসংখ্যারূপে গণ্যা। যিনি বৃন্দা, তিনি অনসূয়া, অর্থাৎ তাঁহাতে অসূয়া নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণ মিলনে

সকলের সম্যক গুণ বর্ণনাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যিনি বিশাখা, তিনিই ক্ষমা, যেহেতু এক মাত্র উত্তমা শাক্তিই ক্ষমা-পদবাচ্যা। তাহার অন্য সহায় নাই, বিশাখাও উভয়ের শান্তি বিধান করেন, অন্যা গোপীর সাহায্য অপেক্ষা করেন না। যিনি ললিতা, তিনি অহিংসা ; যে হেতু ললিতা গোপীর দ্বেষপৈশুন্য ছিল না। যিনি ইন্দুরেখা, তিনিই দয়া ; কারণ চন্দ্রমণ্ডলস্থা নাদশক্তি অর্থাৎ দয়া সমস্ত জীবে সুধাবর্ষণ করিয়া শীতলতা প্রদান করেন; ইন্দুরেখাও সুধাবর্ষণবৎ মিষ্ট-ভাষা প্রয়োগে সকলের চিত্ত শীতল করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে অপরা শক্তি অবিদ্যা; তিনি আপন শাখাস্বরূপ ঈর্ষা, অসূয়া, অক্ষমা, হিংসা, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্নতি ও রতি প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র বৃত্তির সহিত সহস্রারস্থ পরমাত্মাকে প্রবৃত্তিরূপ আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে প্রবৃত্তি-মার্গস্থা অপরা প্রকৃতি চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপীও চন্দ্রা-বতী, চন্দ্রমালা, প্রিয়চন্দ্রা, মধুমতী, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রমাতুলী, সুন্দরী ইত্যাদি সখীগণ সহিত বিদ্যাঙ্গের বিপরীত-বর্ত্তিনী হয়েন। সুতরাং এক আত্মাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত, উভ-য়েই পরস্পর বিপরীত পথে গমন করেন। যেমন নিষ্কাম কর্ম্মের অনুগামিনী পরা বিদ্যা নিরন্তর আত্মরসে ক্রীড়মানা, সেইরূপ অপরা বিদ্যাও সকাম কর্ম্মমার্গে স্থিতি করিয়া কদা-চিৎ খণ্ড-সুখার্থ আত্মাকে লাভ করেন। যদ্রূপ পরাশক্তি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনাতে অন্তরঙ্গ-রসে নিয়ত কৃষ্ণসন্নি-

ধিতে বাস করিতেছেন, তদ্রূপ অপরাশক্তি চন্দ্রাবলীও আত্ম-সুখাভিলাষে রাধিকার অনবলোকনে কদাচিৎ কৃষ্ণ-সম্ভোগ করেন।

অপরন্তু দ্বারকাবাসিনী অপরাশক্তি-সমাশ্রিতা মহিষীগণও যে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রাদি সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সকামসাধক-গণ নানা কর্ম্মের সমাচরণ করিয়া আত্মার প্রসন্নতাতে নানাবিধ সংসারোচিত খণ্ড সুখ-ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মহিষীগণের প্রেমভক্তির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ আত্মা ভিন্ন কেহই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। যে হেতু শ্রুতি শাস্ত্রে আত্মাকে "সর্ব্বকামপূর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

যিনি এক, কিন্তু বহুজনের বহুবিধ কামনা পূরণ করেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপে ভাবনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

আত্মাকে যেমন কামী বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও এক হইয়া অনেকের অনেক কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে কামে লিপ্ত বলা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মতা খণ্ডনও হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে দ্বারকাদি-লীলা যাহা বর্ণিত হইয়াছে; সে সমস্তই মায়ার কার্য্য; শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই। লৌকি-

কাচারেও রাসস্থলে ইন্দ্রজাল খাটাইয়া থাকে; সুতরাং রাস-নাট্য যে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি অনন্তাখ্য সঙ্কর্ষণ তিনিই জীব, এখানে তাঁহাকে বলরাম বলে। তিনি সখাভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সহ ক্রীড়া, করেন। শ্রীদামাদি অন্যান্য গোপসকল শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন। উদ্ধব-অক্রূর প্রভৃতি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। আত্মতত্ত্ববিরোধী অসুরবৎ কেশী-কংস-মুর-নরকাদি মহামোহাদি স্বরূপ। মায়াত্মজা পূতনা নিকৃতি স্বরূপ। নন্দকে দ্রোণবসু বলাতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রতিপালক বলা হইয়াছে। কারণ (গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণ) সুতরাং গোপশব্দে ধর্ম্মরক্ষা-পরায়ণ। যশোদা ধরা, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়-ভূতা, ইত্যর্থেই তাঁহাকে নন্দ-পত্নী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয়, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দালয়ে উদয় হইয়াছিলেন। সকাম সাধন ফলেও প্রথমতঃ ক্লেশ পাইয়া পরিণামে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়; তদ্দৃষ্টান্ত এই যে, বসুদেব ও দৈবকী বহুক্লেশ সহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

বলাসন অর্থাৎ কফ, আত্মতত্ত্ব-বিদ্বেষকারী ভুজঙ্গ স্বরূপ। উহা পিঙ্গলা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া প্রাণায়াম-যোগ-বিঘ্ন দ্বারা পিঙ্গলাকে বিদূষিতা করে; কিন্তু সাধকের মানসে আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়া সেই বিষবৎ বিঘ্নস্বরূপ বলাসনকে দ্বীপান্তরে দূরীকৃত করেন; অর্থাৎ সেই ভুজঙ্গ রমণক দ্বীপবৎ

অসাধক ব্যক্তির হৃদয়কেই আশ্রয় করে। ইহা জানাইবার নিমিত্ত "কালীয় দমন" ব্যাপারের সংঘটন হইয়াছে। এস্থলে যোগবিঘ্নবিষ কফ, কালীয় হৃদয়, পিঙ্গলা যমুনা ; পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ; রমণক দ্বীপ অসাধু-হৃদয় ইত্যাদি স্ফুটীকৃত হইয়াছে। অতএব রূপকাচ্ছাদনের অপনয়ন করিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা, তাহাতে বিচক্ষণ সাধকের কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

বাহ্যে বৃন্দাবন, রাসমণ্ডল ও গোপীগণ এ সকলই অধ্যাত্মবিষয়াক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ ভগবান্ নারায়ণমনুষ্যশরীরস্থ তাবৎ তত্ত্ব পরিজ্ঞাপনার্থ রাসলীলা ব্যাজে মানবশরীরকে বাহ্যে বৃন্দাবনধাম রূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্য মাত্রকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"আমার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবের সাধ্য নহে, আমার এই মাধুর্য্য-লীলা শ্রবণে জীবগণ কৃতার্থ হইবে।" ইত্যভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাশক্তি রাধিকায় প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। সেই পরাশক্তি রাধিকাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। চিন্ময়, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিরীহ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই। তিনি নির্লিপ্ত, অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মলস্বরূপ। যেমন স্বচ্ছস্ফটিক-সন্নিধানে রক্তবর্ণ কোন বস্তু থাকিলে তাহার রক্তিমাতে তৎকালে অতিশুদ্ধ স্ফটিককেও রক্তবর্ণ বোধ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। রাসলীলাস্থলে লিখিত হইয়াছে যে,—

" যোগমায়া মুপাশ্রিত । "

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াতে সমাশ্রিত হইয়া রাসলীলা করিয়াছেন।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব নাই; কেবল যোগমায়াই সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যোগমায়া-বিলসিত রাসাদি লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। তথাহি, যেমন নটদিগের রঙ্গভূমিতে মায়া অর্থাৎ ভেল্‌কী দ্বারা অস্বরূপে স্বরূপবৎ দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাসস্থলে মহানটী যোগমায়া রঙ্গভূমি সাজাইয়া আপনকৃত লীলাকার্য্য-সকল শ্রীকৃষ্ণ করিলেন, ইহাই সর্ব্বলোককে জানাইয়াছিলেন। ঐ যোগমায়া রাধিকা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জীবশরীরে শিরোঽবস্থিত সহস্রদল-পদ্ম গোলোকাখ্য মহদ্ধাম। পরমাত্মা তাহাতেই নিত্য রাস করিতেছেন। সমস্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে রাস হইবার তাৎপর্য্য এই যে ;—প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি-পরিমাণ। যাবৎ প্রলয় না হয়, তাবৎ রাস হইতেছে। তজ্জন্যই ভাগবতে লিখিত হইয়াছে, যে,—

" ভগবানপি তা রাত্রীঃ। "

ভগবান্‌ও সেই সকল রাত্রি (এইরূপে অতিবাহন করিলেন) শাস্ত্রে একবিধ যাবতীয় জীবের কলেবর নাশকালকে প্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং রাসক্রিয়ার কাল, কোটি কোটি ব্রহ্মরাত্রি বুঝাইতেছে এবং রাসেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" এই বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবশক্তি সকলে স্ব স্ব দেবের দেহমধ্যে বিলীন হইলেন। কিন্তু অপর জীবের শরীরে রাসের বিরাম নাই। লীলা শব্দে প্রাকৃত লোকেরা যে, প্রাকৃত শৃঙ্গারাদি ক্রিয়াপর রাসলীলা বর্ণন করে, স্বরূপতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে তাহা সহে। নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে গুণবৎ ক্রিয়ার বর্ণন, তাহা ভাক্ত—

"ঈক্ষিতে র্না শব্দঃ।"

বেদান্তম্।)

তাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মচিন্তকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন যে, প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্রী এবং প্রকৃতিই সর্ব্ব জীবের বন্ধন-মোচনী হয়েন। একারণ, পরমাপ্রকৃতি যেমন জীবদিগকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, তেমনই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত বাহ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া উপদেশ দিতেছেন; অর্থাৎ পরমাত্মাকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে সাজাইয়া রাস-বিলাসাদি নানা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল লীলার কথা শ্রবণ মননে জীবের পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য পুরাণাদিতে শ্রীবৃন্দাবনকে গোলকের ছায়া বলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনধাম শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলাখ্য গোলোকমণ্ডলের প্রতিবিম্বস্বরূপ। যথা,—

"সহস্রপত্র কমলং ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলং।"

(পদ্মপুরাণং।)

মাথুর মণ্ডলকে সহস্রদল কমলবৎ চিন্তা করিতে হইবে। যদ্রূপ শিরঃসহস্রপত্রের দল সকল অধোমুখ, তদ্রূপ বৃন্দাবনস্থ তরুগণেরও শাখা সকল অধোমুখী। যথা,—

" বৃন্দাবনস্থা স্তরবঃ সর্ব্বে চাধোমুখোঃ স্মৃতা। "

যেমন শিরস্থিত অধোমুখ কমলাভ্যন্তরস্থ দ্বাদশ দল পদ্মান্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান, তদ্রূপ বৃন্দাবন মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসনরূপ দ্বাদশ বন আছে। তথাহি—

" ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্ন মবদাত মদ্ভূতং।
কুণ্ডলী-বিবরকাণ্ড-মণ্ডিত দ্বাদশার্ণ সরসীরুহং ভজে॥ "

ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রদল কমলোদরে নিত্যলগ্ন পরম বিশদ বর্ণ, অত্যদ্ভুত শোভাবিশিষ্ট এবং কুণ্ডলীশক্তির বিবর কাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা দ্বারা মণ্ডিত দ্বাদশদল পদ্মকে আমি ভজনা করি। কারণ তথায় আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান হয়।

বৃন্দাবনেও সহস্রবন মধ্যে দ্বাদশ বন প্রধান আছে; তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান। যথা—

দ্বাদশৈব বনী-সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাপি গুহ্য মুত্তমং॥
অন্যোচ্চো পবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়াবস স্থলং॥

(পদ্মপুরাণম্।)

প্রধান বনসংখ্যা দ্বাদশটী। যমুনার পশ্চিমে সাত, পূর্ব্বে

পাঁচ। তাহাতে অতি গোপনীয় পরমোত্তম তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ অতি গূঢ়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান তাহাতে আছে। অন্য যে সকল উপবন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-রসের স্থান।

পৌর্ণমাসী দেবী সেই বৃন্দাবনাখ্য পদ্মের মূলকাণ্ড হয়েন। যদ্রূপ সহস্রার-মধ্যে শিরঃস্থিতাখ্য বিরজা-শংখিনী-নাড়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অকথাদি ত্রিরেখারূপে বিদ্যমান, তদ্রূপ বৃন্দাবনে যমুনাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। পরমাত্মা যেমন সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ উরু শক্তিতে পরিবেষ্টিত, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ উরুশক্তিমান, বৃন্দাবনে গোপীগণে মণ্ডিত। আত্মা যেমন কোন কার্য্যই করেন না, প্রকৃতি হইতে সকলই হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ কিছুই করেন নাই, গোপীরাই সকল কার্য্য করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকেরাই বলে যে, শ্রীকৃষ্ণ নরবৎ নানা লীলা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শক্তিগণকে এই নিমিত্ত গোপিকা বলা যায় যে,—গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণ; সকলকে যে প্রকৃতি রক্ষা করেন; তাঁহার নাম গোপিকা। নতুবা সামান্য গোপপত্নী বলিয়া গোপিকা বলা হয় নাই। আত্মার সত্তায় জগৎ রক্ষিত হইয়াছে, এনিমিত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বেশে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ জীব-শরীরে আত্মার ও শক্তিগণের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত শরীর রক্ষা হইতেছে। কান্তি, শান্তি, ক্ষান্তি, দয়া, মেধা, স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্নতি প্রভৃতি শরীর-রক্ষণকারিণী শক্তিসকল গোপীরূপা;

আর আত্মা গোপ-স্বরূপ। এই সকল শক্তির অধিদেব রূপে একরূপী আত্মা বহুরূপে শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত; এজন্য ঐ ঐ শক্তির পতিগণকে গোপ বলিয়া শক্তিগণকে গোপীনামে উক্ত করিয়াছেন; এ নিমিত্ত রাস-পঞ্চাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে,

"যথা শিশুঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ," ইত্যাদি।

বালক যেমন আত্ম প্রতিবিম্বকে দ্বিতীয়-ব্যক্তি-ভ্রমে ক্রীড়া করে, এখানেও সেইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

নিত্যসিদ্ধা রাধাশক্তি পরাপ্রকৃতি। তিনি নিত্য আত্মার সন্নিহিতই আছেন; ইহা জানাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে যে,

"বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে"

সকল প্রকৃতি হইতে অন্তর হইলেও আত্মা পরাপ্রকৃতির নিকট থাকেন; একারণ আত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করেন। আবার প্রকৃতি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা দেখাইবার জন্য অনন্তর রাধিকাকেও ত্যাগ করেন; কিন্তু প্রকৃতি নিকটে না থাকিলে যে আত্মার নির্দ্দেশ হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া একবারে অদর্শন হন; অর্থাৎ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর প্রকাশ থাকে না।

রাধা যে স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়া ছিলেন, তদভিপ্রায় এই যে, মায়াপ্রকৃতি সমীপস্থ আত্মার বশবর্ত্তিনী;

কিন্তু তিনি কখনই আত্মাকে আক্রমণ করিয়া আত্মবশে আনিতে পারেন না; অর্থাৎ আত্মাতে মায়ার স্পর্শ হয় না; ইহা ভ্রান্ত লোক সকলকে দেখাইবার জন্য "তুমি স্কন্ধে আরোহণ করহ" বলিয়া ভগবান অদর্শন হয়েন। এতাবতা প্রকৃতির পর পরমাত্মা, ইহাই জানাইয়া দিলেন।

কিঞ্চ,

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্ত মখণ্ডমণ্ডলং"

পরমাত্মা শিরঃস্থ সহস্রদল পদ্মে নির্ম্মল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ উরুশক্তিক; তাঁহার সন্নিহিত রক্তশক্তির আভাতে সমস্ত শরীর অনুভাসিত হওয়াতে ভ্রুদলস্থ সুপূর্ণ শশিমণ্ডলও অরুণাভ হইয়াছে, এবং ভবাটবীও অনুরঞ্জিত হইয়াছে; ইহার অভিপ্রায় এই যে, আপাদতল মস্তকাদি সমস্ত স্থানেই চন্দ্রের কিরণ পাত হইতেছে। চন্দ্র শব্দে সন্তোষের আহরণ করিতে হইবে। যখন নিবৃত্তি-মার্গস্থা আতমোরঞ্জিনী পরা প্রকৃতির প্রতিভাতে সাধকের সমস্ত শরীর অনুরঞ্জিত হয়, তখনি সাধকের ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত বৃত্তির আত্মাতে রমণ করিতে ইচ্ছা জন্মে; তন্নিমিত্তই "রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং" বলিয়া বর্ণন করেন।

আত্মাভিলাষবতী প্রকৃতি ও পরমাত্মার নাদ-স্বরূপ মনোহর প্রণব-ধ্বনিতে সাধকের শরীরস্থা বৃত্তি সকল প্রকৃতি ও আত্মার সন্নিকর্ষে আকৃষ্টা হয়। যাহাদিগের মন পরতত্ত্বাভিলাষে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের চিত্তকে নাদরূপ প্রণব

আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ প্রণব-স্বর যেমন সুমধুর, তেমন মধুর স্বর আর কিছুই নাই। এক প্রণব শব্দ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; এবং ভাগবতে "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাসস্থলে বংশিধ্বনি হইয়াছিল, এমত প্রসঙ্গ আছে এবং বংশীর নাদ অতি সুমধুর, ব্রহ্ম-কটাহ ভেদ করিয়া থাকে, বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বংশীর ধ্বনিই যে প্রণব-ধ্বনির স্থানীয়, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

"যঃ উদ্গীতঃ সঃ প্রণবঃ"

ইতি শ্রুতিঃ।

একারণ, প্রণবকে যজ্ঞরূপ, তচ্ছিদ্রকে যজ্ঞচ্ছিদ্র ও বেণুরবকে প্রণবধ্বনি বলিয়াছেন। অর্থাৎ বেণু যজ্ঞোৎপন্ন। প্রণব ধ্বনিতে সকল যজ্ঞের অচ্ছিদ্রাবধারণ হয় ; আত্মাই যজ্ঞচ্ছিদ্রকে অবরোধ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধর বলিয়াছেন। ঐ যজ্ঞ ভোগার্থে সম্পাদিত হইলে ভোগীর ভোগ প্রদান করেন, ভগবৎপ্রাপ্তি কামনায় নিবৃত্তি মার্গে সম্পাদিত হইলে, সেই যজ্ঞই অশ্বের ন্যায় সাধক ব্যক্তিকে পরমাত্মার সান্নিধ্য প্রাপ্ত করান। যথা—

"যজ্ঞাদিব্রতেঽশ্ববৎ"

(ইতি বেদান্ত সূত্রং)

সুতরাং ভোগাভিলাষিণী গোপীদিগের সম্বন্ধে ঐ বংশীরব শারীরিক সুখপ্রদ হইয়াছিল এবং কৃষ্ণাভিলাষিণী-নিবৃত্তি পরা

গোপীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণান্তিকে লইয়া গিয়াছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি গোপীরূপে পরমাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণা ও পরস্পর অলক্ষিতোদ্যমা হইয়া আসিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে কখন গোপন ব্যতীত প্রকাশ্যরূপে ভজনা করে না। অপরন্তু "হাসাবলোক-কলগীত" ইত্যাদি প্রয়োগে এবং "ঈক্ষিতের্নাশব্দঃ" ইত্যাদি বেদান্ত প্রমাণে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করেন, আত্মা নির্লিপ্ত। কলগীত শব্দে বেণুধ্বনিব্যাজে প্রণবধ্বনি ব্যক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ যাহাদিগের চিত্ত পরতত্ত্বান্বেষণে নিবিষ্ট হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে কেহই গ্রাম্য ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। তজ্জন্যই সমস্ত বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণা গোপীদিগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন সমস্ত শক্তি এক আত্মাকে সহস্রারে বেষ্টন করিয়া রমণাভিলাষে অর্থাৎ আত্মার রঞ্জনার্থে আত্মাকে রমণাভিলাষীর ন্যায় প্রতিপন্ন করেন, ফলে আত্মাতে কিছুই স্পর্শ হয় না; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-তত্ত্ব প্রতিভাসিত হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাতে কিছুই স্পর্শ করে না। যথা—

> "স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ। ইত্যাদি
> ররাম ভগবাংস্তাভি রাত্মারামোঽপি লীলয়া॥"
>
> শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

কাম কর্ম্মাভিলাষীদিগের নিরন্তর দুঃখ, নিষ্কামদিগের সুখ, আর আত্মতত্ত্বপরাঙ্মুখ বৃত্তিস্বরূপা প্রকৃতির দুরাত্মতা দেখাই-

বার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরাশক্তি শ্রীরাধা নাম্নী গোপী বহুশক্তি প্রকাশে রাস-নাট্য দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা পরমাত্মতত্ত্বে পরাঙ্মুখ হইয়া নিয়ত সংসারোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখভোগের চেষ্টা করে, তাহাদিগের নিরন্তর সংস্মৃতি যন্ত্রণা ভোগ হয়, আত্মতত্ত্বপ্রাপ্তির যে পরম সুখ, তাহা তাহাদিগের অনুভব হয় না। যেমন নরশরীরস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল পরমাত্মাতে বিমুখ ও স্ব স্ব অধিষ্ঠাতার বশে থাকিয়া নিরন্তর যন্ত্রণা পায়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীরূপ সকল পতিবশে থাকিয়া কষ্ট পায়। মোক্ষরূপ যে অখণ্ড সুখ, তাহা তাহাদিগের প্রাপ্তি হয় না। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যে,

"কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্।"

অপরন্তু একআত্মা নিষ্কাম ও সকাম, উভয় সাধনার ফলপ্রদ হয়েন; ইহাও জানাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তথাহি;

ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল শরীর-রক্ষা-কারিণী; সুতরাং তাহারা গোপী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে; যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গস্থিত সাধক, কেবল আত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের গোপিকা-রূপিণী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রণবধ্বনিরূপ বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সহস্রাক্ষ বৃন্দাবন রাস-মণ্ডলে গমন করেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মগ্নীভূতা হইয়া সংসার-সম্পর্কে বিমনস্কা হয়েন। অর্থাৎ যাঁহারা

কেবল আত্মার অন্বেষণ করেন তাঁহারা আর কখনই সংসার কার্য্যের অন্বেষণ করেন না। লোকে ইহা জানাইবার নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণের সালঙ্কার বাক্য ব্যাজে ভগবান বেদব্যাস কহিয়া গিয়াছেন। যথা—

"তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥"

হে গোপীগণ! তোমরা পতিব্রতা স্ত্রী; গৃহে গিয়া পতি-সেবা কর এবং বালক বালিকাগণ ক্রন্দন করিতেছে, তাহা-দিগকে স্তন পান ও গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ দান দ্বারা সান্ত্বনা কর।

এ বাক্যে শুদ্ধ লৌকিক ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ কূট-ধর্ম্ম সংসারে যাহারা মুগ্ধ হইবে তাহাদিগের কদাচই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইবে না। যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহারাই নৈষ্ঠিকী ভক্তি সহকারে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গোপ্যুক্তি-চ্ছলে পরম দুঃখদ সংসার ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষার নিরাকরণ করি-বার জন্য এইমাত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সকাম সাধক, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে মহিষীরূপে ব্যাখ্যা করিয়া নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্মোপদেশ করিয়া-ছেন এবং কর্ম্মানুসারে আত্মার অনুকম্পায় যে লোকের আপন আপন অভিলষিত সুখ লাভ হয়, ইহা মহিষীদিগের পুত্র পৌত্রাদি সম্পত্তি-সংযুক্ত সুখ ভোগ প্রদর্শন দ্বারা জানাইয়া

গিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করা যায় না। কেন না, আত্মা অবিকারী; কিন্তু তিনি সাধকের সাধনানুসারে বিকারিবৎ প্রতিভাত হন। তিনি সর্ব্বকাম-পূরা আপনি লিপ্ত না হইয়া লিপ্তবৎ অনেকের অনেক-মত কামনার পূরণ করেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, হর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তাঁহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই লিপ্ত নহে। দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই মায়ার কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে লিপ্ত নহেন;—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক। নিবৃত্তি-ধর্ম্মিণী গোপীরূপা বৃত্তিদিগের সহিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ক্রীড়াস্থলে শুদ্ধ পরমার্থোপদেশ এবং প্রবৃত্তিমার্গস্থা মহিষীদিগের সহিত বিহারোপলক্ষে সংসার ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ;—এইমাত্র পুরাণ বর্ণনার তাৎপর্য্য। ইহাতে যাহার যেমন মনঃ, যেমন বুদ্ধি, যেমন মেধা, আধারানুসারে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গে তাঁহার সেই রূপই ধারণা হইয়া থাকে।

সাধারণ ব্যক্তিগণের অনুধ্যানরহিত চিত্তে যে রাসলীলার ভাব সর্ব্বদা জঘন্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার মধ্যে রূপকালঙ্কারে যে সকল পরমাত্মতত্ত্ব নিখাত আছে, তাহা অল্প কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। চিন্তাশীল পাঠক ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকারান্তরে আরও বিষদরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

ঐশ্বরিক পরাশক্তি, সাধকদিগের ভগবদ্ভাবোদয়ের নিমিত্ত

আত্ম-বৈভব-সূচক এই রাস-লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পুরুষ, তিনি কিছুই করেন না। কেবল প্রকৃতিই সকল কার্য্যের মূলাধার হয়েন। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সকাম সাধক ও নিবৃত্তি-মার্গস্থ নিষ্কাম সাধকের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে প্রকৃতি রূপা বলিয়া তাহাদিগের লোকবৎ চেষ্টা বর্ণন করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকামের অভিলাষ পূরণ ও নিষ্কামের মোক্ষ প্রদান এক পরমেশ্বরই করেন। যথা

একো বহূনাং বিদধাতি কামানিতি শ্রুতিঃ।

এক পরমেশ্বরই সাধনানুসারে অনেক প্রকার কামনা পূরণ করেন।

তাহা দেখাইবার জন্য এক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বাসিনী বহু সংখ্যক মহিষীর ঐহিক মনোরথ পূরণ করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকে শ্রীকৃষ্ণকে তদাসক্ত জ্ঞানে দোষ-লিপ্ত বলিয়া বোধ করিতে পারেন;কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যবৎ দোষ-লিপ্ত নহেন।এই ব্যাপার যোগ-মায়া-বিলাস মাত্র। এস্থলে এরূপও বিবেচনা করা উচিত নহে যে, প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণাবতার হয় নাই; উহা কেবল পৌরাণিকী রচনা মাত্র। বস্তুতঃ কৃষ্ণাবতার হওয়া যথার্থ। কিন্তু সেই অবতার বিষয়ের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বিতীয়, অব্যয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্লিপ্ত পরমাত্মা—ইহাই পরিগ্রহ করিতে হইবে। যদিও পরমাত্মার কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই, তথাপি এই বিশ্ব তাঁহারই কৃত বলিতে হইবে। যখন পরমেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন,

বেদে ইহা মান্য ও স্বীকার্য্য হইয়াছে, তখন তাঁহার বিশ্বো-পকারক অবতারকে মান্য না করিবার কারণ কি? ফলিতার্থ পরমেশ্বরের স্মৃতিদ্বার-আরূঢ় হইয়া বিবিধ সাধকের যেরূপ গতি লাভ হয়, তাহাই "রাসলীলা" ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়েই গোপী-গীতায় কহিয়াছেন। যথা

"ন খলু গোপিকানন্দনোভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।"

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কেবল গোপিকানন্দন নহ, সমস্ত জীবনিকরের এক অন্তরাত্মা হও।

অতএব যখন শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকারা জীবান্তরাত্মা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তখন বৃন্দাবনে রাসলীলার ব্যাপার যে অধ্যাত্মতত্ত্ব-ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং জীবের পক্ষে অনায়াসে অধ্যাত্মতত্ত্ব-বোধের নিমিত্ত এই রাসলীলা প্রকটিতা হইয়াছে; অর্থাৎ অপ্রকট পরমাত্মতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। যে সকল নিষ্কাম সাধক কেবল ভগবত্তত্ত্ব-প্রাপ্ত্যর্থী, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি ও তদ্ভিন্ন কান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি সকল এক প্রণব-ধ্বনিতে আকৃষ্টা হইয়া স্ব স্ব স্থানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধব্রজশীলা হইয়া সহস্রারাখ্য পরমাত্মার পরমাসনে গমন করিতে ব্যগ্র হয়। তাহাদিগকে তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণ কদাচ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। যাহাদিগের বিপক্ক জ্ঞান হয় নাই, অথচ আত্ম-সন্নিধানে গমনে ঔৎসুক্য হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল তত্তৎ দেব কর্ত্তৃক

নিবারিত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তির বিঘ্ন বিবেচনায় সেই সকল ব্যক্তি নিয়ত সংসার-রূপ বিষয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট পায়। সেই কষ্ট ভোগ করিয়াও পরমাত্ম তত্ত্ব বিস্মৃত না হইয়া যে কোন রূপে দেহোপরতি দ্বারা দেহান্তে পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ করে। যাহারা অনিবারিত, তাহারা ঐ দেহেই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বজীবন-পরিমুক্ত হয়;—ইহাই রাসের সূক্ষ্মার্থ। ভগবান বেদব্যাস নিষ্কাম সাধকদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকে গোপীরূপে এবং প্রণব-ধ্বনিকে বংশীধ্বনি-রূপে, সহস্রারাখ্য ভূপ্রদেশকে বৃন্দাবনধামরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অন্তর্গূঢ়রূপে আত্মার নির্ব্বাণ-মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহাদিগের অবিপক্ক সাধন, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকেও গোপী বলিয়া পতি-পিত্রাদি কর্ত্তৃক বার্য্য-মাণা ও অন্তর্গৃহরুদ্ধা অথচ তদ্ভাবনা-যুক্তা বলিয়া গিয়া-ছেন। সেই অলব্ধ-বিনির্গমা বৃত্তিময়ী গোপিকা সকল পরমাত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করতঃ গুণময় দেহকে ত্যাগ করিয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধি প্রাপ্তা হন। নিকটগতা গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ অলঙ্কৃত বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পুনঃ ব্রজে গমন করিতে কহিয়াছিলেন। যথা—

"তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতী" রিত্যাদি

এবং "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মো হ্যমায়য়া।" ইত্যাদি।

তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থ-তত্ত্বান্বেষী পরমহংস-গণের স্বচিত্ত-বৃত্তি সকল প্রণবধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পরমা-

ত্মার সন্নিকটে গমনোদ্যত হয়, তাহারা আর কোন ক্রমেই সংসারোচিত ধর্ম্ম কথা শুনে না। ভর্ত্তা শব্দে ভরণ-কর্ত্তা। এখানে ধর্ম্মকে ভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু, ধর্ম্মই সকলের প্রতিপালনকর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষা-কর্ত্তা। যাঁহারা ভগবদন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পরিব্রজনশীল হন, তাঁহারা কখনই সাংসারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে বাধিত হয়েন না; সর্ব্ব-ধর্ম্মময় এবং তপোময় পরমাত্মাকে জানিয়া একান্ত মনে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্ত্যাদি সকল কখনই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীনতা স্বীকার করে না। ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সংসারিক ধর্ম্মোপদেশ করেন। পরমহংসেরা সাংসারিক ধর্ম্ম কর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মময় আত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন। সেইরূপ গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জানাইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,

"অস্ত্যেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে,
প্রেষ্ঠোভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।"

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকল জীবের পরমাত্মা হও। ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম উপদেশ পদ। অতএব তুমিই উপদেশ-পদ। তোমাতেই তোমার উপদেশ থাকুক। আমরা ত্বৎপ্রাপ্তির উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করি না।

পরমহংসেরা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই একমাত্র আত্মাতে সমর্পণ করেন; গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণে সকল সমর্পণ করিয়া ইহা জানাইয়াছেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাধকের উপাসনার পথ এই। মহাতমঃ ও তৎসহচারিণী অসূয়া ও হিংসা,—ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যার বিদ্বেষ করে এবং সর্ব্বদাই বিদ্যার প্রতি দোষারোপ করিয়া লোকদিগকে মহাতমের বশে আনিতে চায়, এবং আত্মাকেও অলীক পদার্থ বলিয়া জল্পনা করে। এখানেও আয়ান জটিলা ও কুটিলা—ইহারা সতত জ্ঞানশক্তি রাধার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং নানা প্রকার কলঙ্কযোজনা ও ঘোষণা করিয়াছে। আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেও অনেক নিন্দা করিয়াছিল। মহানটী বৈষ্ণবীমায়া, এক আত্মাকে কতরূপে প্রতিভাসমান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদা আয়ানের সম্মুখে যোগমায়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপেও প্রতিভাত করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা নির্ম্মল হইয়াও মায়াসন্নিধানে অবস্থিতি প্রযুক্ত, নানারূপে পরিণত হয়েন। মায়াযোগে মানভানে আত্মাকে পুরুষরূপে দৃষ্ট করিয়া কদাচিৎ মায়া আপনি তাঁহার আরাধ্যা হয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে উপাসক ও উপাস্য উভয়রূপেই পরিণত করেন।

মায়াই বিশ্বব্যাপী আত্মাকে সাধ্য-সাধকরূপে প্রতিভাত করেন। তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ আত্মাকে মায়ার সাধনা করাইয়াছেন; কদাচিৎ তন্মানোপশনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে শিবরূপেও দর্শনীয় করিয়াছিলেন।

ফলিতার্থ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার কোন কার্য্যই করেন নাই। শ্রীরাধিকাই সকল নাট্যাচরণ করিয়াছিলেন। আত্মাই সজীব ও অজীব সকল পদার্থ হয়েন। তাঁহাতেই সকল ও তিনিই সকল বস্তুরূপে খ্যাত; তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই। শুভাশুভ যাবতীয় কার্য্য সকলই আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে—ইহা লোকে জানাইবার জন্য যোগেশ্বরী রাধিকা এক কৃষ্ণরূপে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকে প্রতিভাত করিয়াছেন; শাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু এ সকল বিষয় অসত্য হইলেও তদ্রূপের উপাসনা ও তৎকর্ম্মানুস্মরণমননে সত্য, পরাৎপর, পরমার্থপদ লাভ হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যদিগের শরীর মিথ্যা; কিন্তু ঐ মিথ্যা শরীরে সত্য কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, ইহাই তাহার উদাহরণ স্থল।

বেদে আত্মাকে বহুশক্তিমান বলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণকেও ষোড়শসহস্র-গোপীগোষ্ঠীতে পরিবেষ্টিত বলা হইয়াছে। আত্মা ক্রিয়াপরা শান্তি, ক্ষান্তি, কান্তি, পুষ্ট্যাদি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে পরাপ্রকৃতির সন্নিকটে থাকেন। অবশেষে অব্যক্তা প্রকৃতিকেও পরিত্যাগ করিলে সাধক ব্যক্তি সেই পরমপুরুষে লয় হয়। তখন তাহার নামরূপাদি আর প্রকাশিত থাকে না। ইহার উপদেশার্থ শ্রীকৃষ্ণ একা রাধিকাকে লইয়া সকল গোপীর নিকট হইতে অন্তর্হিত হন। পরিণামে পরাপ্রকৃতি রাধাকেও পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করতঃ অনামরূপ অর্থাৎ অপ্রকাশিত

হইয়াছিলেন। এতাবতা ইহাই বুঝিতে হইবে, যে যাবৎ প্রলয়াবস্থা, তাবৎ মুক্ত-পুরুষদিগের ঐ ঐ বৃত্তি সকল স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকে; পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যবস্থাতে প্রকাশিত হইয়া নামরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

"তাবন্নির্ব্বৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ"এবং "জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে"

অর্থ—

পরিত্যক্তা গোপিকাগণ যাবৎ অন্ধকার, তাবৎ নিবৃত্ত থাকিয়া আলোকবিভাবে পুনর্ব্বার কৃষ্ণান্বেষণপরায়ণা হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়ে লোক তমোময় হয়। তখন প্রকৃতিই আত্মাতে অব্যক্তরূপে চেষ্টা-বিহীনা হন। সৃষ্টি-প্রকাশে পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্য করেন;—এইরূপ গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মা যেমন একমাত্র চন্দ্রমা মায়াযোগে জল শরীরস্থ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের আকারে পিণ্ডে পিণ্ডে বহু-রূপে ব্যাকৃত হন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থ মায়াস্থানীয় গোপীসংযোগে অনেক রূপে ব্যাকৃত হইয়া প্রতি গোপীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ

"বিমুহ্যমানাঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।"

দেবস্ত্রী সকল বিমুগ্ধ হইয়া রাসস্থলে আসিয়াছিলেন। ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ দেব-শ্রেণীয়। তাহাদিগের বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়স্ত্রী; অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল বিমুগ্ধপ্রায় হইয়া তাহার মনের সহিত ঊর্দ্ধগ সহস্রারে গিয়া নিস্তব্ধ হয়। সুতরাং রতিপ্রভৃতি

ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল মানসাখ্য কামের সহিত বিমুগ্ধা হওয়াতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে কাম-জয়াখ্যান উক্ত হইয়াছে।

অপরন্তু

"শৃঙ্গার ইব মূর্ত্তিমান্"

অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায়—এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, রতি কামের একত্রাবস্থানের নামই শৃঙ্গার। এখানে পরমাত্মার পরমাসনে রতি-কামের অধিষ্ঠান হওয়াতেই তথায় শৃঙ্গারকে মূর্ত্তিমান বলিতে হইয়াছে। একারণ তন্ত্রে "শৃঙ্গারং শিরসি জ্ঞেয়ং" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রে যে শৃঙ্গার-ব্যাজে কাম-জয়-ব্যাখ্যা করেন, তদ্দ্বারাই প্রতীত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য-লোকবৎ শৃঙ্গার করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। রাজা পরীক্ষিৎ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি এ সকল তাৎপর্য্য জানিতেন; কেবল লোকবোধানুরোধে প্রশ্নমাত্র করেন। পরমজ্ঞানী শুকদেবও,— "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়াছেন। ইহারও প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, তেজোময় বহ্নি যে বিষ্ঠাদি নিকৃষ্টতম পদার্থ ভক্ষণ (অর্থাৎ ভস্মসাৎ) করিয়াও অপবিত্র হন না—তাহা যেমন সত্য, অথচ তাহার প্রকৃত কারণ মানবের অগোচর;—সেইরূপ, ঐশ্বরিক-শক্তিরূপ তেজোদ্বারা যে সকল ব্যক্তি তেজস্বী, তাঁহাদিগের যে সকল অপবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান মনুষ্যের প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহারও প্রকৃত কারণ মানবের অগোচর। যদি কোন

কালে কোনরূপ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা মনুষ্যসমাজ বহির্ভূত নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবে ঈশ্বাবতার-দিগেরও জঘন্যবৎ কার্য্য সকলের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে।

ফলতঃ রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তি-গণ নিগূঢ় তত্ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন প্রকৃতির অনু-যায়ী লৌকিক শৃঙ্গারাদি কার্য্যকে অবলম্বনীয় ও ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে, এই ভাবিয়া ভগবান বেদব্যাস এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, ——

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥",
(ভাগবত, ৩৩ অধ্যায় অর্থাৎ
রাসপঞ্চাধ্যায়ের ৫ম অঃ ৩২ শ্লোক।)

অর্থ—ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মুখ-বিনির্গত উপদেশ-বাক্য-সকল সর্ব্বথা মানবগণের হিতজনক; তাহাদিগের আচরণের মধ্যেও কোন কোন আচরণ সত্য, অর্থাৎ মনুষ্যদিগের অনুকরণীয়, কোন কোন আচরণ সেরূপ নহে। অতএব আচরণের অনুকরণ করিতে হইলে, ঈশ্বর-দিগের যে আচরণ তাহাদিগের উপদেশ-বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহারই অনুকরণ করিবেন।

অতএব সাধকের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি গোপীরূপে নিয়ত কৃষ্ণাখ্য

পরম পুরুষে লগ্না হইয়া সহস্রারাখ্য নিত্য বৃন্দাবনে অস্খলিত-রূপে নিত্য রাস করিতেছেন,—যাহার রাস-পঞ্চাধ্যায়-পাঠে এই স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই সাধক অগ্নিপূত, সূর্য্যপূতও সর্ব্বতীর্থপূত। সেই তত্ত্বজ্ঞানী সাধকই বিষময় বিষম সংসার যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাইয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করে। সে ব্যক্তি ইহ লোকে নিরন্তর ব্রহ্মরস-পূরিত আনন্দসাগরে ক্রীড়মাণ হইয়া দেহাবসানে সেই পরাৎপর পরম বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহার অন্যথা নাই। রাসের এই উপদেশ, রাসের এই আদেশ, ইহাই বেদের অনুশাসন; ইহাই তত্ত্বজ্ঞান ও উপাসনার যোগ্য। অতএব মহরাস ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মতা-বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করা কেবল নরকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কৃষ্ণাবতার-স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ বিষ্ণুধ্যানের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখাত হইতেছে। বিষ্ণুর ধ্যান যথা—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপু র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

অন্বয়ার্থঃ—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, পদ্মাসনস্থিত, কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট

ও হার দ্বারা বিভূষিত এবং শঙ্খচক্রধারী ও স্থবর্ণময়-শরীরী নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।

নারায়ণকে সূর্য্য-মণ্ডলস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যতেজঃ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। সুশব্দে গমন, য শব্দে কর্ত্তা। স্থতরাং সূর্য্য শব্দে—তৈজস রূপে সর্ব্বত্র গমনশীল; এবং নার—জীবসমূহ, অয়ন—আশ্রয়। স্থতরাং নারায়ণশব্দে যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী।—এই উভয়ার্থ প্রতিপাদনার্থ নারায়ণকে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা স্থন্দর সঙ্গত হইয়াছে। তিনি পদ্মাসনস্থিত,—এই বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে, পদ্ম অর্থে সত্বগুণ; স্থতরাং পরমাত্মা বিষ্ণু সত্বগুণ সন্নিবিষ্ট হয়েন। কেয়ূরবান্ অর্থে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশব্যাপী। অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু সর্ব্বত্র স্থিত ও সর্ব্বত্র-গামী। কুণ্ডলবান্ অর্থে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ-প্রদিপাদক শ্রুতি। সাংখ্যযোগস্বরূপ কুণ্ডল শ্রুতিমূলে দোদুল্যমান। কিরীটাদি ধারণে তদ্বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যদুপরি আর নাই, এমত সর্ব্বোচ্চপদ, অর্থাৎ বিদেহ-মুক্তি বুঝায়। তিনি সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ বরণীয় তেজঃস্বরূপ। তজ্জন্য তাঁহাকে হিরণ্ময়-বপুঃ বলা হইয়াছে। চক্র-শব্দে স্থদর্শন, অর্থাৎ মনঃ, তেজঃ ও সত্ত্ব এবং শংখ শব্দে জলতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুর এই ধ্যানানুযায়িনী মূর্ত্তি ব্রহ্মোপকরণাত্মক। তিনি যজ্ঞস্বরূপ পুরুষ; শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারা তাঁহার দেহ নির্ম্মাণ

হইয়াছে। সুতরাং সে শরীর প্রাকৃত শরীরের ন্যায় নহে। ধ্যান কালে বাক্য সকলের এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দুর্গোৎসব-তত্ত্ব।

এতদ্দেশে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম এবং পূজা-উপাসনাদি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই দুর্গোৎসবই গৃহস্থজীবনের সার্থকতা সাধক কার্য্য বলিয়া স্থির আছে। যে গৃহস্থ যাবজ্জীবন দুর্গোৎসব করিতে সমর্থ না হয়েন, তিনি যেন আপনাকে বৃথাদেহধারী বোধ করিয়া একান্ত দুঃখিত হয়েন। এই দুর্গোৎসব পরমতত্ত্ব। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বোধ হইলে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিলে বস্তুতই মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য সাধন করা হয় এবং অনায়াসেই পরমানন্দ-সম্ভূত অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে। ক্রিয়াকাণ্ড মধ্যে ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর নাই। শাস্ত্রে দুর্গাপ্রতিষ্ঠাকে কলির রাজসূয়যজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মহোৎসবরূপ দুর্গোৎসবের আনুষঙ্গিক যে সকল কার্য্য আছে, অনেকে তাহার তাৎপর্য্য সহসা অনুধাবন করিতে পারেন না।—পূজার পূর্ব্বে বিল্ববৃক্ষমূলে বোধন; পরে নব পত্রিকা-প্রবেশ; অনন্তর তিন দিবস পূজা; অবশেষে বিসর্জ্জন;—এই সকল কার্য্য কি এবং ইহার তাৎপর্য্যই বা কি, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। অপর দুর্গোৎসবকার্য্য বৎসর মধ্যে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়, ইহারই বা কারণ কি? আবার বসন্তকালীন পূজাতে বোধনকার্য্য করিতে হয় না; কিন্তু শরৎকালের পূজাতে ঐ বোধনের নিতান্ত আবশ্যকতা কেন? অপরন্তু, কোথাও বা নবমীতে, কোন স্থানে প্রতিপদে, কোথাও বা ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ হইয়া থাকে; এরূপ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানেরই বা কারণ কি?—এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম বোধ করা নিতান্ত আবশ্যক। বোধ হয়, আমাদিগের দেশে অনেকেই ইহা অবগত নহেন। ইহা অতিশয় রমণীয় বৃত্তান্ত এবং ইহার অবগতিতে অশেষ প্রকার আনন্দ ও পরিণামে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয়। এই নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ হিন্দুমণ্ডলীর উপকারার্থ এতদ্বিষয়ক নিগূঢ় মর্ম্ম (যাহা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিবর পরমহংসের নিকট অবগত হইয়াছিলাম, তাহা) ব্যক্ত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, এতদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধমনাঃ ব্যক্তিগণের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, পরমতত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিগণ যে কার্য্যের

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার হিতসাধকতা বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। ঋষিরা বেদবিধি অনুসারেই সকল কর্ম্মের সমাচরণ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। ঋষিবাক্য ও বেদ-বাক্যে প্রভেদ নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ ঈশ্বরাভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, ঋষিরাও তাহাই বলেন। কেবল ভ্রান্তদৃষ্টি প্রাকৃতজনগণই মোহবশে তাহাতে অনৈক্য দেখিতে পায়। এই উভয়কালীন দুর্গাপূজা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ঘটিত পরমাত্মা উপাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব-গ্রহণে অনিপুণ মুগ্ধ লোকের উপকারার্থই মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্বের উদ্ঘাটন পূর্ব্বক এইরূপ বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠা-নের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির পর-মাত্মার স্বরূপতত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা নাই, যে ব্যক্তি কেবল লোভ-মোহে অভিভূত ও নিয়ত সংসারে থাকিয়া সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং নিয়তই জনসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তাদৃশ ব্যক্তিও যদি আত্মতত্ত্বোপা-সনা না করিয়া দুর্গামহোৎসবোপলক্ষে ব্রহ্মময়ী দুর্গার অর্চ্চনা করে, তবে সে ব্যক্তি পরম্পরা-সম্বন্ধে ক্রমশঃ যোগসমাধি-প্রাপ্য তদ্বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিবার যোগ্য হয়। যাহারা দুর্গামহোৎসবে তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য করে, কিম্বা আমরা তত্ত্ব-জ্ঞানী, ইহা দুর্ব্বলাধিকারীর কর্ম্ম,—এরূপ অবজ্ঞা করিয়া, অথবা আলস্য বা মোহবশতঃ পরিপূর্ণ-জ্ঞানময়ী দেবী দুর্গার অর্চ্চনা না করে, তবে ভগবতী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদিগকে

সমস্ত অভিলাষ হইতে বঞ্চিত করেন; তাহাদিগের আর কোন সাধনাই সফল হয় না; শাস্ত্রে এরূপ শাসনবাক্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। বস্তুতঃ নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানে প্রায় জীবমাত্রই অনিপুণ। তন্নিমিত্ত পরমহিতকারী বেদ-শাস্ত্র এক একটী ঈশ্বররূপের উপাসনার দ্বারা সংসারবদ্ধ জীবগণের মুক্তির উপায় কহিয়া গিয়াছেন। অতএব সগুণে বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া কেবল নির্গুণোপাসনায় মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে এবং কস্মিন্‌কালে কেহই সেরূপ হয় নাই। জৈগীষব্য প্রভৃতি পূর্ব্বে যত যত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, সে সকলেই সগুণ ব্রহ্মে চিত্তস্থাপণ করিয়া নির্গুণতা লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ মুক্তিসাধন বিষয়ে এই পথ ভিন্ন আর অন্য পথ নাই।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মহাবিস্তৃত নিগূঢ়তত্ত্বময় দুর্গোৎসব-ব্যাপারের প্রত্যেক কার্য্যে একদিকে পৌরাণিক কল্পনা, অন্য দিকে বৈদিক-তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ,—এই উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষ করিতে হইবে:

সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুই পথ। পৌরাণিক কল্পনাতে দক্ষিণায়ন—পিতৃযান ও উত্তরায়ণ—দেবযান বলিয়া গণ্য। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেব-যানে হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিমাগের যে কর্ম্ম, তাহা দক্ষি-

ণায়নে এবং নিবৃত্তিমার্গের যে কর্ম্ম তাহা উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে; একারণ শাস্ত্রে বলেন, যে দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ণ ও রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই নিদ্রিত দেবগণকে জাগাইতে হইবে; তাহারই নাম বোধন। উত্তরায়ণে জাগ্রদবস্থা; তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্য প্রযুক্ত বোধনের প্রয়োজন হয় না। এতাবতা প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্য লাভ প্রত্যাশা করিলেই ঐ প্রবৃত্তিমার্গ-স্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ করিয়া লয়েন। "বোধন" শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ। যথা—

"প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারো নিবৃত্তিস্তদন্যথা।"

ইতি যামলং।

সংসারকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে; তদ্ভিন্ন নিবৃত্তিমার্গ; অর্থাৎ সংসার সন্ন্যাসধর্ম্মকে নিবৃত্তিমার্গ কহে।

অপরন্তু, কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ, আর তাঁহার জাগরণাবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অতএব কুণ্ডলিনী-বোধনের নামই বোধন বলিয়া যোগিগণ নিয়ত কুলকুণ্ডলিনীকে বোধনে রাখিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিয়ত দেবযান উত্তরায়ণে কার্য্যসম্পন্ন হইতেছে, অর্থাৎ তৎকার্য্য আদিত্যদ্বারে গমন করিতেছে। আদিত্য শব্দে সূর্য্য। অধ্যাত্মতত্ত্বে সূর্য্যশব্দে পিঙ্গলানাড়ী। তাহা দক্ষিণ নাসিকাতে অবস্থিত; তাহাতে প্রাণবায়ু বহনকালে

কুণ্ডলিনী জাগ্রদবস্থায় থাকেন। সুতরাং তত্ত্ব-চিন্তকেরা কুণ্ডলিনীর জাগ্রৎকালকে দিবা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

এজন্যই কাল চিন্তকেরা দেবযান উত্তরায়ণকে দেবতাদিগের দিবা বলেন। দেবতা শব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গণ। ঐ ইন্দ্রিয়গণকে কুণ্ডলিনী জাগ্রদবস্থায় বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত, নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ে অভিভূত করেন। তৎকালে কোন যাগযজ্ঞাদি-সাধন সম্পন্ন হয় না; অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ বাম-নাসাচারী প্রাণবায়ু জীবগণকে বলপূর্ব্বক নিয়ত সংসারে আবদ্ধ করেন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে,—

"চন্দ্রমসং গচ্ছতীতি"

অর্থাৎ পিতৃলোককামী ব্যক্তি চন্দ্রলোকে গমন করে।

অধ্যাত্মপক্ষে দ্বিদল ভ্রূমধ্যে চন্দ্রলোক অবস্থিত; সুতরাং ঊর্দ্ধে সত্যলোকে যাইবার পথ না পাইয়া তাহারা পুনর্ব্বার অধঃপ্রবৃত্ত হয়। অতএব তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি আছে। সূর্য্যদ্বারে গমন করিলে সত্যাখ্য লোকে গমন করে, আর আবৃত্তি থাকে না। যথা,—

"সত্যলোকো মহামৌলৌ"

শিরঃসহস্রারাখ্য মহাপদ্মে সত্যাখ্যলোকে নিত্য আত্মাধিষ্ঠান হয়। সুতরাং পিঙ্গলা দ্বারা নাদচক্রকে ভেদ করিয়া তথায় গমন করিলে জীবের সংসারে পুনরাগমন হয় না। তজ্জন্য তাহাকেই নিত্য বসন্তাখ্য উত্তরায়ণ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। উত্তর শব্দে সর্ব্বশেষ, অয়ন শব্দে আশ্রয়।

সর্ব্বশেষ-আশ্রয় অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তিই উত্তরায়ণ। যাহাতে নিত্য বাস, তাহাকে বসন্ত বলা যায়। সেই পরম পদ্মে অর্থাৎ প্রসন্নস্থানে যে বিদ্যার প্রভাবে অধিবাস হয়, সেই বিদ্যার নাম "বাসন্তী"। সুতরাং বোধস্বরূপা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে এখানে বাসন্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি নিত্য জাগ্রদবস্থায় অবস্থিতি প্রযুক্ত তত্ত্ব-চিন্তকের আপনাতে তত্ত্ব বোধের নিমিত্ত আর যত্ন করার প্রয়োজন হয় না। একারণ, জ্ঞানশক্তি কুল-কুণ্ডলিনীর অর্থাৎ বোধ-স্বরূপা দুর্গার উত্তরায়ণে বসন্ত সময়ে যে মহোৎসব হয়, তাহাতে বোধন নাই। মহাশক্তি দুর্গাকে শাস্ত্রে এই নিমিত্তই বাসন্তী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নতুবা বাসন্তী শব্দের "বসন্তে ভবা বাসন্তী" এরূপ সাধারণ ব্যুৎ-পত্তি নহে।

এই দুর্গোৎসব কল্প এক পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপ; পক্ষান্তরে পৌত্তলিক ব্যাপার বোধ হইতে পারে। নিবৃত্তিমার্গস্থিত তত্ত্বজ্ঞানীরা অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-চিন্তায় ঐ দুর্গোৎ-সব কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সংসারী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্পত্তি লাভার্থ অশ্বমেধানুকল্প যজ্ঞরূপে দুর্গোৎসব করিয়া দুর্গা প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পবিত্র সুরলোকে অধিগমন করেন। নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানিগণ ইহাতেই মোক্ষ নির্বৃতি লাভ করেন। তথাহি,—এরূপ পৌরাণিক ইতিহাস আছে, সুরথ ও সমাধি

উভয়েই দুর্গোৎসব করেন। কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সাধিতা দেবী সুরথকে মনুষ্য-পদ-প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। নির্ব্বিণ্ণচেতাঃ সমাধি নিবৃত্তিমার্গে ঐ দুর্গোৎসব করেন; এজন্য ঐ জ্ঞানশক্তি দুর্গা তাহাকে আপনার স্বরূপতত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে দুর্গোৎসবেই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা হয়। উভয়মার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণই ইহাকে পৌত্তলিক ব্যাপার বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলে সেই অবজ্ঞাই তাহাদিগকে পরম-পথে বঞ্চিত করিয়াছে।

দুর্গোৎসব-কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিরূপ। উত্তরায়ণ বসন্তকাল শুদ্ধকাল বলিয়া লোকে বাসন্তী-পূজায় বোধন করে না। ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই;—কেবল কুণ্ডলিনী-শক্তির নিদ্রাভঙ্গ-কালকেই শাস্ত্রে উত্তরায়ণ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর নিদ্রাবস্থায় কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, জাগ্রদবস্থাতেই সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। যথা—

"মূলাধারে স্থিতা দেবী যাবন্নিদ্রান্বিতা ভবেৎ।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥"

মূলাধারে কুণ্ডলিনী দেবী যাবন্নিদ্রান্বিতা থাকেন, তাবৎ মন্ত্র-যন্ত্রাদি কিছুমাত্র সিদ্ধ হয় না। এই অবস্থার নামই দক্ষিণায়ন।

অপরঞ্চ

"যদি সা বোধিতা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা সর্ব্বং প্রসিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥

যদি বহুপুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ দেবী মূলাধারে প্রবোধিতা হন, তবেই মন্ত্র যন্ত্র অর্চ্চনাদি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

এই নিমিত্ত দক্ষিণায়নে দেবীর বোধনের প্রথা আছে। যদি বহুপুণ্য সঞ্চয় দ্বারা তিনি জাগরিতা হন, তবে সিদ্ধি লাভ হয়,—এই উক্তিতে নবম্যাদি সকল কল্পই সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ও তপঃকর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইলে পরতত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়।

শাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ে নবম্যাদিতে কল্পারম্ভ করিতে এইরূপ অনুশাসন আছে, যে দেবীর শুভাগমনার্থ পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক সংযত হইয়া কল্পঘটে পূজন, স্তবন ও বন্দনাদি দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হইলে পর, তৎকালে সর্ব্ব-জ্ঞান-শক্তিস্বরূপা দুর্গাদেবীর বোধন হয়। বোধনানন্তর স্বভবনমূলে দেবীর প্রবেশ হয়। অধ্যাত্মপক্ষে বোধ শব্দে—জ্ঞান; পরিশুদ্ধ জ্ঞান লাভার্থ পূর্ব্বে সংযম-নিয়মাদির অনুষ্ঠানে চিত্ত সুসমাহিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছা জন্মে; জ্ঞানের প্রতি ইচ্ছা জন্মিলে, অল্পশ্রমে ও অল্প সাধনাতেই তদ্বিদ্যা অর্থাৎ সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, স্বভবনমূলে অর্থাৎ হৃদগহ্বরে স্বয়ং প্রবিষ্ট হয়েন। ফলিতার্থ, ইহাতে বোধকের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এই নিমিত্ত বাহ্যে দেখাইয়াছেন, যে পূজার বহুদিন পূর্ব্বে কল্পারম্ভ করিয়া দেবীর পূজা করিলে, ষষ্ঠীতে বোধন হয়। বোধনানন্তর মূলা-যোগে সপ্তমীতে দেবীর

পত্রিকা-প্রবেশ উক্ত হইয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দুর্গোৎসব কল্পে বোধন কার্য্যের সহিত অধ্যাত্ম-ঘটিতা তত্ত্বব্যাখ্যা সংলগ্ন হয় কি না? দেবীর বোধনে ও অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে অভেদরূপ দেখা যায় কি না? অতএব দুর্গোৎসব যে পরমতত্ত্ব ও পরব্রহ্মের প্রাপ্তি নিমিত্তক মুখ্য সাধনা, তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

গৌণচন্দ্রে ভাদ্রীয়া কৃষ্ণানবমীতে বোধন হয়; ঐ পক্ষকে অপর পক্ষ বলে। আর আশ্বিনের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ অবধি পরপক্ষ; তাহাকে দেবীপক্ষ বলিয়া খ্যাত করা যায়। সূক্ষ্মার্থ ব্যাখ্যায় সূক্ষ্মকাল-স্বরূপে, অপর পক্ষকে অপরাবিদ্যাব অনুষ্ঠান জন্য পিতৃযান ও দেবীপক্ষকে পরাবিদ্যাধিষ্ঠান হেতু দেবযান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অপর পক্ষে পিতৃকৃত্য ও দেবীপক্ষে দেবকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এই দুই পক্ষকে পক্ষান্তরে স্বপক্ষজ্ঞানে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ বলিয়া খ্যাত করা যায়। পিতৃলোককামী সংসারী ব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করে; পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিয়ত বোধকর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে এবং ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে তাহার সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না; সে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত দ্বারা শ্রমানুভব করিতে থাকে; কোন মতেই তাহার বিশ্রান্তি-সুখ লাভ হয় না। দেবযানে

আরূঢ় হইয়া নিষ্কারণে কর্ম্মাদি সমাপন করিলে, সূর্য্যলোকে গমন পূর্ব্বক আদিত্য-দ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ; আর তাহার পুনরাবৃত্তি থাকে না। এই নিগূঢ় অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-ব্যাপার নরশরীরে নিত্যই নিরুদ্ধ রহিয়াছে ; তাহাতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিতে পারিলেই জীবের নিরতিশয় পর্ম-মাত্ম-জ্ঞান লাভ হয় ; সেই জ্ঞানবলে প্রাণায়াম-প্রভাবে বিদ্যা-প্রবোধনে পিঙ্গলাখ্য সূর্য্যদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানরাখ্য সুসুম্না-প্রাপ্ত-নাদ-শক্তিকে ভেদ করতঃ বিন্দুরূপ পরম শিবাখ্য কার্য্যব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর জীবাত্মা উপাসনা-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরা বিদ্যার প্রভাবে মঙ্গলদায়ক পরম শিবরূপ শরীরাধ্যক্ষ ঐ বিন্দুর সহিত পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তথাহি বেদান্তং—

"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমাভিধানাৎ।"

কার্য্যাত্যয়ে জীব কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত পরমকারণ পরম পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয় ; তাহাকে আর দুর্গম সংসার-ভ্রমণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

যে পরাবিদ্যা দ্বারা পরমা শান্তি লাভ হয়, সেই দুর্গা-ভেদিনী পরমাত্ম-স্বরূপা পরা বিদ্যাকেই এ স্থলে দুর্গা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেন না, সেই জ্ঞান স্বরূপা বিদ্যা প্রসন্না না হইলেও দুর্গতি নাশ হয় না। যথা সপ্তসতী—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনীতি।"

সেই পরমা বিদ্যাই নিত্যা ও মুক্তির হেতুভূতা হয়েন। অপরাবিদ্যা সংসারবন্ধনের হেতুভূতা। যথা তত্রৈব—

"সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীতি"

সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ব্ভাখ্য দেব; যিনি তাঁহার ঈশ্বরী অর্থাৎ নিয়ন্ত্রী হয়েন, তিনিই সংসারবন্ধের কারণরূপা, যথা শ্রুতিঃ—

"ঋক্‌যজুঃসামাথর্ব্বশিক্ষাকল্পনিরুক্তচ্ছন্দো
ব্যাকরণজ্যোতিষমিত্যপরা।
" পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—ইতি।"

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ,— এ সমস্তই অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ ইহাতেই কর্ম্মকাণ্ড-বিধি। সুতরাং প্রণবাবলম্বন পর্য্যন্ত সগুণ বিষয়, তাহাতে পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। যদ্দারা অক্ষর পরমাত্মাতে জীব একীভূত হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। চন্দ্র পর্য্যন্ত অবিদ্যা; পিতৃলোককামী চন্দ্রগামী হইয়া তথা হইতে পুনরাবৃত্ত হয়। সূর্য্য পর্য্যন্ত বিদ্যা পরা-প্রকৃতি; তদ্দারা পরমপদপ্রাপ্ত সাধকের পুনরাবৃত্তি থাকে না; ইহারই নাম বিশ্রান্তি। এ সুখ লাভ কেবল পরাবিদ্যার প্রসন্নতাতেই হইতে পারে। কিন্তু এ সাধনার সাধক জীব অতি বিরল। এই নিমিত্ত অধ্যাত্মসাধনরূপ বিদ্যা প্রবোধনচ্ছলে শারদোৎসব-পর্ব্বোপ-

লক্ষে দেবীর বোধনাদি ক্রিয়া বাহ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। অর্থাৎ দুঃসাধ্যবস্তুকে সুসাধ্যরূপে লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মন্দভাগ্য, মন্দবুদ্ধি, মন্দায়ুঃ, অজ্ঞ জীবেরা তত্ত্ব-জ্ঞানানুষ্ঠান করিতে পারুক বা না পারুক, অনায়াস-সাধ্য দুর্গোৎসব উপলক্ষে পরা বিদ্যার অর্চ্চনাতে সেই নিরতিশয় আনন্দ-সন্দেহে তদ্বিষ্ণুর পরমপদে অভিগমন করিতে পারিবে। লোকদিগকে দুর্গা-মহোৎসবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব জানাইবার জন্য ভগবান্ ভর্ব উহা বিস্তৃতরূপে আগমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন তদ্বিষ্ণুর পরমপদরূপে বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান সকল পৃথিবীতে দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ দুর্গা-মহোৎসবও পরমাত্মতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজা করিলে পূজক ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞরূপে সংসারে থাকিয়াও বিশ্রান্তি সুখ লাভ করে। সংসারী ব্যক্তি পিতৃযানে আরূঢ় থাকিয়াও নিষ্কাম কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যেরূপে পরমাত্মতত্ত্বলাভ করিবে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া দেব্যার্চ্চনা করিবার বিধি দিয়াছেন। কর্ম্ম দ্বিবিধ; ভোগ-সংযুক্ত ও জ্ঞান-সংযুক্ত। সেই জ্ঞান-যুক্ত-কর্ম্ম পিতৃপক্ষ হইলেও ঈশ্বরার্পিত-বুদ্ধিবলে মোক্ষবিরোধী হয় না। এক পিতৃপক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। অষ্টমীর পর নবমী অবধি পরপক্ষ অর্থাৎ দেবপক্ষে সংযোজিত আছে। এতাবতা ইহাই প্রবোধ দিয়াছেন, যে, নিরন্তর সংসারে কর্ম্মকাণ্ডে

যুক্ত থাকিয়াও বৈরাগ্য-পদবীতে গমন পূর্ব্বক জীবগণ পরি-মুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু,

"যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"

সংসারে থাকিয়া যে দিন বিরক্ত হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাসী হইবে।

এই জন্য পিতৃপক্ষে পিতৃকৃত্য করিতে করিতে তন্মধ্যেই নবমীতে জ্ঞানস্বরূপা দুর্গার অর্চ্চনা বিধি উক্ত হইয়াছে। অপ-রন্তু, ইহার নাম পক্ষব্রত; পক্ষান্তরে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অব-রোধ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত তন্মাত্র এই পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তি আবরণের নামও পক্ষব্রত। ইহাতেও বোধনশব্দ প্রযুক্ত করা যায়। যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তীচ্ছায় আত্মার উপাসনা করিতে করিতে যে বোধোদয় হয়, তাহার নাম বোধন। যথা -

ঈষে মাস্যসিতেপক্ষে নবম্যা মার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥

ইহার স্থূল অর্থ এই যে,—ঈষ অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ-পক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে, আমি যাবৎকাল পূজা করিব, তাবৎ কালের জন্য শ্রীবৃক্ষে অর্থাৎ শ্রীফলবৃক্ষে, তোমার বোধন করিতেছি।

ফলিতার্থ,—ইহার অন্তরে অধ্যাত্ম তত্ত্ব-ঘটিত অর্থ গুপ্ত আছে।

তথাহি—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগতীং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং॥"

হে ঈশ! হে পরমেশ্বর! তুমি এই জগতের অন্তরাত্মা, জগতীতে প্রপঞ্চভূত যে কিছু জগৎপদার্থ, তাহা তোমার দ্বারা আচ্ছাদিত; সেই প্রপঞ্চ পরিত্যাগে সত্যাত্মা তুমিই ব্যাপ্ত থাক; তোমাকে জানিলে স্বরূপতত্ত্ব বোধ হয়; ইত্যাদি।

অর্থাৎ স্বরূপতত্ত্ব বোধ হইলেই বোধন শব্দের চরিতার্থতা হয়। এই কারণে নবমী-বোধনে ঈশাবাস্য শ্রুত্যভিপ্রায়ে "ঈষে মাস্যসিতে পক্ষে" বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়। সেই প্রার্থনাবোধক বাক্যার্থের নাম নবম্যাদি কল্পে বোধন। পিতৃযান—দক্ষিণায়ন; সেই পিতৃপক্ষের নবমী অবধি দেবপক্ষ উত্তরায়ণ—পূর্ব্বোক্ত বিচারে সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ পিতৃকামী ভোগার্থী ব্যক্তির যে দিবস বিবেক জন্মে, সেই দিনকেই ষোড়শকলা পরমাত্মার নবম কলা এবং তৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নবমকলাপ্রাপ্ত সাধক বলা যায়। কৃষ্ণপক্ষ শব্দে—এখানে কৃষ্ণবর্ণ তমঃপক্ষ; অর্থাৎ শাস্ত্রকর্ত্তারা পরমাত্ম তত্ত্ব উদয় না থাকা প্রযুক্ত ভোগার্থ ক্রিয়াকালকে তমঃপ্রধান সময় জানিয়া কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কর্ম্মাত্মিকা অষ্টম কলার বোধ করাইয়াছেন। কিঞ্চিৎ বিবেকোৎপত্তি বিধায় নবমী কলাকে তত্ত্বভূতা বলিয়া উক্ত করেন।

"আর্দ্রযোগতঃ" এই পদের অর্থ এই যে, যোগহেতুক চিত্ত আর্দ্র হওয়াতে। যোগ শব্দে আত্মজ্ঞান। তৎপ্রাপ্তির উপযোগী বলিয়া অষ্টমী কলা, অষ্টাঙ্গ-যোগ-স্বরূপ হয়; অর্থাৎ পূজাজপাদি দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। তৎ প্রভাবে জীবের কঠিন চিত্ত আর্দ্র হয়। তজ্জন্যই তত্ত্ববোধনের পূর্ব্বে পূজাদি করণের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত

"শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং।"

হে পরমাত্মন্! আমি যাবৎ পূজাদি করিব, তাবৎ তোমাকে শ্রীফলবৃক্ষে বোধন করাইব,—এইরূপ উক্ত হয়। অর্থাৎ তুমি সত্যাত্মারূপে জগদ্ব্যাপ্ত, সেই জগদ্রূপ তোমাকে সাধকের বোধ করাইব। যখন, চিত্তসমাহিত হইলে বাহ্য পূজা থাকিবে না, তখন তন্ময় হইয়া যাইবে। জগৎ শব্দে এই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড পদে বিরাট। অর্থাৎ জগদীশ্বর বা ঐশ্বরী শক্তি বিরাটরূপে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছেন। তদীয় স্বরূপ-বোধের নামই শ্রীবৃক্ষে বোধন; তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন;—ইহাই সকলকে প্রতিবোধিত করার নাম "বোধন" বলা হইয়াছে। যদি বল, শ্রীফলবৃক্ষে বোধন শব্দ আছে; ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রসুপ্তি—এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারে? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—শ্রীশব্দে ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্যই যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সুতরাং শ্রীফলবৃক্ষ বলাতেই ব্রহ্মাণ্ড শব্দ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যদি শ্রীফল শব্দে বিল্ববৃক্ষ হয়, ব্রহ্মাণ্ড

না হয়, তবে কি দেবী সেই কণ্টকময় বৃক্ষাগ্রে শয়ন করিয়া আছেন? পূজার কালে কি নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ হইতে নামাইবার নিমিত্ত এই বোধাত্মক মন্ত্র প্রতিপন্ন হইয়াছে? স্বরূপতঃ রূপকব্যাজে শ্রীফল শব্দে ব্রহ্মাণ্ড; তাহাতে প্রসুপ্ত চৈতন্যশক্তির উদ্বোধনের নাম শ্রীবৃক্ষে দেবীর বোধন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ

"যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি।"

রাম যেমন দশাস্যকে নিহত করিয়াছিলেন, আমিও সেই-রূপ শত্রুগণকে বিনিপাতন করিব।

এই অপর মন্ত্রার্থের তাৎপর্য্য বিবেচনা করা যাইতেছে। ইহাতে রামায়ণোক্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হইবে। "দশাস্য" হত ব্যতীত রাবণের অন্য নাম উল্লেখ করিয়া "হত" এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং এস্থলে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, মহামোহ রাবণ, মহামোহের প্রধানাঙ্গ কাম ক্রোধাদি দশটী আস্য, এরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে,— পরমাত্মা কর্ত্তৃক দশাস্য মহামোহ যেরূপে হত হইয়াছে, আমিও সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বোধ দ্বারা মহামোহকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিয়াছি। রামের সহিত আপনার সাদৃশ্য দেওয়ায় দোষ হয় না; যেহেতু,—

" ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি "

শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাহাকে আত্মাই বলা যাইতে পারে। অতএব পরমাত্মস্বরূপ রামচন্দ্রের সহিত তাহার উপমান-উপমেয়-ভাব অসঙ্গত হইতে পারে না। অপর, শ্রীফল বৃক্ষের ব্রহ্মাণ্ডত্ব সিদ্ধ হইলে, দেহীর দেহকে শ্রীফল বলায় বিরোধ থাকিল না। যথা—

"পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরভেদ ইতি"

মনুষ্য শরীরে ও ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ।

কিঞ্চ

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে।"

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, কলেবরেও তাহা আছে।

অর্থাৎ শ্রীই শরীরের ফলস্বরূপ। একারণ এখানে দেহকে শ্রীফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপা জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীবশরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্য শক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্নিদ্রাভঙ্গ-পদে চৈতন্যরূপা কুল-কুণ্ডলিনীকে বোধ করাইবার কথা বুঝিতে হইবে। সেই জ্ঞানশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গার্থে অনেক জপ, তপঃ, পূজা ও যোগাদি করিতে হয়; তাঁহার বোধন না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু প্রাণায়াম ও জপ যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না; সুতরাং দুর্গোৎসব উপলক্ষে অধ্যাত্ম-

তত্ত্বান্বেষণ পক্ষে ভোগপর তমোময় অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত অপরপক্ষে নবম কল্পায় শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্‌ব্যতীত বাহ্য-পূজোপদেশে দেবীর বোধন এখানে স্বরূপার্থ সঙ্গত হয় না; যেহেতু প্রথমতঃ দেবীর নিদ্রাই অপ্রশস্ত; দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষোপরি শয়ন অত্যন্ত অলীক। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ব বোধই এ বোধনের স্বরূপার্থ জানিতে হইবে। নবম্যাদিকল্পে দেবীর বোধনাভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর ষষ্ঠ্যাদি কল্পে দেবীর সায়ংকালের বোধন-তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে।

"ষষ্ঠী" এই সংখ্যাবাচক শব্দটী উপাসনা ভেদের সময় বিশেষ এবং কালাবয়ব অর্থাৎ তিথি ও যোগাবয়ব এই তিনেরই বিশেষণ। যথা, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, এই ষড়ঙ্গযোগ। এস্থলে প্রতিপৎ আসনযোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমনযোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থী ধ্যানযোগ, পঞ্চমী ধারণা যোগ, ষষ্ঠী সমাধিযোগ; ইহা প্রতিপদাদি তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দানচ্ছলে বোধিত হইয়াছে।

প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে; ইহাতেই আসনযোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ সংযমনার্থ ডোরক দানচ্ছলে ইন্দ্রিয়সংযমন প্রত্যাহার যোগ উক্ত করিয়াছেন। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণ-রজত-নির্ম্মিত তিলকদানচ্ছলে প্রাণায়াম যোগ উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ইড়া স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী

পিঙ্গলা—নাসাভ্যন্তরচারিণী পূরকরেচকাদিলক্ষণসমন্বিতা; সুতরাং ইহাতে প্রাণায়াম যোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্থীতে উচ্চাবচফলদানচ্ছলে, জগতের অভিলষিত ফল প্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরণরূপ ধ্যানযোগের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে কঙ্কতিকা-দানচ্ছলে ধারণাযোগ কথিত হয়; কারণ, অসার বর্জ্জন পুরঃসর সারবস্তুসন্ধারণই ধারণাযোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য ও মধুপর্ক প্রদানচ্ছলে সমাধিযোগোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ—মধুধারাপানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান যায়; সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী এক এক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপে কালাবয়ব প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক দ্রব্য দানচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অপরন্তু সাধক ব্যক্তি অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় এই কোষত্রয়ে উত্তীর্ণ হইয়া সমাধির অবসানে, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিবেক, দুর্গোৎসবকল্পে তাহাই সঙ্কেত দ্বারা কথিত হইয়াছে। যথা,—প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজোপলক্ষে ষষ্ঠী অবসানে অর্থাৎ সায়ংকালে বোধন করিতে কহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাপ্তির নাম বোধন; সুতরাং সমাধির পর বিজ্ঞান কোষপ্রাপ্ত সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়। তদ্বোধন ব্যতীত বিশ্রান্তিসুখ লাভ হয় না।

অনন্তর সপ্তমী, অষ্টমীও নবমীতে আনন্দময়কোষপ্রাপ্ত জীব, জীবন্মুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। একারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহা-মহোৎসব নবমীতেই হয়। ইহাকেই শারদোৎসব বলে। এই তত্ত্ববোধনোপদেশ নবমীকল্পে শ্রীবৃক্ষে দেবীবোধনেই বোধ করিতে হইবে।

কিঞ্চ,—

বাগীজ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীফলবৃক্ষমূলে অর্চ্চনা করিয়া এই মাত্র মন্ত্র পড়িয়া থাকে।

"ঐং রাবণস্থ বধার্থায় রামস্থানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তুয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি তৎ।"

হে দেবি! রাবণের বধের নিমিত্ত, আর শ্রীরামের প্রতি অনুগ্রহ জন্য ব্রহ্মা তোমাতে অকালে বোধন করেন। অত-এব আমিও আশ্বিনে ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বোধন করি। ইত্যর্থে, শ্রীফলবৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডমূলে চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিতা; তাঁহার বোধ না হইলে ব্রহ্মপুরে গতি হইতে পারে না। ষষ্ঠী শব্দে—ষড়ঙ্গ-যোগান্তঃসমাধি; সায়ং পদে—দিবাবসান; ব্রহ্মা-শব্দে—হিরণ্যগর্ভ; হিরণ্যগর্ভার্থে—জীব; পরমাত্মা-রাম; তৎপ্রসন্নার্থ জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন অর্থাৎ এখানে সমাধিযোগের অবসানে জীব আত্মতত্ত্বের প্রসন্নভাবার্থ-

এবং রাবণ পদে মহামোহ, তদ্বিনাশার্থ আত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বে দেবী জ্ঞানশক্তি মহাবিদ্যা কুলকুণ্ডলিনীর বোধন করিতে কহিয়াছেন। অকালে অর্থাৎ সংসারাসক্তি-কালে, আমিও তোমার বোধন করিতেছি। ইত্যভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে পূজাঙ্গ দেবী বোধনে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বোধনের স্বরূপার্থ বোধ করিতে পারিলে দুর্গোৎসবেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হইতে পারে; ইহাতে পরিব্রাজকতার অপেক্ষা রাখে না। সংসারে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও বিযুক্ত-ফল দেব্যার্চ্চনায় নিরতিশয় মুক্তি লাভের কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই। যত দিন এ বোধ না জন্মিবে, ততদিন বিল্বমূলে বিঘট-ঘট-বোধে ঘটনামাত্রই সার হয়; স্বঘটে ঘটনা না ঘটিলে যথার্থ বোধন হইবে না।

এই দুর্গোৎসব ক্রিয়ার অনুক্রমণিকা এই যে,—

আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ॥"

আর্দ্রাযুক্ত অপরপক্ষীয় কৃষ্ণা নবমীতে শ্রীবৃক্ষে বোধন, মূলাযুক্ত সপ্তমীতে প্রবেশন, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী ও উত্তরাষাঢ়াযুক্ত নবমীতে অর্চ্চন, শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, যোগার্দ্রচিত্তবৃত্তিতে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের নাম বোধন,—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মূলে প্রবেশের স্বরূপার্থ এই,—মূলা নক্ষত্র উপলক্ষণ মাত্র; শুদ্ধ-

প্রাণায়াম-যোগ সিদ্ধির কারণভূতা কুলকুণ্ডলিনী জগদ্‌যোনি, জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, ভূতশুদ্ধ্যাত্মিকাশক্তির সহিত জীবের মূলাধারে সুষুম্নাবর্ত্মে প্রবেশের নাম মূলাতে প্রবেশন। পূর্ব্বোক্তরে পূজনার্থে অষ্টমী কলাতে প্রবৃত্ত সাধক, পূজা জপাদি সহকারে সগর্ভ প্রাণায়াম করিবে; উত্তরে নবমী কলাতে প্রণবাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণধারণা করিবে; তদর্থে পূজা জপাদির আবশ্যকতা আছে; অর্থাৎ যে সাধক অন্নময়াদি কোষত্রয়গত হয়েন, তাঁহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রাপ্ত-সমাধি বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-কোষ-প্রাপ্ত-সাধক জীবন্মুক্তপ্রায়; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিয়াও থাকেন। যাদৃশ প্রাপ্ত-বিজ্ঞানময়-কোষ সাধকের পূজায় যন্ত্রাদি সহকারে পূজা করিবার বিধি আছে, তাদৃশ আমন্দময়-কোষ-প্রাপ্ত সাধকের যন্ত্রাদি প্রকাশের অপেক্ষা নাই; তিনি পূর্ব্বকল্পিত ঘট ও পূর্ব্বাঙ্কিতযন্ত্রে যদৃচ্ছাক্রমে গন্ধ-পুষ্পদান মাত্র করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে; আনন্দময়ীর প্রসন্নতাতে আনন্দময় হইয়া যাবৎ দিন যাপনা করিব;—যাবৎ দিন পদে, যে পর্য্যন্ত পরমায়ুর ইয়ত্তা, সেইকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ যাত্রা সমাধান করিব। প্রণবাবলম্বনে যে কালক্ষেপ করিবার বিধি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ধ্বন্যাত্মক নাদশক্তির সমাশ্রয় করিলেই দেহের দক্ষিণান্ত হয়। আনন্দময়-কোষপ্রাপ্ত যোগীর মানাপমান, লাভালাভ, হেয়োপাদেয়, গুহ্যাগুহ্য জল্পনাদির বিশেষ বোধ থাকে না।

তাদৃশ ব্যক্তি সলজ্জ ও বিলজ্জ জ্ঞানের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ তিনি লোকলজ্জানুরোধ করেন না,—সর্ব্বদাই আনন্দপ্রকাশে যত্নপর হইয়া যাহাতে আত্মার আনন্দ হয়, তাহাই করিতে থাকেন। এই রাজযোগীর যোগসিদ্ধিলক্ষণ জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে দেবীমহোৎসবে নবমীপূজার বাহ্য ব্যবহার দেখাইয়াছেন। স্বঘটে জ্ঞানশক্তির প্রবেশ মূলাধারে হয় ; একারণ সপ্তমীতে বাহে মৃণ্ময়াদি ঘটস্থাপনা করিয়া আবাহনাদি করে ; তাহার প্রমাণ মানসপূজায় শিরঃসহস্রারস্থ ইষ্টদেবতারূপে পরমাত্মাকে স্বহৃদয়ঘটে অধিষ্ঠিত করিয়া মানসোপচার প্রদানে পূজা করিবার পদ্ধতি চির-প্রথিতা। সেই পূজাই বাহ্যে কল্পিত ঘটে ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং ফলে পূজার পরতত্ত্বত্ব ঘটিয়া উঠিয়াছে। অষ্টমীতে পুনর্ঘট ও ভদ্রমণ্ডলাদি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বাহুল্যরূপে পূজা করিয়া থাকে ; অর্থাৎ শরীরস্থিত সমস্ত তত্ত্বকে লক্ষ্য করিবার উপায়ার্থ আবরণ-দেব-দেবীরূপে গন্ধপুষ্প দানচ্ছলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যেহেতু পীঠপূজা ও আবরণপূজার মন্ত্রার্থেই প্রকাশ আছে যে, এ সকল বাহ্যবিষয়মাত্র নহে। তথাহি প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধির সহিত বাহ্যসম্বন্ধের ঘটনা হয় না ; উহার ফল কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃকান্যাসও শরীরাভ্যন্তরবৃত্তির আবৃত্তি মাত্র। যথা “আধারে লিঙ্গ নাভৌ” ইত্যাদি মন্ত্রে শরীর যে কালাত্মক, সেই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।

"পঞ্চাশল্লিপিভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থে ব্যাহ্যাবয়ব উপলক্ষে বর্ণমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ পূজকেরা যে সকল বর্ণাত্মক মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা সাধকের শরীর হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সুতরাং মন্ত্র সকল যে আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা ঐ পূজাছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পীঠপূজা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিপোষক। হৃদ্গহ্বর পরমাত্মার পীঠ। বাহ্যে যত আধার সেই সমস্ত আধারই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে। একারণ "হৃদি আধার-শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ পুষ্প প্রদান করা হয়। কিন্তু বাহ্য পূজাকালে ঐ পূজা মানসে বা জল্পনাতেই সম্পন্ন হয়। তাহার একপীঠও কস্মিনকালে কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় না। কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদী, সিংহাসন এবং দক্ষিণস্কন্ধে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম, বামে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণে ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই অচাক্ষুষ বিষয়। চতুর্থতঃ আবরণশক্তি পূজা ক্রমে খ্যাতি, সৌম্যা, রৌদ্রা, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, শান্তি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, শোভা, বৃত্তি, ভ্রান্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ব্যাপ্তি, অনসূয়া প্রাপ্তি, চিতি ইত্যাদি সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার উরুশক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপে বিখ্যাতা। অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যতীত ইহারা যে দেবী-মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিতা, কোনক্রমেই এরূপ উপলব্ধি হইবার

বিষয়ীভূতা নহে। সুতরাং অষ্টমীপূজাছলে বিজ্ঞানময় কোষের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। দুর্গোৎসব করিয়া যে ব্যক্তি এরূপ বোধ করেন যে, আমি মৃণ্ময়ী বা অন্যবিধ প্রতিমায় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেব-দেবীগণের পূজা করিতেছি, তাঁহার প্রতি বোধের নিমিত্ত ভগবান্ ভূতনাথ প্রকারান্তরে ঐ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, মহানবমী উত্তর কার্য্য হইলেও তাহাতে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহাতে ঘট-যন্ত্রাদির অপেক্ষা নাই; ইহারও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত। তথাহি পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে বিজ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকের বিশেষ আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দরসে মগ্ন হইয়া সাধক ব্যক্তি পূজা সমাপন করিবার কামনায় যত্নবান্ হয়। সুতরাং এককালে প্রভূতোপচার দ্বারা অর্চ্চনামাত্র করিয়া কার্য্যে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত করে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমার আর পূজায় বিশেষ আদর নাই; আমার ইষ্ট পূজন কর্ম্ম এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। কিঞ্চ, হোমচ্ছলে ইহা জানাইতেছেন যে, আমি ব্রহ্মাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্মকে আহুতি দিয়া ভস্মীভূত করিয়া এক্ষণে বাহ্য লৌকিক কর্ম্মে আর আবদ্ধ থাকিব না; যাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকিব, তাবৎ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মভূতপ্রায় ও আনন্দময় বিগ্রহে প্রণবোচ্চারণে নিবিষ্টচেতাঃ হইয়া যথারুচি তথা ব্যবহারে কেবল আনন্দসূচক সংগীতেই কালক্ষেপ করিব।

এই উপদেশের নিমিত্ত "নবম্যাং শারদোৎসবঃ" অর্থাৎ সেই দিন জাতি বিজাতি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল তন্তোষার্থ

সংগীতাদি করিবে; ইহাতে লোক-লজ্জানুরোধে আপন আনন্দের বিরাম করিবে না—এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এদিকে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ লৌকিক কার্য্যে শঙ্কা-রহিত হয়, ইহা জানাইয়া গিয়াছেন।

শারদীয় দুর্গাপূজাঙ্গীভূত বিসর্জ্জন কল্পকে তত্ত্বজ্ঞানানুকল্প রূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরমার্থ বিষয়ে আনয়ন করাই পুরুষার্থ-সিদ্ধির কারণ। আদৌ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, দুর্গোৎসবের বিশেষ তাৎপর্য্য একবচনেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা,—

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ॥

আর্দ্রে বোধন, মূলে প্রবেশন, পূর্ব্বোত্তরে সংপূজন, শ্রবণে বিসর্জ্জন করিবে।

দেবী শব্দে বিদ্যা, অর্থাৎ পরাবিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) যোগার্দ্রচিত্ত-বৃত্তিতে উদ্বোধিত হয়। সেই পরাবিদ্যা কুণ্ডলিনী শক্তির মূলাধারে অর্থাৎ স্বয়ম্ভুরন্ধ্রে প্রবেশ চরলগ্নে অর্থাৎ ইড়াতে হয়। চরাংশে পিঙ্গলায় প্রবেশেও প্রবেশন গণ্য হয়। অনন্তর স্থিরলগ্নপদে সুষুম্নাছিদ্র; তাহাতে প্রবেশ করাতে কুম্ভক হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার সমতাবস্থাতে সুষুম্নাস্থ বায়ুর স্থিরতার কালকে দ্ব্যাত্মক লগ্ন কহিয়া থাকে। এই মূলাধারপ্রবেশের নাম মূলে প্রবেশন। কিন্তু পূর্ব্বোত্তরে পূজার অভিপ্রায় এই যে, সকামনিষ্কামভেদে পূজা দ্বিবিধ। যে পর্য্যন্ত ফলাভিলাষের বিরতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের

পূর্ব্বাবস্থা ; অর্থাৎ বিনা ভোগে মোক্ষপ্রবৃত্তি জন্মে না ; সুতরাং সাধক ব্যক্তি ভোগে অভিলাষী থাকিয়া পূজনাদি দ্বারা জ্ঞানাভিলাষ করে। যখন ফলাভিসন্ধানের প্রয়োজনাভাব হয়, তখন সাধকের উত্তরাবস্থা ; তৎকালে চিত্তশুদ্ধি রাখিবার জন্য নিষ্কারণে পূজাদি করিবে ;—এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে "পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য ;" সুতরাং পণ্ডিতগণ দুর্গোৎসবের কাম্যত্ব ও নিত্যত্ব উভয়ই স্থির করিয়া গিয়াছেন। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎকারকর্ত্তব্যশ্চেতি" আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার করিতে হয়। এই শ্রুতি প্রমাণের ফল প্রদর্শনার্থে সিংহাবলোকন ন্যায়ে শ্রুত্যুক্ত চতুর্ব্বিধ সাধকের অবস্থাভেদ দ্বারা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধনানন্তর মূলাধারে চৈতন্য-শক্তি প্রবেশের নাম "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ;" অষ্টমীতে মননদ্বারা জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ শান্তি-পুষ্ট্যাদির অনুস্মরণ ও ভদ্রমণ্ডলে আবরণশক্তি পূজনের নাম আত্মার 'মনন।' নবমীতে সাধক আনন্দময় হইয়া আপনাতে দেবীরূপ ভাবনা দ্বারা উৎসবান্বিতচিত্তে হর্ষোৎসাহ প্রবৃদ্ধি করিবে, ইহার নাম আত্মার 'নিদিধ্যাসন'। যখন নবমীর শেষে কেবল আনন্দের প্রতি নির্ভর করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে সাধকের আর বিশেষ পূজার প্রয়োজন নাই ; তবে ইচ্ছামত পূজা করিলেও হানি নাই। সেই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তি। তাহাতে

কেবল আত্মার "শ্রবণ" প্রয়োজন হয়; এজন্য "আত্মাই শ্রোতব্য" বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন; অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বোপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মার শ্রবণেই জীবনাতিপাত করিবেন; পূর্ব্বাঙ্গ যাবৎ কর্ম্ম, সেই তাবৎ কর্ম্মই আত্ম-শ্রবণ দ্বারা বিসর্জ্জন করেন। তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পক্ষে আত্মার শ্রবণই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। ইহা জানাইবার জন্য "শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ" বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্ব বেদ বেদান্তাদি প্রমাণে তত্ত্বজ্ঞান সাধনার উপদেশাভিপ্রায়ে দুর্গোৎসব কার্য্য সর্ব্বকালই জগদ্‌ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

অতএব দুর্গোৎসব কর্ম্মের উহ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। যাঁহারা এই স্বরূপার্থ পরিগ্রহে দুর্গোৎসব করেন, তাঁহাদিগের শ্রুতি-প্রতিপাদ্য নিরতিশয় ব্রহ্ম-তন্ময়তা লাভের ব্যাঘাত নাই। সকল পুরাণ, সকল সংহিতা, সকল বেদবেদান্তাদিতে দুর্গাদেবীকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপাকার ব্রহ্মময়ী বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। তবে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানানুশালনের পথে চলে না, অথচ জ্ঞানাভিমানী হয়, তাহারাই সামান্য ক্রিয়া বলিয়া দুর্গোৎসবাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত দুর্গোৎসবের মর্য্যাদার হানি হইতে পারে না।

এক্ষণে নবপত্রিকা সংগ্রহ ও তৎপূজন দ্বারা কিরূপ তত্ত্বোপদেশ পাওয়া যায়, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

"রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তীবিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকাঃ ॥"

রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মানক ও ধান্য এই নববৃক্ষে নবপত্রিকা হয়। এই নবপত্রিকা অপরাজিতা লতা দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার বিধি ও ব্যবহার আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—সরস্বতী-নাড়ী তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী। ঐ নাড়ীর ছিদ্রে প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জ্ঞানোপ-যোগিনী মেধা জন্মে। সেই মেধা বিষ্ণুবৎ সর্ব্ব-প্রবেশন-শক্তিমতী। একারণ, তাহার নাম বিষ্ণুক্রান্তালতা। ঐ বিষ্ণু-ক্রান্তা লতার নামান্তর অপরাজিতা লতা। সুতরাং অপরা-জিতা বেষ্টনের তাৎপর্য্য এই যে, মেধাকে পরাজয় করিতে কেহ পারেন না। সত্ত্বরজস্তমোগুণাকারে ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞান-রূপকে ত্রিবিধ বেষ্টন করিয়া রাখিলে সাধকব্যক্তি অস্খলিত-রূপে তত্ত্বজ্ঞান-সোপানে স্থির থাকিতে পারে। ইহা জানা-ইবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বারম্ভক রম্ভাতরুকে অপরাজিতা দ্বারা বন্ধন করিতে কহিয়াছেন। তাহার তাৎ-পর্য্য অর্চ্চনমন্ত্রার্থেই সুব্যক্ত আছে। যথা—

রম্ভাঞ্চ দ্বিভুজাং পীতাং শূলপুস্তকধারিণীং।
পূজয়েৎ কামবীজেন মন্ত্রেণানেন শঙ্করি ॥
দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
রম্ভারূপেণ মে দেবি শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥

হে শঙ্করি! রম্ভাকে পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, শূল ও পুস্তক-

ধারিণীরূপে ধ্যান করিবে এবং কামবীজ-মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—হে দুর্গে দেবি! তুমি মম গৃহে সমাগমন করতঃ রম্ভা-রূপে আমার শান্তি বিধান কর। আমি তোমাকে নমস্কার করি।

তাৎপর্য্য—যখন "শূল-পুস্তক-ধারিণী" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন রম্ভারূপা যে বুদ্ধিশক্তি পরা প্রকৃতি সরস্বতী, তাহা বলা হইয়াছে। মম হৃদ্গহ্বররূপ গৃহে সমাগমন পূর্ব্বক সংসার-দুঃখের শান্তি বিধান কর। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত কর। ইত্যর্থে রূপক-সজ্জাতে রম্ভারূপা বলিয়া সম্বোধন মাত্র। বস্তুতঃ ইহা রম্ভা-তরুস্থিতা ব্রহ্মশক্তির অর্চ্চনা; ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী।

কচ্চীস্থাকালিকার অর্চ্চনা ও প্রার্থনা বাক্য এই ;—

মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কচ্চীরূপাসি সুব্রতে।
মমচানুগ্রহার্থায় আগচ্ছ মম মন্দিরং।
মায়াবীজেন সা পূজ্যা হরিদ্রামথ চিন্তয়েৎ।

হে দেবি! তুমি মহিষাসুর যুদ্ধে (দেবরাজের প্রতি অনুকম্পা করিয়া) কচ্চীরূপা হইয়া মহিষ নির্য্যাতন করিয়াছ; অতএব তুমি আমার মন্দিরে আগমন কর। এইরূপে ইহাকে মায়া-বীজে পূজা করিয়া অনন্তর হরিদ্রার পূজা করিবে।

পূর্ব্বোক্ত মহিষমর্দ্দিনীর স্বরূপার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা দুর্গা দেবী নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। সেই বিষ্ণু-দুর্গা বৈষ্ণবীশক্তির সম্যক্ উদয়ে সাধক মৃত্যুকে জয়

করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয়। এস্থলে এইরূপ অভিপ্রায় নিগূঢ় রহিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বৃক্ষের অর্চ্চনাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে এ সকলই অধ্যাত্মতত্ত্ব-পক্ষে ব্রহ্ম-নাড়ীর শাখা নাড়ী হয়; তাহাতে প্রাণায়াম-প্রভাবে প্রাণ-বায়ুর সঞ্চারে তত্ত্বোপযোগী সাধন সামগ্রী অর্থাৎ স্মৃতি, বৃত্তি, দয়াদির উদয় হয়। তাহা হইলেই অমরণ ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। অগ্রে এই নয় প্রকার উপকরণসিদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে যে প্রাণবায়ুর প্রবেশ, তাহাই এস্থলে পত্রিকাপ্রবেশ বলিয়া গণনীয়।

এই নবপত্রিকা না হইলে দুর্গোৎসব হয় না; অর্থাৎ পূর্ব্বে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী হয় না; শাস্ত্রকর্ত্তারা রূপকব্যাজে ইহাই জানাই-য়াছেন। ইহাতে ভোগ ও মোক্ষ দুই ফলই আছে; একারণ শ্রীফলযুগ্মে অন্বিত করিতে কহিয়াছেন।

দেবীপক্ষে যত মূর্ত্তি, সে সমুদায়ই কেবল ব্রহ্মবিভূতি। ইহার কিছুমাত্রই অলীক পদার্থ নহে। যেমন স্বর্ণ একমাত্র পদার্থ, কিন্তু তাহাতে কেয়ূর, কটক, কটিসূত্র, বলয়, কঙ্কণাদি উপাধিভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সকলই স্বর্ণ ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে; সেইরূপ ব্রহ্ম এক পদার্থ; কিন্তু উপাধি-যোগে নানারূপে বিভাত অর্থাৎ সাধকদিগের রুচিবৈচিত্র্য-প্রযুক্ত বহুবিধ হইয়াছেন। যাহার যাঁহাতে রুচি, সে তাঁহা-কেই উপাসনা করিয়া থাকে এবং তৎসেবাতেই মুক্ত হয়;

ইহার অন্যথা নাই , শাস্ত্রপ্রণেতারা এই অভিপ্রায় নানাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি বল, ঐ সকলকে ব্রহ্মবিভূতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মোপাসনা করাই কর্ত্তব্য, বিভূতিরূপের উপাসনার ফল কি ? তাহার উত্তর এই যে, পরমব্রহ্মোপাসনাপক্ষে বাহ্যে বিশেষ আড়ম্বর নাই, তাহাতে অন্তর্যাগমাত্র করিবে ; কিন্তু অন্তর্যাগাপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে, যে পরমাত্মা যেমন প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে আছেন, সেইরূপ বাহিরেও আছেন। যথা—

"অন্তর্ব্বহিঃ পুরুষঃ কালরূপ ইতি।"

অর্থাৎ তৎসত্তা-রহিত স্থানমাত্র নাই। অতএব গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি—এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে যে কোন প্রতিমাদি সন্নিধানে অর্পণ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এইরূপ বিবেচনাতেই শাস্ত্রে বাহ্যপূজার বিধান উক্ত করিয়াছেন। যথা—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতীতি।"

যে ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করে, তাহার প্রতি তাহাতেই আমার তুষ্টি জন্মে। অতএব পৌত্তলিক বলিয়া দেবপূজকের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলে যে যথার্থ জ্ঞানী হয়, এমত নহে।

সকল শাস্ত্রেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যে জৈমিনি ঋষি সন্দিহান হইয়া পক্ষিরূপী দ্রোণপুত্রচতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক-আধার ভগবান্ বাসুদেব সকলের কারণ-স্বরূপ এবং কারণের কারণ, নির্গুণ হইয়াও কি কারণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? পক্ষিগণ উত্তর করেন, হে ঋষে! অনাদিনিধন ভগবান্ বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা মায়োপাধি-বিশিষ্ট হইয়া জীববৎ ক্রীড়া করিয়াছেন। ফলে তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ বিবেচনা করিও না। কারণ, রূপের স্বরূপ বিবেচনা করিলে জ্ঞানমূল সচ্চিদানন্দ পরাবিদ্যাই কল্পিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেই মূর্ত্তি শুদ্ধা, অতি নির্ম্মলা, সামান্য জীবমূর্ত্তির ন্যায় নহে। তত্তন্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমানই রহিয়াছে। হে ঋষিবর! তুমি ইহাই যথার্থ জ্ঞান করিও। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত পূজাদি গ্রহণ ও স্তবাদি শ্রবণ অশরীরিরূপে প্রতিপন্ন হইবার সঙ্গতি কি? তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। যথা—

> "অপাণিপাদো জবনগ্রহীতা,
> পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
> স সর্ব্ববেত্তা নহি তস্য বেত্তা
> তমাহুরাদ্যং পুরুষপ্রধানম্ ॥"

তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু তিনি সকলই গ্রহণ করেন; চরণ নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র গমন করেন; তিনি অচক্ষু, কিন্তু সকলই

দেখিতে পান ; কর্ণ নাই, অথচ সকল শুনেন ; তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, সেই পুরুষ-প্রধান পরমাত্মা সকলের আদি হয়েন।

এরূপ শক্তিমান্ পরমাত্মার যে কোনরূপে অর্চ্চনা করিলে যে পূজা না হয়, এমত কেহই বলিতে পারেন না ; এবং পূজাতেও যে তাঁহার তুষ্টি না জন্মে, এমত প্রমাণ কি আছে ? আর তাহাতে যে মোক্ষ লাভ হইবে না, ইহাই বা কে বলে ? তিনি এক, কিন্তু অনেক হইয়াছেন। অনেকত্ব পরিচ্ছিন্নের গুণ। অতএব তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্নরূপেই মান্য করিতে হইবে। তিনি যে স্বরূপ, কি অরূপ, ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না। যথা শ্রুতিঃ—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। ইতি ॥

যেমন অগ্নি এক, কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ-পাষাণাদিতে নানারূপ হইয়াছেন, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি হয়েন ; সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বজীবের এক অন্তরাত্মা হইয়াও রূপে রূপে অনেকরূপ হইয়াছেন। ইহাতেও পরমেশ্বরকে সগুণ-নির্গুণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাতে ও বিভূতিতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। সর্ব্বত্র সকল রূপেই তিনি উপাস্য হয়েন ; এবং ভাগবতেও কহিয়াছেন যথা—

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥

যেমন একমাত্র (গন্ধগুণরহিত) বায়ু বিবিধ পার্থিব পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি মনুষ্যগণের প্রাকৃত উপাসনা দ্বারা তাহাদিগের অভিলাষানুরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি পান, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ সফল করুন।

ইহাতেও তাঁহাকে সগুণ-নির্গুণ কহিয়াছেন, সুতরাং

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"

এই বচনের চরিতার্থতা হইল; অর্থাৎ সাধকদিগের সাধ্য যতরূপ, সকলই পরমেশ্বর-রূপ বলিতে হইবে। মুণ্ড-মালাতন্ত্রেও মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন; যথা—

নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেবচ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণাত্বংহি সগুণোহং সদাশিবঃ ॥
সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণোমতঃ ॥

সপ্তম পটলম্।

প্রকৃতি বস্তুতঃ নির্গুণা এবং আমিও নির্গুণ। যেকালে তুমি সগুণা হও, সেকালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হই। প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য; শিব যে নির্গুণ, ইহাও সত্য;

ফলতঃ উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হই।

এই প্রমাণে পরমেশ্বরকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা মায়াতীত উপাসনাকাণ্ডে শিবসংজ্ঞা গ্রহণ করতঃ তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, পরমেশ্বরের মায়ারূপা শক্তিই কেনেষিত উপনিষদে উমানামে বাচ্যা হইয়াছেন। যথা—

তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানমুথাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি। ২৫।

তাৎপর্য্য সহিত অর্থ এই যে—যৎকালে অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া পরাজিত হন এবং দেবরাজ ইন্দ্র গমন করাতে ব্রহ্ম অদর্শন হইলেন, তৎকালে সেই আকাশ মণ্ডলে বহুশোভমানা অর্থাৎ নানালঙ্কারবিশিষ্টা উমা নামে একটী স্ত্রী আগমন করিলেন; তাঁহাকে হৈমবতী অর্থাৎ হিম-বদ্দুহিতা বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লেখ করেন। তাহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, এই যক্ষ অর্থাৎ পূজ্য পুরুষ কে?

ইহাতে ইহাই ভাসমান হইল, যে পরব্রহ্ম দেবরাজকে প্রকৃতিরূপে উপদেশ দিবার জন্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; নতুবা অন্যে ব্রহ্মের স্বরূপ কহিতে শক্তিমান নহেন। সুতরাং এতৎ-শ্রুতি-প্রমাণে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্ম জানিয়া তন্ত্রাদিতে হরপার্ব্বতীকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী হরপার্ব্বতী দম্পতিরূপ দেবদেবী নহেন।

কিঞ্চ

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥

স্মৃতিঃ, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদান্তের স্তাবক মাত্র; অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট বেদ প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হন।

অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করতঃ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারকে স্পর্শ করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হয়, তাহারা কখনই বেদের স্বরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। পরিশেষে প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তর্কদ্বারা অর্থবাদ সকলকেই যথার্থবাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে। ফলিতার্থ একালে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ ও দেবদেবীর উপাসনা বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বেদে যে অর্থবাদ আছে, তাহা ভগবান্ বাদরায়ণি ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশৎ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। পরম দয়ালু ঋষিগণ বেদান্ত বুঝাইবার জন্য উপান্যাসচ্ছলে পুরাণাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে হতভাগ্য জনেরা সে ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া পুরাণাখ্যানকে যথার্থই উপন্যাস জ্ঞান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

উপসংহার।

"হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব" পুস্তকে অনির্দ্দেশ্য অসীমবৎ কাল হইতে প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে কয়েকটি মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, যথার্থ বুভুৎসুভাবে তাহা অনুধ্যান করিলে কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার লাভ হইতে পারে কি না, তাহার সিদ্ধান্ত চিন্তাশীল পাঠকমহাশয়দিগের প্রতিই নির্ভর করিতেছে।

আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে, কেবল আমাদিগের পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্ম বলিয়া আমরা পক্ষপাত বশতঃ তাহার উৎকৃষ্টতা প্রখ্যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, অথবা তদ্বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, এরূপ নহে; গভীর চিন্তা এবং কঠোর তর্কদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। (১)

হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব। মানবজাতির পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে যে কোন ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তাহা কদাচই পূর্ণাবয়ব হয় না। পৃথিবীতে সভ্যতাসম্পন্ন জটিল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা সুদীর্ঘ-বিবেচনা পূর্ব্বক সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যে সকল রাজ্যশাসন ব্যবস্থা (আইন) সৃষ্টি করিতেছেন, কিছুদিন

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক পুস্তক দেখ।

পরেই তাহার অনেকাংশের অসারতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে এবং তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাব লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের অবয়ব সংঘটনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে পরিচ্ছন্ন-বুদ্ধি মনুষ্য বলিয়া অনুভুত হইতে পারে না। তথাহি,—

(১) হিন্দুধর্ম্মে মনুষ্যের মনোবৃত্তিগত বৈলক্ষণ্যরূপ অকাল্পনিক প্রাকৃতিক বিভাগ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য সমাজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। কতকগুলি সত্ত্বগুণ-প্রধান, কতকগুলি রজোগুণ-প্রধান এবং কতকগুলি তমোগুণ-প্রধান। তদনুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য-কার্য্যের ব্যবস্থা-সকল সাধারণতঃ তিন ভাগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রই ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

(২) ইহাতে মনুষ্যদিগের মাসসিক প্রকৃতি, শারীরিক শক্তি এবং কার্য্যসাধনের উপযোগিতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৩) হিন্দুধর্ম্মে মানবদিগের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমান্, মধ্যবিধ এবং নিতান্ত মূঢ় এই ত্রিবিধ ব্যক্তির পক্ষে একবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নহে। ইহাদিগের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

(৪) হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের বয়ঃক্রম অনুসারে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুযায়িরূপে বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৫) মনুষ্যের সহজ অবস্থা এবং আপৎকাল এই উভয়ত্র একবিধ কার্য্যানুষ্ঠান ব্যবস্থা ন্যায়ময় জগদীশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ ন্যায়পরতাবৃত্তির অনুমোদিত নহে। এই নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মে মনুষ্যের উল্লিখিত দ্বিবিধ অবস্থার কার্য্যকে দুই ভাগ করিয়া শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। এক মাত্র মহাভারত গ্রন্থের "রাজধর্ম্ম" ও "আপদ্ধর্ম্ম" ইহার প্রবলতর প্রমাণস্বরূপ।

(৬) একজন অসাধারণ ধনবান্ ব্যক্তির দশসহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তির এক মুদ্রা অর্থদণ্ড এই উভয়ই তুল্য, ইহা স্ফুটজ্ঞান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্মে দূরদর্শী শাস্ত্রপ্রণেতারা তদ্বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে পাপের অর্থদণ্ড স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি বিষয়ে অধিক ধনী, অল্প ধনী, দরিদ্র, দরিদ্রতর ও দরিদ্রতম ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে বিশদরূপে বর্ণিত থাকিয়া তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

(৭) হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে সুস্থ ও পীড়িত, বলবান্ ও দুর্ব্বল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ক্ষমতা বিশিষ্ট মানবগণের পাপ ও

পুণ্যের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্রের প্রণেতাদিগকে ন্যায়-ময় জগদীশ্বরের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধিত হইয়া উঠেন।

(৮) হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় শাস্ত্র এক বাক্যে মানবগণের পাপ ও পুণ্যের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে দণ্ড ও পুরস্কা-রের নূন্যাধিক্য বর্ণন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম যে, ন্যায়ময় ও দয়াময় জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ, ইহার স্পষ্টতর সাক্ষ্য দান করিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য আড়ম্বরময় অসার ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম এরূপ বলেন না যে, "একটি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে জীবাত্মা অনন্তকাল নরকভোগ করিবে, অথবা একটী পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে।

(৯) এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কি শারীরিক কি মানসিক, কি ভৌতিক কোন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা অপ্রতিপালনের আবশ্যকতা হয় না। প্রত্যুত দেশ, কাল, পাত্র ও অধিকারী ভেদে ঐ সর্ব্ব প্রকার নিয়ম সামঞ্জস্যরূপে প্রতিপালন করিবার স্পষ্টতর বিধি দৃঢ়রূপে প্রণীত হইয়াছে।

(১০) কোন কোন ব্যক্তির এরূপ সংস্কার আছে যে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে এত বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক কোন রূপ স্থির-সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

এইরূপ দুই চারিটী কথা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক মাত্র। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে "কোরাণ" অথবা "বাই-বেলের" ন্যায় একখানি নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তকে সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থার সমষ্টি নাই; সমুদ্রবৎ বিস্তৃত গ্রন্থ সমূহে ইহার ব্যবস্থা সকল বিস্তারিত রহিয়াছে। সুতরাং দুই একখানি গ্রন্থ পাঠ অথবা দুইএক ব্যক্তির উপদেশবাক্য শ্রবণ দ্বারা আপাততঃ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফলতঃ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে কিছু-মাত্র মতদ্বৈধ নাই; ইহা মীমাংসা শাস্ত্র সকলে অতি স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধিক কি রঘুনন্দন প্রণীত এক-মাত্র "স্মৃতি সংগ্রহ" গ্রন্থ ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ হইতে পারে।

(১১) ভাগবত গ্রন্থের "রাসলীলা" তন্ত্রশাস্ত্রের "পঞ্চো-পাসনা" ইত্যাদি বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কোন কোন ব্যক্তির এরূপ সংস্কারও জন্মিতে পারে যে, মানবদিগকে বিমোহিত করা ঐ সকল শাস্ত্রকর্ত্তার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বিনা কারণে অন্যের অপকার সাধনার্থ

দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের প্রবৃত্তি হওয়া কি সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থকর্ত্তা শাস্ত্রান্তরে আপনার অপরিমিত জ্ঞান, অসাধারণ বুদ্ধি ও অলৌকিক পরহিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই লোকের অপকার সাধনার্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, হতজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয়। ফলতঃ যে সকল শাস্ত্রের কিয়দংশের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া লোকের উল্লিখিতরূপ বিষম কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহারই অপরাংশের বর্ণনা শ্রবণ করিলে তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের ভ্রমান্ধকার নিরাকৃত হইয়া জ্ঞানালোক সমুদ্দীপিত হইতে পারে।

(১২) এতদ্ভিন্ন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরলোকের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া ন্যায়ময় জগদীশ্বরের দণ্ড ও পুরস্কারের যেরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আর কি অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে?

ফলতঃ অনুধ্যানশীল ব্যক্তিগণের ইহা অনুধাবন করা আবশ্যক যে পৃথিবীতে মানব সমাজে যে কয়েক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী প্রচলিত আছে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি বাস্তবিক তাহার কাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অথবা ইহা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইয়াও বর্ত্তমান জনসমাজের অনবধান অথবা অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত অবজ্ঞাত হইতেছে? যদি কোন চির-

সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বিনাপরাধে দণ্ডিত হইতে দেখিয়া, দয়াপ্রধান মানবজীব বাষ্প বিসর্জ্জন না করে, যদি কোন মহোপকারী ব্যক্তির নিকট সুদীর্ঘকাল উপকার লাভ করিয়া, ভ্রম-প্রমাদাদি বশতঃ তাঁহার প্রতি অসদ্ ব্যবহার করিবার পরক্ষণেই অন্তঃকরণ ক্ষোভানলে দগ্ধ না হয়, তবে কি পশ্বাদি নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা মানব জাতির কিছুমাত্র মহত্ত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে?

পরিশেষে পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই যে, বিদ্বেষ বুদ্ধি অথবা অবজ্ঞার সহিত কোন পদার্থের আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও তাহার সুন্দরতা বা উৎকৃষ্টতা অনুভূত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বিজাতীয় ধর্ম্মান্তরের প্রতি পক্ষপাত অথবা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিষম বিদ্বেষ ও দারুণ অবজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং যেন কোন ধর্ম্মাবলম্বী নহি, এইরূপ বোধের সহিত যথার্থ বুভুৎসুভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দোষ, গুণ বিচার করিয়া দেখিলেই হিন্দুধর্ম্ম যে, কিরূপ পদার্থ, আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুজাতীয় ব্যক্তিদিগের হিন্দুধর্ম্মের সহিত কেমন গুরুতর সম্বন্ধ,—আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের নিকট কেমন ঋণী আছেন,—আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম কেমন পূর্ণরূপে উপযোগী, তাহা অনেক পরিমাণে অনুভূত হইতে পারিবে।

আমরা হিন্দুজাতিতে উৎপন্ন ও হিন্দুর সন্তানরূপে পরিচিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে কিরূপে বিস্মৃত হইব?—হিন্দুধর্ম্মের

স্নেহবন্ধনকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব? যখন আমরা হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর-জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন,—

"আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।"

যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। যিনি বলিয়াছেন,—

" যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা" ॥

হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে সেই নবীন দূর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসরকাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন এবং জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্মশব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যায় কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।—এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনাঃ রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্ত্তও অধ্যাত্মযোগ হইতে স্খলিত হইতেন না।—হিন্দুনাম কি মনোহর! এ নাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভা ধারণ করে। এই নাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রাজপুত, মারহাট্টা, মান্দ্রাজি, সমস্ত হিন্দুবর্গ একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, আমরা এনাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্য্যের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণপ্রিয় যে, আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের দেশের রাজা হয়, তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদ্দেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষে কি শত শত, সহস্র